শারদীয়া ১৪২০

অবকাশ

দিগন্তের ওই শেষ প্রান্তে, যেখানে কিছুদিন আগেও খেলা করেছিল সাতরঙা রামধনু, আজ কখনও সেখানে প্রবল কর্মশেষে ক্লান্ত মেঘের পর্যটন। কখনও বা অবসর ভুলে ফিরে এসে শুরু অবিশ্রান্ত বারিধারা। আর তার নিচে, এই মর্ত্যধাম, কবির কথায় মাটি ময়লা বলেই যেখানে প্রাণের মেলা, সেখানে রাত পোহালেই শুরু হয়ে যাবে এক অন্য ব্যস্ততা। মা আসছেন। গোটা একটি বছরের প্রতীক্ষা শেষ হতে বাকি আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা।

মা আসছেন দোলায়। ফল – মড়ক। ফিরে যাচ্ছেন – গজে। ফল – শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা। কি রকম এক অদ্ভুত বৈপরীত্য! একই সঙ্গে ধ্বংস এবং সৃষ্টি। মনে হয় এই সবই বড় রূপক। ধ্বংস না হলে সৃষ্টি হয় কিভাবে? জীর্ণ, পুরাতনের ভেতরেই তো থাকে নতুন সৃষ্টির বীজ। প্রাণীকুলে এর নিদর্শন নেহাত বিরল নয়। যে সুর বাজতে থাকে অন্তরের গভীরে, যাকে পূর্ণতর রূপ দিতে যাত্রা শুরু নবীনের সে তো সেই প্রাক্তনেরই বেঁধে দেওয়া সুর।

সেই বেঁধে দেওয়া সুর নিয়েই ‘অবকাশ’ আজ আবার নতুন কক্ষপথে।

মা আসছেন। একটিই প্রার্থনা। বল দাও, জ্ঞান দাও, আশীর্বাদ কর প্রয়োজনে যেন প্রলয়ংকর রূপ ধারণ করতে পারি, অসুরকুলকে নিঃশেষ করে, তোমার গমনের ফলে যে বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হবে, তাকে যেন সর্বশক্তি দিয়ে পালন করতে পারি।

প্রবন্ধ

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় ♦ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ৮

অনুবাদ

আ স্টাডি ইন এমারেল্ড ♦ অর্ক দত্তগুপ্ত ২৫০

গল্প

দাদুর গল্প ♦ অন্নপূর্ণা বোস ১৪

নমুনা ♦ দেবুমু ২১

ঝড়ের শেষে ♦ শান্তনু পাল ১০৮

বৈভব ♦ সিদ্ধার্থ দেব ১১২

অহনার অজানা যাত্রা ♦ তানবীরা তালুকদার ১৬১

পুরস্কার ♦ দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ১৮১

মদীয় সমস্যার ব্রজীয় সমাধান ♦ হস্তিমূর্খ ২৩২

স্টপগ্যাপ ♦ অতনু কুমার ২৪৩

কবিতা

মাটি মাখা হাত ♦ তুষ্টি ভট্টাচার্য ৪২

সময়ের পদাবলী ♦ অনিমেষ সিনহা ৪৩

আকাশধারা ♦ অভিলাষা দাশগুপ্তা আদক ৪৪

ইচ্ছা ♦ কাকলি পাল বিশ্বাস ৪৫

দিনপঞ্জি ♦ শতরূপা ব্যানার্জি ৯২

হৃদয়পুর ♦ অয়ন চট্টোপাধ্যায় ৯৪

আত্মজীবনী ♦ সৈকত ঘোষ ৯৬

এবারে বরং ♦ নবকলম ৯৭

শর্তাধীন প্রেম ♦ মৌ দাশগুপ্তা ২০৭

বেরঙিন ♦ রঞ্জন সাহু ২০৮

ভীষ্ম তুমি একা নও ♦ জয়ন্ত দাস ২০৯

আবদার ♦ রুদ্রদীপ মজুমদার ২১০

জন্মদিন ♦ সত্র্যজিত ২১১

দেবদূতের চোখে কলকাতা ♦ সৌরভ কুমার দাস ২১৩

রান্নাঘর

মরক্কোর খেজুরে মাংস ♦ অনির্বান শ্যাম ৪৬

ইফতারির ঝোঁকে হালিমের কিসসা ♦ তনুশ্রী মুস্তাফি ১৩৭

নাটক

শিউলি ঝরা বসন্ত ♦ ভাস্কর লাহিড়ী ৫২

যা দেবী পিকআপযানেষু ♦ প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৫

রম্যরচনা

শিবঠাকুরের আপন দেশে ♦ উত্তরায়ণ সেনগুপ্ত ৯৮

মার্কিনে প্রথম যখন আমি ♦ সীমা ব্যানার্জী-রায় ২০২

ছড়া

চাঁদের পথ নির্দেশিকা ♦ অঞ্জন ঘোষ ১৫৬

চলছে পুজোর অবকাশ ♦ অনুভব বক্সি ১৫৭

নন্দ জ্যোতিষ সংবাদ ♦ ডাক হরকরা ১৫৯

স্বাস্থ্য

আলসে চোখ ♦ রঙ্গন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২

ক্যাম্পাস

ছবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ♦ অদিতি কবির খেয়া ১২৯

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

একটা প্রশ্ন অহরহ মনে ঘুরপাক খায়! এই যে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা বিল নিয়ে চারিদিকে এত হইচই, তাহলে বৈদিক যুগে কি হতো? সবাই কি দুধে ভাতে থাকত, নাকি সেকালেও খাবারের অভাব ছিল?

সেটাই দেখা যাক না! লোকে তো বলে - সবই "ব্যাদে" আছে। তাহলে, এটাও কি থাকবে না? ওই যে আজকাল কম্পুতে কোনো কোনো অ্যাপসে বলে - টেক আ ট্যুর! তাই করি বরং।

"সুজলাং সুফলাং" এই ভারত। সেখানে তো খাদ্যের অভাব হওয়ার কথা নয়। অতীত এবং বর্তমানে তো প্রচুর গৌরব গাথা শুনি আমরা। সেটা কতখানি ঠিক?

দেখা যাচ্ছে, খাদ্যের জন্য অসংখ্য প্রার্থনা!! শুধু সংহিতা ব্রাহ্মণে নয়, আরণ্যক উপনিষদেও আছে এই সব।

প্রচুর খাবার বা উদ্বৃত্ত থাকলে তবেই খাদ্য সঞ্চয় করা যায়। সেটা তো কোনোদিন সাধারণ "জনসাধারণ" করতে পারে নি। অথচ, এই সব জনসাধারণের জন্যই সব কিছু।

এরা সারা পৃথিবীতেই "দিন আনি-দিন খাই" জনগণ। দ্রারিদ্র্য, ক্ষুধা, অভাব এদের নিত্যসঙ্গী। প্রাচীন মিশর, চিন – কোনো জায়গাতেই চাষি-মজুর সারা বছর পেট ভরে খেতেই পেত না। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়।

বৈদিক ইতিহাস দেখলে বোঝা যায়, আর্যরা আসার (?) চার পাঁচ শতাব্দীর মধ্যেই উৎপাদন ব্যবস্থায় কৌশলগত প্রকরণে বিপ্লব এসে যাওয়ায়, উৎপাদনের মাত্রা বেড়েছে। প্রয়োজনকে

ছাপিয়ে উদ্বৃত্তও থেকেছে। মনে রাখতে হবে, আলোচ্য সময়কার "আর্য" মানে পশুচারণের মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করতো - এমন একটা গোষ্ঠীবদ্ধ জনগোষ্ঠী যারা পরে কৃষিতে মন দেয়।

এর সাথে সাথেই সমাজে শ্রেণীবিভাগও এসে গেল, আর উদ্বৃত্ত জমা হতে লাগল মুষ্টিমেয় ধনীদের হাতে।

নিরন্ন মানুষদের না দিয়ে এই উদ্বৃত্ত খাদ্য পণ্য হিসেবে ব্যবহার হল, নিজস্ব আর্থিক সমৃদ্ধি বাড়াতে। এর ফলে, সাধারণ মানুষ খাবার আর পেল না।

"খেতে যেন পাই" এই প্রার্থনাটা আছে সমস্ত বৈদিক সাহিত্য জুড়ে। প্রশ্ন উঠতেই পারে, সাধারণ মানুষের তো এসব জানার কথা নয়, তারা প্রার্থনাটা করল কি ভাবে?

উদারবাদী লোকেরা সব সময়েই আছে এবং একটা প্রতিরোধও ছিল।

"অপরিহবৃতাঃ সনুয়াম্ বাজম্" (১।১০০।১৯) – সরলচিত্ত আমরা খাদ্য লাভ করবো। অর্থাৎ - আমরা যদি কুটিলতা পরিহার করে, নৈতিক জীবন যাপন করি, তা হলে দেবতা আমাদের খাদ্য জোগাবেন, এমন একটা বিশ্বাস ছিল মানুষের অন্তর্নিহিত চেতনায়।

শুনলে অবাক লাগে, উপনিষদের যুগে – যখন আধ্যাত্মিকতাই জয়যুক্ত, যখন ব্রহ্মই পরম সত্য, তখন "নেহাৎ তুচ্ছ" প্রয়োজনীয় বস্তু "অন্ন"কে গৌরবান্বিত করা হচ্ছে।

যত দিন গেছে, ততই মানুষ বুঝেছে- যতই উচ্চকোটির চিন্তা বা দার্শনিক চিন্তা হোক না কেন, সেই চিন্তা করার জন্য দরকার শরীরের। আর শরীরকে বাঁচিয়ে রাখে – অন্ন (সব কিছুই যাহা উদর পরিপূর্তি করে, অর্থ সংকোচার্থে – ভাত)।

এই অন্ন মহ বা মহৎ। অন্নের মধ্যেই লুকিয়ে আছে- প্রাণের মহিমা। "অন্নে হীমানি সর্বানী ভূতানি বিষ্টানি" - বৃহদ আরণ্যক উপনিষদ (৫।১২।১) অন্নেই এই সমস্ত প্রাণী নিহিত।"

বৈদিক যুগে মানুষ - পশু শিকার, পালন, ফলমূল সংগ্রহ বা চাষ, যে করেই হোক খাবার বা খাদ্য সংগ্রহ করত।

সেখানে আবার অনেক অনিশ্চয়তাও ছিল। ঝড়, বৃষ্টি, চাষ ঠিক ভাবে না জানা – এই সব। তাই এক অজ্ঞাত শক্তির কাছে বারবার মাথা নোয়ানো। তিনি যদি খুশি হয়ে পেটে খাদ্য যুগিয়ে দেন!!

আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদের - সে যুগে মানুষ চেষ্টায় প্রকৃতিকে বশ করতে পারত না বলেই যজ্ঞের উদ্ভাবন। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বারবার এর উদাহরণ আমরা পাই।

স্পষ্টতই মানুষের চেষ্টাতে যেটুকু খাদ্য উৎপাদন হত, তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক অনেক কম। তাই দেবতা আর যজ্ঞই ছিল ভরসা।

সংহিতা ব্রাহ্মণে অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ডে ক্ষুধার খাদ্যের জন্য সরাসরি প্রার্থনা আছে। খাদ্য ছিল মুখ্য কাম্য বস্তু।

ক্ষুধা সম্বন্ধে বারবার আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে কারণ, যজ্ঞ দিয়ে - দেবতার স্তব দিয়ে, তীব্র প্রার্থনা দিয়ে ক্ষুধা জনিত মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রার্থনা বারবার দেখতে পাই।

আরণ্যক- উপনিষদে অর্থাৎ বেদের জ্ঞানকাণ্ডে কি ছবিটা পাল্টে গেল? তখন তো লোহার লাঙলের ফলা ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে! অল্প পরিশ্রমে বেশি জমি চাষ করা যাচ্ছে। ফসলও ফলছে বেশি। ক্ষুধার প্রকোপ কি কমল কিছু? এযুগে মুখ্য কথাটা যজ্ঞ নয় - ব্রহ্মজ্ঞান! এই সব তত্ত্বকথা যখন এসেছে সমাজে তখন কি খাদ্যের জন্য আকুলতা কমেছে?

আরণ্যক-উপনিষদে ক্ষুধার অন্নের জন্য একই রকম আগ্রহ। জন্মান্তর বাদ এসে গেছে চেতনায়, তবুও এই আগ্রহ।

নানা উপাখ্যানে ক্ষুধার গুরুত্ব এবং অন্নের মহিমা ব্যক্ত করা হয়েছে। এর সংখ্যা এত বেশি যে, ওই যুগেও নিরন্ন মানুষের সংখ্যা, সমাজে অন্নের ব্যাপক অভাব, ক্ষুধায় মৃত্যুর আতঙ্ক সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ আর বজায় থাকে না।

তত্ত্ব আলোচনার যুগে মাঝে মধ্যেই ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য রাজা জনকের সভায় এসে খেজুরে আলাপ করতেন।

একবার, তেমন আসার পর জনক জিজ্ঞেস করলেন – "কি মনে করে ঠাকুর ? ব্রহ্ম তত্ত্বের জন্য এলেন না গাভীর জন্য?" যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর – "দুইয়ের জন্য মহারাজ।" কথাটা উনি নিঃসঙ্কোচে বলেছিলেন। এবারে ভেবে দেখুন স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্যের যদি এই অবস্থা হয়, তা হলে তখনকার সাধারণ মানুষের কি অবস্থা ছিল?

ঋষিরা তাদের ইষ্টসিদ্ধি গুছিয়ে নিতে পারতেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের অভাবের দিনে উপোস করে মরা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না, কারণ রাজার কাছে তাদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ।

রাষ্ট্রব্যবস্থায় এমন কোনো বিধান ছিল না, যে খরা - অজন্মা – দুর্ভিক্ষের সময় রাজকোষ উন্মুক্ত করে তাদের খাদ্য জোগাতে হবে।

এমন নয় যে কোনো কোনো রাজা বা ভূস্বামী এটা করতেন না, তবে সেটা ছিল ব্যতিক্রম। এমন বহু তথ্য পাওয়া যায়, যখন মানুষ ভিক্ষা সংগ্রহ না করতে পারলে, তাদের অনাহারেই মরতে হত। এই সময় থেকে এগিয়ে এলে দেখতে পাব-

“দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহা রবে
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে
শুধালেন জনে জনে
ক্ষুধিতের অন্নদান সেবা
তোমরা লইবে বল কেবা ?”

রাষ্ট্রে কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকলে, বুদ্ধ তাঁর ভক্তদের এই দায়িত্ব নিতে বলতেন না, এটা এখন স্পষ্ট।

উত্তর বৈদিক তত্ত্বের যুগেও যাঁরা ব্রাহ্মণ্য এবং ব্রাহ্মণ্যেতর প্রস্থানের বড় বড় প্রবক্তা, তাঁরা ইহকাল – পরকাল –জন্মান্তর – কর্ম - কর্মফল নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন, কিন্তু যে মানুষগুলো দিনভর খেটে তাঁদের অন্ন জুগিয়েছে, তাদের খবর আর তাঁরা রাখেন নি।

অনিবার্য ফল হিসেবে, ক্ষুধার প্রকোপ রয়েই গেল সমাজে। খাদ্য সংস্থান না থাকলে এই সব আলোচনা একেবারেই নিরর্থক।

জাতির পিতা মহাত্মা গাঁধী বলেছিলেন - ক্ষুধিতের সামনে স্বয়ং ভগবানও খাদ্য ছাড়া অন্য চেহারায় আসতে সাহস পান না।

সরাসরি খাদ্য দিয়ে ক্ষুধার মোকাবিলা সেই বেদের যুগেও হয় নি, আজও হচ্ছে না। সেদিন মৃত্যু আসত “অশনায়াপিপাসের” (ক্ষুধা এবং পিপাসা) চেহারায়। মানুষ সেদিন যজ্ঞে দেবতাকে মাথা খুঁড়েও অন্ন পায় নি।

আজ, তাদের উত্তরপুরুষ আমরা এখনও সরকারের কাছে মাথা খুঁড়ছি, অথচ ওই সব বিল নিয়ে এসে আমাদের আরও উপোস করতে হবে, সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

সর্বাত্মক ঋণ :- সুকুমারী ভট্টাচার্য রচিত " বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য" বই । (চিরায়ত প্রকাশন)

দাদুর গল্প

অন্নপূর্ণা বোস

‘ও দাদু একটা গল্প বল না গো! কত দিন হল গল্প বলনি ।’

‘দুর বোকা, এই কালই বলেছিলাম ।’

‘কই মনে পড়ছে না তো!’

‘সেই যে কাগা মামা আর বগা মামার গল্প বলেছিলাম।’

‘সে কালকের কথা। আজকে অন্য একটা গল্প বলো না গো!!’

‘রাজার গল্প?’

‘না...না... বাঘের গল্প!’

‘এসো বাবু এসো তোমায় শোনাই কাহিনি,

হেথা না ছিল রাজা না ছিল কোনো রানী।

ছিল ঘন বন, পাহাড় জংগল, ঝর্ণার রাগিনী,

ছিল শ্বাপদ সঙ্কুল বস্তি, বাঘ আর বাঘিনী।’

‘কোথাকার কথা দাদু? তুমি ছিলে কি সেখানে?’

‘হ্যাঁ রে ছিলামই তো, তোরা তো জানিস আমি প্রথম যেখানে চাকরি পাই, সেটা ছিল বিহারের কোডার্মার কাছে, একটা ছোট্ট গ্রামে, যার নাম পদমা। ঘন জঙ্গল আর উঁচু পাহাড়ে ঘেরা।’

‘কি পাহাড় দাদু?’

‘ঘিয়াই পাহাড়।’

‘সেখানে কি বাঘ ছিল?’

‘বলতে? গাদা গাদা বাঘ.. এখানে গলিতে-গলিতে যেমন কুকুর বিড়াল ঘোরে, তেমনি ।’

‘দুর মজা করছ নাকি তাই আবার হয়?’

‘হাঃ...হাঃ...হাঃ...’ দাদু মন খুলে হাসতে লাগলেন ।

‘ও রে ...আজকের দিন আর তখনকার দিন কি এক রে? অনেক তফাৎ। সে সব দিন আজ আর কল্পনাও করা যায় না। আজ থেকে ষাট বছর আগের কথা। ভারত তখন মাত্র স্বাধীন হয়েছে। না ছিল রাস্তা-ঘাট, না ছিল বিজলি বাতি, আর না ছিল টেলিফোন মোবাইল। ছিল পোষ্ট-অফিস, টেলিগ্রাফ-অফিস, ছিল মোমবাতি, হেরিকেন বা লম্ফ-বাতি, বিয়ে-শাদি হলে হ্যাজাক বাতি। আর গাড়ি কি ছিল জানিস? গোরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, এই পাহাড় জঙ্গলে চলতো ডুলি। গরিবরা বেশির ভাগ চলতো পায়ে হেঁটে।’

‘উঃ.. কি বলছ? কিন্তু বাঘ ছিল বললে যে?’

‘হ্যাঁ রে, বাঘ ছিল তো। একটু অসাবধান হলেই বাঘের জলখাবার হয়ে যেত। তাই তো নাম হয়েছিল হাজারিবাঘ, মানে হাজার-হাজার বাঘ।’

নাতি-নাতনি দাদুর আরো কাছ ঘেঁষে বসে বলল -

‘বল-বল। ভয় লাগছে, কিন্তু ভালোও লাগছে। তখনকার দিন খুব অ্যাডভেঞ্চারাস ছিল, না? তোমার কেমন লাগে আগের কথা ভাবতে?’

“‘হাঃ...হাঃ...হাঃ...’ দাদু আবার মন খুলে হাসতে লাগলেন।

‘ও রে....বুলবুলিতে ঝিংগুর গাঁথা সেই একদিন ছিল,

তাল-আঁটিতে, শর-কাঠিতে এই একদিন এল...’

যত কঠিনই হোক, তার তুলনা হয় না রে, হয় না, বুঝলি?”

“তুমি বাঘ দেখে ছিলে?”

‘হ্যাঁ রে, বাঘ দেখে ছিলাম, অনেক বার।”

“বল না, বল বল,” নাতি-নাতনি দাদুর আরো কাছ ঘেঁষে বসে বলল।

শীতকাল। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে-ধীরে চেপে-চেপে বসছে। আজ লোডশেডিংয়ের জন্য বিদ্যুত সাপ্লাই নেই।

দাদু গলা ঝেড়ে বললেন - "তা নাহয় বলব, আগে যেয়ে মাকে গরম-গরম চায়ের জন্য বলে আয়, তার সঙ্গে কিছু –টা! বুঝলি তো?" বলে আবার হাসতে লাগলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে চা ও গরম-গরম তেলেভাজা এসে গেল। হেরিকেন বাতিও এল।

নাতি-নাতনির সাথে খেতে খেতে শুরু করলেন দাদু:

"সেদিন রবিবার ছিল। হসপিটালের ছুটি। আমাদের ওয়ার্ডবয় ছোটনরাম আমার আউট হাউসে থাকত বউ-বাচ্চা নিয়ে, কারণ তার গ্রাম কুটিপিসি পদমা থেকে অনেক দুর ছিল। মাত্রই চা শেষ করেছিলাম, আমাদের কম্পাউন্ডার ওঝাজী এসে হাজির।

চা-খেয়ে ওঝাজী বলল – বউ মায়কা গেছে তোমার সাথেই খাবো দুপুরে; রান্না আর একার জন্য কে করে।

বললাম – খুব ভাল। কি খাবে ছোটনরামকে বলে দাও।

ওঝাজী বললে - মটন খাব, বকরা-- আ—রে, ছোটনা--?

এল ছোটনা বলল – জী হুজুর...

- এক ঠো বকরা লা। একদম ফসক্লাস করকে পাকা। পহিলে নাস্তা খিলা। পুড়ি-সবজি জা-জা-জলদি জা – বলল ওঝাজী।

জলখাবারের পরে ছাগল কেনার আমি পয়সা দিলাম।"

নাতি – "ও বাবা, একটা গোটা ছাগল?"

দাদু – "তখনকার দিনে গ্রামে মাংসর দোকান তো হত না, লোকে হাট থেকে নিজের দরকার মতো জ্যান্ত ছাগল কিনে এনে কেটে রান্না করত।"

নাতনি – "কত দাম একটা গোটা ছাগলের?"

দাদু – "তখনকার দিনে একটা গোটা বড় মোটা ছাগলের দাম খুব বেশি হলে একটাকা ছিল, নয়তো আট আনা বা বারো আনাতেও পাওয়া যেত।"

নাতনি – "কত ভাল, না?"

চা ও গরম গরম তেলেভাজা শেষ হয়েছিল।

দাদু গলা ঝেড়ে বললেন - "যা তো রে, যেয়ে মাকে আরেক বার গরম-গরম চায়ের জন্য বলে আয়, তার সঙ্গে কিছু টা হলে হয়। যা না একটু পাঁপড় ভাজা বলে আয়।"

নাতি-নাতনির আজ খুব মজা, একে লোডশেডিং, পড়াশোনা নেই, ওপর থেকে দাদুর সাথে লেপের ভিতর বসে গরম-গরম তেলেভাজা, পাঁপড় ভাজা খেতে-খেতে ততোধিক গরম গরম গল্প.....আঃ এই না হলে জীবন?

কিছুক্ষণের মধ্যে চা ও গরম-গরম পাঁপড় ভাজা এসে গেল।

আবার শুরু হল গল্প.....

"একটা গোটা ছাগল রান্না হবে, ছোটনরাম ওর বউ-বাচ্চাদের ডেকে আনল সাহায্যের জন্যে। ওরা পেঁয়াজ-রসুন ছাড়াতে, মশলা তৈরি করতে লাগল। ছোটনরাম গেল হাটে। রবি ও বৃহস্পতি বার হাট বসত পদমায়, অন্য দিন, কুটিপিসি বা ঢেবাদরী বা পাশের অন্যান্য গ্রামে হত।

ছোটনরাম গেল হাটে, ও ছাগল আনবে, কাটবে, রান্না হবে তারপরে খাওয়া। তার অনেক দেরি। আমরা বসলাম তাস খেলতে। কি করবে? কোন কাজই তো নেই।

ছোটনরাম যে গেল তো গেল, আসেই না আর। আমাদের চিন্তা বাড়তে লাগল। কি হল? হাটের থেকে আসতে এত দেরি তো লাগে না। শেষে বেলা প্রায় তিনটেয় সে ফিরল -- হাতে দুটো বড় বড় মুরগি।"

নাতি-নাতনি এক সাথে চ্যাঁচালো-"মুরগি"?

দাদু – "হ্যাঁ, ওঝাজী ও ঠিক ওমনি ভাবেই চিৎকার করে তাড়ল ছোটনরামকে। বলল - এত বড় হাটে একটা ছাগল পেলি না? তাও এতো দেরি? খিদেতে বত্রিশ নাড়ি জ্বলে যাচ্ছে...

এই মারে তো এই মারে বেচারা ছোটনরামকে। কোন রকমে তাদের শান্ত করে ছোটনরামকে জিজ্ঞেস করলাম - হল টা কি?

ছোটনরাম বলল - ডাগদরসাব, হামি বকরা কিনে হাট থেকে ফিরছিলাম। বেলা বারোটা হবে সাব, সাথ মে ছিল লোটনরাম। বকরাটা হামি কান্ধে পর লিয়েছিলাম হুজুর...

ওঝাজী আবার হুংকার ছাড়ল - বুজরুকি? তো সে বকরাটা গেল কোথায়? পলাইয়া গেল?...হুঃ.....

ছোটনরাম - বিশওয়াস করিয়ে সাব, মেমনাটাকে একবার চিল্লাতে শুনলাম, পিছন থেকে ধাক্কা খাই গির গিয়া হুজুর... লোটনরামকো ভী চিল্লাতে শুনলাম, 'শেরওয়া রে!

...শেরওয়া রে!' মুন্ডি উঠাই দেখলাম বিরাট একটা শের হামদের মেমনাটারে লিয়ে জংগলের দিকে ভাগছে.....বিশওয়াস করিয়ে হুজুর...দেখুন গিরনেসে মাথা মে চোট ভী লাগা হুজুর.....

দেখলাম কথাটা খুব মিথ্যা নয়, চোট তো লেগেছে, রক্ত বেরিয়ে শুকিয়ে গেছে ।

আমি বললাম - বটে, তো এত দেরি করলি কেন?

ছোটনরাম বলল - উঠে দেখা হুজুর লোটনরাম বেহুঁশ পড়া আছে। কোনরকমে উকে হোঁস মে লাই হুজুর, ফির উকো গাঁও লিয়ে গেলি হুজুর, ইতনা পাশ থেকে শেরওয়াকো দেখে বেহুঁশ ভয়া হুজুর.....উকে ছাড়তে তো কৈসে? বাদমে হুজুর গাঁওসে মুরগি ঢুঁঢকে লাই হুজুর.....ও ভী এক জায়গামে নহি মিলা হুজুর, বহুত ভটকি হুজুর বড়ি মুরগি মুশকিল মে মিলা

আমি বললাম - হুঁ, পয়সা তে হয়েছে?

ওঝাজী - ওসব বাদমে, এখন খাবার কি হবে? আমার পেটের ভিতর মে চুহা নেহি, শের কুদছে ছোটনা, শের কুদছে। জলদি খেতে না দিলে আমি তোরেই খেয়ে যাব বলে দিলাম.....পালা!

একটু পরে ছোটনরাম এসে খবর দিল ওর বৌ ওর দেরি দেখে ছোলার ডাল, রুটি আর আলু কি তরকারি করে রেখেছে, ইচ্ছা করলে আমরা তক্ষুনি খেতে বসতে পারি । বলার দেরি ছিল, আমরা সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লাম খেতে।"

"তাহলে মুরগিটার কি হোলো?"

"সে আরেক ঘটনা", বললেন দাদু

"বল না, বল না"

"বিকেলে মুরগিগুলো মারা হল, রান্না চাপলো। আমরা আবার বসলাম তাস খেলতে। রাতের প্রায় সাড়ে আটটা বাজল। তাস আর কতক্ষণ খেলা যায়। ওঝাজী খাওয়ার কত দের জিজ্ঞেস করল। দেখে এসে ছোটনরাম বলল - আধা ঘন্টা।

খানিক পরে ওঝাজী খাওয়ার কত দেরি জিজ্ঞেস করল।

দেখে এসে ছোটনরাম আবার বলল - আধা ঘন্টা।

প্রায় দশটার ওঝাজী খাওয়ার কত দেরি আবার জিজ্ঞেস করল।

দেখে এসে ছোটনরাম আবার বলল - আধা ঘন্টা ।

এবারে ওঝাজীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বলল -তু মুরগি পাকাতা কি পথর পাকাতা রে? লাগতা তেরেকো পাকানা পড়েগা...

বলে একটা ঘুঁষি পাকালো। দেখেই ছোটনরাম দৌড়ে ভিতরে চলে গেলো। দশ মিনিট পরে এসে বলল – হুজুর খানা তৈয়ার...

খেতে বসলাম, মুরগির ঝোল আর রুটি।

আমি বেশ খাচ্ছিলাম। হটাৎ ওঝাজী বলল –"আরে ছোটনা, বোটি লা...শুধু ঝোল আর ঝোল ...আর দো-চার হাড্ডি...একি? কা ভয়া ভই?

ছোটনরাম বাটিতে মাংস এনে দিল ওঝাজীকে। ওঝাজী বাটিতে আঙুল চালিয়ে দেখে যা বলল ছোটনরামকে গালাগাল দিয়ে, তার সার মর্ম হল এই যে সে সমস্ত বোটি (মানে মাংসের/মুরগির বড় টুকড়ো) ঘরে আগেই পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের ঝোল আর হাড্ডি খাওয়াচ্ছে।

ছোটনরাম - ভগবান কসম বাবুজি, ভগবান কসম ডাগদরসাব, হমলোগ ভূখা আছে নহি খায়া বাবুজি...

ওঝাজী হুংকার ছাড়ল - বুজরুকি? যা হান্ডি লা, আভি দুধ কা দুধ পানি কা পানি হবে।

ছোটনরাম মুরগি মাংসের হাঁড়ি আনল, দেখা গেল তার মধ্যেও ওই রকমই সুরুয়া মত জিনিষ আর হাড় ছিল।

ওঝাজী অবাক হয়ে গেল। বলল – হলটা কি ?

অনেক জিজ্ঞেস করার পর যা ছোটনরাম বলল তার সারমর্ম হল এই যে বড় মুরগি বলে মুরগিটা বুড়ো ছিল, তাই নরম হচ্ছিল না, সে বাবুজির (ওঝাজী) কড়া বকুনি মুরগিমাংসের মধ্যে একমুঠী খাবার সোডা ঢেলে দেয়। ফলে মুরগিমাংস হয়ে যায় মুরগির সুরুয়া। ও খায় নাই বা সরিয়েও রাখে নাই।"

নাতি-নাতনি হাত তালি দিয়ে হাসতে লাগল। সেই সময় ঘরের সব আলোগুলো এক সাথে জ্বলে উঠল।

দাদু বললেন – "আলো জ্বলে গেছে। আর গল্প নয়। কাল হবে আবার।"

নমুনা

দেবুমু

সমস্যাটা যে আসলে কি, তা বলার আগেই ডাক্তারবাবু হাতে রবারের এককালীন দস্তানা পরে প্রথমে অমলবাবুর দু'চোখের নিচের পাতা টেনে টেনে দেখলেন, ছোট্ট একটা অতসীকাঁচ লাগান ফাউন্টেনপেন টর্চ দিয়ে কানের ভেতরটা পরখ করলেন, নাড়ী দেখলেন, জিভের ওপর একটা কাঠের চামচে ঠেকিয়ে মুখগহ্বর পরীক্ষা করার পর, বেশ গুরুগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন

- সিগারেট-টিগারেট খাওয়া হয়?

- আঁজ্ঞে, না, শুধু বিড়ি। টাটকা হাতেবাঁধা বিড়ি।

পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ডাক্তারবাবুকে দেখাতে উনি একটু অধৈর্য হয়ে বলেন

- আরে মশাই, ওই একই হল। ওটা টিগারেটের দলে। হুঁকো, কলকে, বিড়ি, যাই টানুন না কেন, বেচারা ফুসফুসটির দফা একেবারে রফা। কাশিটাশি হয় ?

- আজ্ঞে, না। শুধু পেট কামড়ায়।

- বিড়ি খেলে পেট কামড়ায়? এ তো ভালো কথা নয়।

- আজ্ঞে, শুধু জল খেলেও চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠে ।

- ও, পেটের গোলমাল বুঝি। দিনে কবার করে হয়? ওসব বিড়িফিড়ি খাওয়া ছেড়ে দিন। ভীষণ খারাপ অভ্যেস। কি নাম বললেন ?

অমলবাবু মুখ ঘুরিয়ে ডিসপেনসারির এদিক ওদিক চেয়ে দেখতে নজরে পড়ল ডাক্তারবাবুর টেবিলে রাখা পানামা সিগারেটের প্যাকেটটার ওপর। মুখে নিজের ভালো নাম জানিয়ে অমলবাবু বলেন

- আজ্ঞে, সেই জন্যেই তো আপনার কাছে আসা। কদিন ধরেই নিখোঁজ। ভেতরে কেবল হুড়ুম গুড়ুম, তর্জন গর্জন, ব্যস, আর কোন পাত্তা নেই।

- জোলাপটোলাপ নিয়ে দেখেছেন?

- কিছুই করতে বাকি রাখিনি। হেনতেন, টোটকাটুটকি, তেল দিয়ে পানের বোঁটা, যে যা বলেছে, সব করে দেখেছি। কিছুতেই কিছু হয়নি। আর পারছি না, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু এবার অমলবাবুকে পাঞ্জাবীটা একটু ওপরদিকে তুলে ধরার ইঙ্গিত দিলেন। পেট টিপে সবে পরীক্ষা করতে যাবেন, অমলবাবু ককিয়ে উঠলেন

- আঃ, লাগছে।

- পেট তো একেবারে শক্ত ইঁট, জিভের রঙটা দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম আপনি জিভছোলা ব্যবহার করেন না, এখন সে ধারণা পাল্টে গেল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বেশ কয়েকদিন খোলসা হয়নি।

তারপর একটু ধমকের সুরে বলেন, আপনি না পুরুষমানুষ, আপনি এত ঠুনকো স্পর্শকাতর কেন বলুন তো? মেয়েমানুষ হয়ে প্রসবব্যথা উঠলে কি করতেন মশাই?

ঠোঁটকাটা ডাক্তারবাবুর ওপর রাগ হলেও অমলবাবু সেটা বাইরে প্রকাশ না করে বলেন

- অবাকের কথাটা কি জানেন? আমাদের সারা গাঁয়ে ওলাওঠার প্রকোপ। আর আমার মরতে এমন দশা কেন হল বলুন তো, ডাক্তারবাবু? উঠতে বসতে কোন স্বস্তি নেই, কেবলই পেটে মোচড় দিচ্ছে।

- কি বললেন, আপনি গাঁয়ে থাকেন? কোন গাঁয়ে? আমার ফি কত জানেন তো?

- ভাতারমারি গাঁয়ে।

- সে আবার কোন চুলোয়? কেন, গাঁয়ে কোন ডাক্তার নেই?

- থাকবে না কেন? কিন্তু আমি তো অফিসের কাজে সারাটা দিনই এই শহরে। তাই ভাবলাম এখানেই কোনও ভালো ডাক্তারের কাছে ভালো করে চেক করিয়ে নিই । ফি-এর কথা ভাববেন না, অফিসে মেডিকেল বিল করে দেবো, আপনার পুরো ফি, ওষুধপত্তরের সমস্ত দাম কড়ায়গণ্ডায় মিটিয়ে দেবো।

- না, না, এখানে ধার বাকি চলে না। সব নগদে কাজ। কি নাম বললেন যেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, অমলবাবু। আচ্ছা, অমলবাবু, পারলে তাহলে আজকেই দিয়ে যান, আমি রিসেপসনে বলে দিচ্ছি, মলমূত্র পরীক্ষা করা দরকার। খালি পেটে না এলে অবশ্য রক্তটা নেওয়া যাবে না।

- রক্তটা এখনই নিয়ে নিন। আমি এখন অবধি কিছু মুখে দিইনি।

মনে মনে অমলবাবু ভাবেন, সে গাঁয়ের কিশোরীডাক্তারই হোক বা অন্য কোথাকার, সব শালাই এক। রক্ত নেবে, তাতেও এত ধানাইপানাই, শুষতে তো কিছু বাকি রাখলে না। এটা এখন আমার দায়, তাই মুখ বুজে সব সহ্য করতে হচ্ছে।

- সেকি, এত বেলাতেও কিছু খান নি? তাই তো বলি, আপনার পেটটা এত কুঁইকুঁই করছে কেন? সময়মত না খেলে চলবে কেন?

- মুখে অরুচি হলে কি করব? আমি ডিব্বাটা নিয়ে যাই। বাড়িতে বসে ধীরে সুস্থে কয়েকবার চেষ্টা করে দেখব। আর হলেই টাটকা পৌঁছে দেব।

- এ অবস্থায় কিন্তু আপনার রোজ অফিস-বাড়ি যাতায়াত করা চলবে না। কম করে এক হপ্তা ছুটি লিখে দিচ্ছি। নাকি আরও বেশি করে কয়েকদিন লিখে দেব, কি বলেন? এ অবস্থায় গাড়ির ধকল মোটেই ভালো নয়।

রক্ত দেওয়ার পর অমলবাবু ডিব্বাটা নিয়ে বেরিয়ে পরলেন রাস্তায়। ভুরভুর গন্ধ নাকে এল। খাবারের গন্ধ। সামনে তাকিয়ে দেখলেন একটা খাস্তা হিংয়ের কচুরির দোকানের সাইনবোর্ড। দারুণ বিজ্ঞাপন। ছোট্ট হেলানো অক্ষরে লেখা।

"***এইখানে আপনি না খাইলে, আপনি ও আমি দুজনেই মরিব – অনাহারে*** ।"

পাশাপাশি আরও অনেক দোকান। ফুলুরি, বেগুনি, আলুর চপ, শিঙাড়া, মোগলাই মাংস, পরোটা, বিরিয়ানি, মাটন-রোল, ভেজিটেবিল চপ। আরও কত কি। নোলায় জল এসে গেলেও উপায় নেই আজ।

হঠাৎ পেটে মোচড় মারতেই দু'হাতে তলপেট আঁকড়ে ধরে একটু কুঁজোর মত কুঁচকে গেলেন অমলবাবু। কে এক পথচারী পাশ দিয়ে যাবার সময় টিপ্পনি কেটে বললেন, কি দাদা, তবিল সামলাচ্ছেন? সব ঠিকঠাক আছে তো?

একধারে ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে, অন্যদিকে একনাগাড়ে যন্ত্রণা। বড় দোটানায় পড়েছেন অমলবাবু। তাছাড়া খাদ্যের গুণমানের ওপরেই নির্ভর করে শেষমেশ পরবর্তী উৎপাদিত বস্তুটি কি ধরনের রং ধারণ করবে। আজেবাজে কিছু খাওয়া চলবে না। পরীক্ষায় সব ধরা পড়ে যাবে। ডাক্তারবাবু নিশ্চয় মন্তব্য করবেন, কিসব ছাইপাঁশ খেয়েছেন বলুন দিকি। জেনেশুনেও কষ্ট যদি নিজে তৈরি করেন, শুধু ওষুধে কি আর তা প্রশমন হবে?

ভেতরে যা জমে আছে, তা বাইরে কি মূর্তিতে আসবে কে জানে। কেমন আকার, কেমন প্রকার, কিছুই ভাবতে পারেন না অমলবাবু। শুধু মনে মনে একটাই আশা, আকারটা আর যাই হোক, একেবারে জলাকার না হলেই চলবে। আর প্রকার বলতে রংটাই ধরা যাক। কারণ গন্ধের তেমন কোন হেরফের নেই, যাই খাও, অকৃত্রিম ও অমলিন। তাই অমলবাবুর ভাবনা হোল বর্ণ নিয়ে। ঝুলের মত কালো না হলেই হোল। ভাসা ভাসা ফ্যাকাশে কোন রংও মনে ধরেনা। বাদামিও নয়। এই, সোনালির কাছাকাছি হলেই বাঁচি। আর লোকে যদি দেখেও ফেলে, তাতে বয়েই যাবে অমলবাবুর। বাস্তবিক, সোনালি রংয়ের এই বস্তুটি আজ যে সোনার চেয়েও দামি, এই কথা ভেবে অমলবাবুর মনে কেমন যেন তৃপ্তি জাগে। গাঁ ফেরতা আবার আসতে হলে অনেক সময় লেগে যাবে। ট্রাম স্টপেজের কাছে এসে এই লাইনের ট্রামের নম্বরটা আর স্টপেজের উল্টোদিকে ওষুধের দোকানের বিজ্ঞাপনটা দেখে হঠাৎ অমলবাবুর মনে পড়ে গেল বড়মামার কথা। সস্তায় ইনসুলিন পাওয়া যাচ্ছে। একসঙ্গে গোটা দশেক প্যাকেট কিনে নিলে মন্দ হয়না। মাসে মাসে তিনিই মামাবাবুর জন্যে নিয়মিত ইনসুলিন কিনে দিয়ে আসেন। আগাম জোগান পেয়ে নিশ্চয়ই খুশি হবেন। ডাক্তারখানা বন্ধ হতে এখনও ঘণ্টা পাঁচেক সময় আছে। ডিব্বাটা তার আগেই যদি পুরো করার সুযোগ হয়, আজকেই ফের এসে ডাক্তারখানায় জমা দিয়ে দিতে পারলে ঝাড়া হাত-পা। যত শীঘ্র ততই কুশল। দুজনেরই স্বস্তি। অনুসন্ধানের পর একটা রায় দিয়ে কিছু উপার্জনের তৎপরতায় ডাক্তারবাবু, আর যন্ত্রণামুক্তির আশ্বাস পাবার প্রতীক্ষায় অমলবাবু। নেহাৎ দরকার পড়লে আজ মামার বাড়িতেই থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেবার কথা মাথায় আসতেই চিন্তার খেই হারিয়ে গেল। ট্রাম এসে গেছে। ভিড়ে ভিড়াক্কার। ধাক্কাধাক্কি, গুঁতোগুঁতিতে কিছুক্ষণের জন্যে পেটের ব্যথার কথাটা বেমালুম ভুলেই গেলেন অমলবাবু।

অনেকদিন পর অমলকে দেখে মামাবাবু কটাক্ষ করে বলেন, কি রে, অম্লা, এ্যাদ্দিন বাদে যে, হঠাৎ খেয়াল হল, দেখতে এলি তোর মামাটা আছে না গেছে। আজ কাজে বেরোসনি?

- কাজ থেকেই তো আসছি, ছুটি নিয়ে নিলাম। বেশ সস্তায় পাওয়া গেছে, আপনার জন্যে ইনসুলিন কিনে এনেছি।

- বেশ, বেশ, ভাল কথা, আয় আয়, ভেতরে আয়। জুতো খোলার কোন দরকার নেই, কতক্ষণই বা থাকবি। কাজের লোকটা কিন্তু কয়েকদিনের জন্যে ছুটি নিয়ে দেশের বাড়িতে গেছে। কিছু খাবার দরকার হলে ওই সাধনের দোকান থেকে কিছু শিঙাড়া টিঙাড়া কিনে আন। আমার নাম করে বলবি, দাম দিতে হবে না। আমার বরাদ্দ খাবার তো আর তোকে খেতে দিতে পারিনা। বহুমূত্র রুগির খাদ্য। দুধে ভেজান পাঁউরুটি আর শেষে এক গেলাস হরলিকস। অফিস থেকে তোর এনে দেওয়া হরলিকসও প্রায় শেষ হয়ে এল। তা তোর ভাইবোন কেমন আছে? রানীরও বহুদিন কোন খবর নেই।

অমল শুধু বলে, "আপনি অত ব্যস্ত হবেন না। এই মুহূর্তে আমার তেমন কোন ক্ষিদে নেই। তাছাড়া পেটটা আজ একটু বেগড়বাই করছে। আপনার ইনসুলিনটা না পেলে হয়তো আসাই হত না। জুতো খুলতেই হবে, একবার একটু বাথরুমে যেতে হচ্ছে।"

মামাবাবু ছোট্ট করে বললেন, "ও, বাথরুমে যাবি, তাহলে নিচের তলার চৌবাচ্চা থেকে এক বালতি জল তুলে নিয়ে আয়, চেনটানা সিস্টার্নটা কদিন যাবৎ বিগড়ে বসে আছে। কলের মিস্ত্রিকে খবর দিয়েছি, কিন্তু ওরা এখন লাটসাহেব, মর্জি হলে তবে আসে।"

অমল বালতিভরা জল আর ডিব্বাটা নিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়েন ।

অনেকবার বেগ দিতেও নট-নড়ন-চড়ন-নট-কিচ্ছু। ভালোয় ভালোয় খোলসা হলে আজই ডিব্বাটা পৌঁছে দেওয়া যাবে, কিন্তু কখন যে আসবে... অমলবাবু যখন প্রায় হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেবার কথা ভাবছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে নতুন বেগ আসাতে তাঁর মনটা পুলকিত হয়ে উঠল। ডাক্তারখানা

থেকে বেরিয়ে আইসক্রিমওয়ালার কাছ থেকে একটা বোঁটাওলা আইসক্রিম কেনাতে লোকে হয়তো ভেবেছিল, মাথায় ছিট না থাকলে এই ঠাণ্ডায় কেউ বরফ খায়। কিন্তু অমলবাবুর দূরদৃষ্টির তারিফ না করে পারা যায় না। ডাক্তারখানা থেকে চামচ জাতীয় একটা কিছু নিতে ভুলে গিয়ে অমলবাবু হিমসিম খাচ্ছিলেন ভেবে, মালটা ডিব্বায় ভরবেন কি করে? আঙুল দিয়ে ছুঁলে কে জানে কি ধরণের বীজাণু কিলবিলিয়ে ঢুকে পড়ে এই অমুল্য সম্পদের মান ও গুণ সব ওলটপালট করে দেবে। ফুটন্ত জলে শুদ্ধ করে নেওয়া বরফের কাঠিটা দিয়ে কুরে কুরে ডিব্বার কানায় কানায় ভরে ফেলার পরেও অমলবাবুর যেন মন পোষে না, কারণ একটা দফা শেষ হলেও পেটের ব্যথাটা আবারও থেকে থেকে চাগাড় দিতে শুরু করেছে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে জুতো পরতে পরতে অমলবাবু তাঁর বড়মামাকে বললেন, একবার ডাক্তারখানা থেকে ঘুরে আসি। এটা আজই জমা দিতে হবে। বলে অমলবাবু পাঞ্জাবির বুকপকেট থেকে ডিব্বাটা বের করে দেখান।

অমলের হাতে ওটা কি ঠিক বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করেন, কি ওটা ?

- নমুনা। বললেন অমলবাবু। পরে এসে আপনার সঙ্গে বিশদ আলোচনা করব। এখন চলি। এটা পৌঁছে দিয়ে আসি।

মামাবাবু বলেন, যাবি যা, কিন্তু সদর দরজাটা যাবার সময় ভালো করে টেনে বন্ধ করে দিস। নইলে দরজা খোলা পেয়ে রাস্তার ঘেয়ো নেড়িকুত্তাগুলো কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ভেতরে সেঁধোবে।

অমলবাবু বেরিয়ে গেলেন। বাইরে থেকে সদর দরজাটা টেনে দিতে শুনতে পেলেন, দরজার নীচের ভারি লোহার ছিটকিনিটা খুটুস শব্দ করে মেঝের নির্ধারিত গর্তের মধ্যে পড়ে আটকে গেল।

মামার বাড়ি থেকে সত্যি কথা বলতে কি ডাক্তারখানা খুব একটা দূরে নয়। তবু আসার সময় ট্রামে করে আসতে হয়েছিল। তাড়া ছিল বলে। এখন একটু সুরাহা হয়েছে। তাই অমলবাবু ভাবলেন, হেঁটেই যাবেন। আধাআধি পথ পেরিয়ে দম ফুরিয়ে যাবার জোগাড়, কেমন যেন কাহিল হয়ে পড়েছেন মনে হল। ওই তো সামনে পার্ক। মিনিটখানেক জিরিয়ে নিলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না। বাঃ, বেঞ্চটাও খালি। বসি, একটু বসি। বুক পকেটে রাখা ডিব্বাটা একটু বেখাপ্পা উঁচু হয়ে থাকায় কেমন যেন কদর্য দেখাচ্ছিল। অমলবাবু পকেট থেকে সেটা বের করে একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। তারপর ডিব্বাটা বেঞ্চির ওপর রেখে পেটে হাত বুলিয়ে বুঝতে পারলেন, সেই আগের মত শক্ত ইটের ভাবটা ধীরে ধীরে উবে যাচ্ছে। সাবধানের মার নেই, নমুনা পরীক্ষা করিয়ে সঠিক কারণ না জানা অবধি মনে স্বস্তি নেই। আজই যে তা ডাক্তারবাবুকে দেওয়া যাবে, মামাবাবু কাছাকাছি না থাকলে কি এত সহজে উপায় হত? লোকে বলে, মামা, কাকা না থাকলে কিছুই হয়না। কেন, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজ হাতেনাতে পেতে চলেছেন অমলবাবু।

একটা ঘুড়ি কেটে এসে পড়লো সামনের বকুলগাছটায়। অনেক সুতোসমেত। না, এখনও কাউকে ঘুড়ি ধরতে ছুটে আসতে দেখলেন না অমলবাবু।

ছোটবেলাকার কথা মনে পড়ে যায় অমলবাবুর। অমলবাবুর মা তখন তাঁর বড় ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অমলবাবুর ছোটবেলার ঘটনাগুলো তাই এই বড়মামার সংসারে বা তার আশেপাশের ঘটনা নিয়ে।

দিনক্ষণ ধরে রোজনামচার আকারে সে সব ঘটনা মনে না থাকলেও, কিছু কিছু ঘটনা উল্কির মত পাকাপাকিভাবে মগজে লেখা হয়ে গেছে। শুধু গল্প বলার মত ঘটনার ছবিটাই নয়, তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত গন্ধ, স্বাদ, মনের অনুভুতিগুলোও মিশে আছে। তাই এখনও সে সব ছবির

কথা মনে পড়লে, গন্ধটাও ভেসে আসে নাকে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে টানা বারো বছর বয়স পর্যন্ত অমলবাবুকে থাকতে হয়েছিল বড়মামার বাড়িতে।

অমলবাবু লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন না। না, বড়রা উঠতে বসতে তাঁকে গবেট বললেও সম্পূর্ণ গণ্ডমূর্খ তাঁকে বলা যায় না। কিন্তু ছোটবেলায় কিছুতেই তাঁর ঠিকমত মাথায় ঢুকত না, কেন তাঁকে রোজ রোজ স্কুলে যেতে হবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্কুলে বসে রসকষহীন বইয়ের পাতা থেকে মাথায় না ঢুকলেও মুখস্ত করা বুলি কপচে বাহবা পেতে হবে। অন্যথায় চিঠি যাবে বড়মামার কাছে, আপনার ভাগ্নে ইস্কুলের পড়া করেনি। ক্লাশ চলাকালীন, অন্য ছেলেদের সঙ্গে হুজুগে মেতে ছ্যাবলামি করেছে। বাড়ীতে দেওয়া অঙ্ক না করেই ইস্কুলে এসেছে। আর ক্লাশ ছেড়ে বারবার বাথরুমে গেছে। ... ইত্যাদি... ইত্যাদি...

লেখাপড়ার কি গুরুত্ব এবং কেন, তা অমলবাবুকে বড়দের কেউই বুঝিয়ে বলার মত করে বলতে পারেন নি। তাই অমলবাবুর মনে ছিল কেবল, সুযোগ পেলেই ফুটপাতে গিয়ে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে গজি, পিট্টু, ক্রিকেট কিংবা ফুটবল খেলা। এসবে পাতার পর পাতা মুখস্তের কোন বালাই ছিল না।

রবিবার কিংবা কোন ছুটির দিনে অমলবাবু সে সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হতেন। কারণ তখন পাড়ার ফুটপাতগুলো বয়স্ক ছেলেদের দখলে চলে যেত। বড়দের সঙ্গে খেলতে চাইলে, দূর দূর করে ভাগিয়ে দিতেন। অগত্যা ভিড়ে যেতেন অমলবাবু আর তাঁর সমবয়সি ছেলেরা মেয়েদের দলে। মেয়েলি খেলা খেলত, চু-কিত-কিত, এক্কাদোক্কা, নয়ত কানামাছি। অমলবাবু মেয়েদের দলে বেশ পসার জমিয়ে বসেছে দেখে বড়রা তাঁর নাম দিয়েছিলেন, মেয়েদের কাপ্তেন। প্রথম প্রথম চটে গেলেও মুখে কিছু বলতে সাহস হত না। পরে মেয়েরাই তাঁকে বুঝিয়ে বলেছিল, আসলে কি জানিস, বড়রা তোকে কেন খ্যাপায়? বড়রা তো তাঁদের সমবয়সি মেয়েদের সঙ্গে সোজাসুজি

মিশতে পারেন না, তুই যেমন পারিস, তাই তাঁরা তোকে হিংসে করেন। দেখছিস না, বাড়িগুলোর সব বারান্দা থেকে কত জোড়া চোখ ওদের শ্যেনদৃষ্টির নজরে রাখছে। কেউ যেন কোন খুনসুটি বাধিয়ে না বসে। বয়স বাড়লে, ছেলেমেয়েদের এই একসঙ্গে মেলামেশাটা একটু গোলমেলে ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তুই ছোট আছিস, ভালোই আছিস। আমাদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার কত সুযোগ পাচ্ছিস। ওই দাদাদের মত বড় হয়ে গেলে দেখবি, তোকে নিয়ে কোন মেয়েই আর একসঙ্গে চানঘরে ঢুকবে না। এত জটিলতা সেদিন অমলবাবুর মাথায় ঢোকেনি বলেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, সময় কাটানোর অন্য নতুন পথ। সেখানে ব্যাটাছেলে, মেয়েছেলের সমস্যার জটিলতা নেই। ঘুড়ি ওড়ানো।

সুযোগ পেলেই অমলবাবু ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়াতেন। চড়চড় করে টেনে কত ঘুড়িই না তিনি ভো-কাট্টা করে দিয়েছেন, কে জানে।

তার জন্যে কত বকুনি আর মারধরই খেয়েছেন বড়মামার কাছে। ঘুড়ির নেশায় লেখাপড়া চুলোয় যাচ্ছে, সেটা তেমন আলোচ্য বিষয় বলে প্রাধান্য পায়নি। কিন্তু বড়মামার আয়না দেওয়া ফুলের কাজ করা কাঠের আলমারির সবচেয়ে ওপরের তাকে, যেটা দশ বছরের অমলবাবুর নাগালের বাইরে ছিল, একরাশ ধুতি পাঞ্জাবির নিচে লুকনো এক'শ টাকার নোটখানা উধাও হল, ঠিক সেদিনই পাশের বাড়ির রাতদিনের চাকর, কি যেন নাম ছিল তার, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, অর্জুনদা, এক ঘুড়ি ওড়ানোর বাজিতে হেরে গিয়ে খেসারৎ বাবদ বাজার থেকে হাজার গজ সবুজ রঙের মাঞ্জা দেওয়া সুতোসমেত লাটাই কিনে অমলবাবুকে দিয়েছিল।

ওপরের দিকে তাকিয়ে অমলবাবু দেখলেন, ঘুড়িটা গাছে আটকে জিরোচ্ছে। পাতার আড়ালে ওটাকে কেউ খুঁজে না পেলে, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে নির্ঘাত ফর্দাফাঁই হয়ে যাবে। নিজের দরকার না থাকলেও হয়তো অন্য সময় হলে অমলবাবু গাছের ঘুড়িটা পেড়ে আনতেন। কিন্তু

আজকের পরিস্থিতি একেবারেই উপযুক্ত নয়। বেঞ্চের পেছনে ঝোপের আড়ালে শুকনো পাতার খড়খড় আওয়াজ শুনে, সম্বিত ফিরে পেয়ে অমলবাবু সেদিকে তাকালেন একবার। কিছুই দেখতে পেলেন না। জনশূন্য পার্ক। পুরনো দিনের স্বভাবের প্রভাবে অমলবাবু উঠে দাঁড়ালেন। কেউ কোথাও নেই দেখে সটান গাছে উঠে পৌঁছে গেলেন ঘুড়িটার কাছে। সুতো ধরে বুড়ো আর কড়ে আঙুলের মাঝে পেঁচাতে লাগলেন। কত গজ হারিয়েছে কে জানে। হয়তো লাটাইয়ের একেবারে গোড়া থেকেই উপড়ে গেছে। দেখতে দেখতে হাতের দুই আঙ্গুলে জড়ানো চার সংখ্যাকৃতি সুতোর বহর ক্রমশ মোটা হতে থাকে, তবু যেন ফুরোতেই চায়না।

গাছ থেকে সুতোসমেত ঘুড়িটা নিয়ে নেমে এসে বেঞ্চির ওপর নজর যেতেই ছ্যাঁত করে উঠল অমলবাবুর বুকটা। আরে, ডিব্বাটা কোথায় গেলো? নিজের অজান্তেই হাত দিয়ে বুকপকেট হাতড়াতে শুরু করেন। যদিও তাঁর স্পষ্ট মনে পড়ে একটু আগে ডিব্বাটা বুকপকেট থেকে বের করে বেঞ্চির ওপর রেখেছিলেন।

কোথায় গেলো ডিব্বাটা? ডানা গজিয়ে উড়ে নিশ্চয়ই যায়নি। নাকি, কেউ ওটা ফাঁকতালে নিয়ে কেটে পড়লো? অমলবাবু তবু একবার গাছের ওপরের দিকে তাকালেন। গাছে কিছুই নেই। ধারে কাছে কোথাও কাক বা শালিক, কিছুই দেখতে পেলেন না। চিলে ছোঁ মেরে নিতে আসলে চোখে পড়ত নিশ্চয়ই। আর কাকেরা কোন কাজ মুখ বুজে করতে পারে না, তাই কাকের কীর্তি হলে ফাঁস হয়ে যেত। কে নিলে তাহলে ডিব্বাটা? কারই বা কোন কাজে আসবে সেটা? তাইতো, বেঞ্চির পেছনের ঝোপটায় কিসের যেন খসখস একটা শব্দ শুনেছিলেন না? মনে পড়তেই অমলবাবু একবার ঝোপটার পেছনদিকে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চাইলেন। দেখলেন, একটা ঘেয়োকুকুর। দেহের সম্মুখভাগের প্রায় পুরোটাই ঝোপের আড়ালে। ঝোপের বাইরে পশ্চাদভাগ

দৃশ্যমান। দেখে অমলবাবু ভাবলেন, মদ্দাকুকুরটা হয়তো খরগোশজাতীয় কোন জন্তুফন্তুর পেছনে ধাওয়া করে এসে এবার ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

কিন্তু কুকুরটা অমলবাবুকে ঝোপের দিকে এগোতে দেখে বেশ বিরক্ত হয়েছে বলে মনে হল। ঘাড় ফিরিয়ে কুকুরটা ঝোপের বাইরের দিকে তাকাতেই অমলবাবু রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন। অমলবাবুর উপস্থিতি যে মোটেই কাম্য নয় তা কুকুরটার ওপরপাটির দন্ত বিকশিত করা দেখেই বোঝা গেল। ডিব্বাটা তারই ডান থাবায় ধরা আছে দেখে অমলবাবু এবার মনে যেন একটু ভরসা পেলেন। মনে মনে ভাবলেন, বুদ্ধি থাকলে কি আর এইভাবে রাস্তার বাউণ্ডুলে কুকুর হয়ে এইসব হাজিবাজি খেয়ে কাটাতে হত। বলতে ইচ্ছে হল চেঁচিয়ে, পাজি কুকুর, গেঁড়ে কুকুর। মুখে অবশ্য কুকুরকে উদ্দেশ্য করে মিনতির সুরে বললেন, ওটা ফিরিয়ে দে আমায়, বাবা, কাকা, মামা, দাদা, যা বলে সম্বোধন করতে বলিস, বলব। বলিস তো তোর থাবায় পড়তেও রাজি। তোর চেহারা দেখেই বুঝেছি, তোর অনেকদিন ভালোভাবে খাওয়া জোটেনি। তাই বলে এত নিচে নামবি তুই যে, আমার বর্জিত মাল খেয়ে তোর ক্ষিদের জ্বালা মেটাতে হবে, এমন তো ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নেই? আর পরিমাণের কথাই যদি বলিস, তাও তো তেমন আহামরি কিছু নয়। একটু ধৈর্য ধর, আমি ফিরে এসে নিজের হাতে তোকে খাওয়াব। যা বলবি, তাই এনে দেব। রাজভোগ, অমৃতি, বোঁদে, মিহিদানা। সেরা দোকানের সেরা মাল। খাসা বিরিয়ানি। কি বললি, গাওয়া ঘি'র খাবার তোর পেটে সইবেনা?

অমলবাবুর বকবকানিতে বিরক্ত হয়ে কুকুরটা যেন বলতে চাইলো, নে রে শালা, তোর পচা মাল ফেরত। পরের বার ফের যদি এমন মাল আনিস তো রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব। ভেবেছিস যা ইচ্ছে তাই উৎপাদন করে পার পেয়ে যাবি? এত কসরৎ করাটাই বৃথা গেল। ডিব্বার ছিপিটা হাজার চেষ্টা করেও খোলা যাচ্ছে না। দিই, শালা, দাঁতের চাপে ফুটো করে। ফুটো হতেই কিছুটা অন্তর্নিহিত সামগ্রী টুথপেস্টের মত চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করল। একবার জিব দিয়ে

চেটেই চটে গেল কুকুরটার মেজাজ। বমি করার মত ওয়াক ওয়াক শব্দ তুলে ডিব্বাটা ফেলে দিয়ে লেজ গুটিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পার্ক ছেড়ে পগারপার হয়ে গেল।

অমলবাবু সেটা ফিরে পেলেন বটে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হল না। এটা আর ডাক্তারবাবুকে পরীক্ষার জন্যে দেওয়া যাবে না। কে জানে বাবা, কুকুরের লালায় কি না কি বীজাণু আছে। এ তো আর তাস খেলা নয় যে, হুড়োনো যাবে, ভাবলেন অমলবাবু। কপাল খারাপ হলে যা হয় আর কি। রাস্তার ঘেয়োকুকুরও পেছু লেগে যায়। অগত্যাই তাঁকে ফিরে যেতে হোল আবার মামার বাড়িতে। নতুন করে চেষ্টা করে দেখতে হবে। খালি হরলিকসের শিশি তো আছেই মামাবাবুর কাছে। এত সহজে হাল ছাড়লে চলবে কেন?

ডিব্বাটা ছুঁড়ে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিতে গিয়ে আবার মনে পড়ে যায় অতীতের কথা। এক'শ টাকার নোট খোয়া যাওয়ায়, মামাবাবু ক্রোধবশতঃ অমলের ঘুড়িগুলো ছিঁড়ে কুচি কুচি করে, সুতোসমেত লাটাইটা দুই টুকরো করে, চারতলার বারান্দা থেকে ঠিক এমনি ভাবেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন রাস্তায়। অর্জুনদার সাক্ষীতেও কোন ফল হয়নি। আজকের এই কুকুরটার মত প্যাঁদানি না খেয়ে পালাতেও পারেননি সেদিন অমলবাবু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেয়েছিলেন। মামাবাবুর বজ্রহুঙ্কার আর মারের ভয়ে খাটের তলায় ঢুকে পড়েও নিস্তার পাননি। ঝুলঝাড়ার লম্বা বাঁটের খোঁচা খেয়ে সদ্য দুধেদাঁত-পড়ে-ওঠা সামনের ওপরপাটির দাঁতটার একটা চোকলা ভেঙে গিয়েছিল। আজও সেই আধভাঙ্গা দাঁতটা অমলবাবুর সঙ্গী হয়ে আছে। হুমকি দিয়ে মাকে সাফ সাফ সেদিন বলে দিলেন মামাবাবু, "তোদের আর আমার সংসারে রাখা চলবে না। দুধ কলা দিয়ে আমি আর সাপ পুষতে চাই না। অকর্মণ্য, অলস, রণ্ডিবাজ, চোর তৈরি হচ্ছে তোর ওই গুণধর ছেলে। আমার মুখ পুড়িয়ে দিলে। তোদের জিনিসপত্তর নিয়ে এক্ষুণি এইমুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা।" মা অসহায় হয়ে শুধু বলেছিলেন, "এই ভরসন্ধ্যেবেলায় আমরা পথে কোথায় গিয়ে

বসব দাদা? তাতে কি তোমার মুখ পুড়বে না? অমল তো মা কালীর দিব্যি দিয়ে, তিন সত্যি করে বললে, ও তোমার টাকায় হাত দেয়নি, আর দিলে তো শয্যাশায়ী বৌদি নিশ্চয়ই টের পেতেন, অমল আলমারি খুলে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে কিছু হাতড়াচ্ছে। অত টাকার বাকিটা কোথায় রইল, তাও ধরা পড়েনি।" বড়মামা তবু নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। দজ্জাল শাশুড়ির অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে যে ছোটবোনকে একদিন নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাকেই আবার ছেলেপুলেসমেত রাস্তায় খেদিয়ে দিতে এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করলেন না।

অমলবাবুর বড়মামা নিজেও ছিলেন তাঁর মামাতো ভাইয়ের ঘরে আশ্রিত। সেই ভাই বয়সে কয়েক বছরের বড় হলেও, ছোটবেলায় তাঁরা ছিলেন একেবারে হরিহরআত্মা। আন্নাদেবীর সঙ্গে মামাতো ভাইয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পরও সেই সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়নি। গ্রাম থেকে দৈনিক যাতায়াত করে এত দূর এই শহরে চাকরি করা সম্ভব হতো না বলে, তিনি নিজে থেকে বড়মামাকে বলেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে এক সংসারে থাকতে। আর মারা যাবার আগে শপথ করিয়ে নিয়ে ছিলেন, বড়মামাই যেন তাঁর অবর্তমানে তাঁর একমাত্র মেয়ে আরাধনা এবং স্ত্রী আন্নাদেবীর দেখাশোনার ভার নেন। বড়মামা কথা রেখেছিলেন। নিজে তাই বিয়ে করে কোন নতুন সংসার পাতেন নি। পরে মামাতো ভাইয়ের মেয়ে আরাধনার বিয়েও দিয়ে দিয়েছিলেন বেশ ধুমধাম করে।

আরাধনা শ্বশুরবাড়ি চলে যাবার কয়েকদিন বাদে, আন্নাদেবী হঠাৎ একদিন বাথরুমের শ্যাওলাধরা মেঝেয় পা হড়কে পড়ে গিয়ে পঙ্গু হয়ে যান। এ যেন এক মণিকাঞ্চন যোগ। ঠিক সেইক্ষণে অমলের বড়মামার কানে আসে, রানীর শাশুড়ি রাগের বশে উনুন থেকে সাঁড়াশি দিয়ে জ্বলন্ত কয়লা তুলে, রানীর বাঁহাতে টিকের দাগের কাছে চেপে ধরেছেন। কয়লাটা হাড় অবধি ঢুকে গিয়ে আটকে গিয়েছিল। একমাস হাসপাতালে থাকার পর রানী আর তাঁর শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাননি, আশ্রয়

পেয়েছিলেন তাঁর বড়দাদার কাছে। তাঁর ওপরেই তখন আন্নাদেবীর সেবা শুশ্রূষার সমস্ত ভার পড়ল।

আরাধনা আর অমল ছিল যেন একেবারে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত, বয়সের ফারাক থাকলেও। তার কারণ, তাদের পরিবারে অমলের বয়সী আর কোন ব্যাটাছেলে ছিল না। সবাই মেয়ে। আরাধনা তাই অমলকে একেবারে নিজের সম্পত্তি জ্ঞান করে সবার কাছ থেকে আড়াল করে রাখত, অন্য কাউকে তার সঙ্গে মিশতে দিত না। আরাধনার বিয়ে হয়ে গেলেও অমলের সঙ্গে সেই সম্পর্কে কোন চিড় ধরেনি।

অমল ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে রাগে, উত্তেজনায় ঠকঠক করে কাঁপছে, আর মাঝে মাঝে দাঁতের কাছে আঙুল দিয়ে পরখ করছে আর রক্ত বেরোচ্ছে কিনা। অমলের এই দশা দেখে আরাধনার কেমন যেন মায়া হয়। অমলের কোন দোষ নেই। কারণ টাকাটা নিয়ে আরাধনা পুজোর কিছু কেনাকাটা করতে গিয়েছিলো। ভেবেছিল বাজার থেকে ফিরে এসে কাকুমনিকে জানাবে।

অমল তখনও ঘর থেকে বেরোচ্ছে না বলে, বড়মামা আবার ধমক দেন, "বেরিয়ে যা, আমার চোখের সামনে থেকে, অকালকুষ্মাণ্ড ছেলে কোথাকার। আমার ঘরে চোর? দূর হয়ে যা যেখানে পারিস। ওয়াগন ভাঙ গিয়ে, তবে আমার বাড়িতে থেকে নয়।"

এবার বাধা দেয় আরাধনা।

- কাকুমনি, তুমি তিলকে নিয়ে তাল করছ। অমল তো কোন দোষ করেনি, তুমি শুধু শুধু ওকে মারলে। দাঁত ভেঙে দিলে। বেচারা অমল।

বলে আরাধনা অমলকে বুকে জড়াতেই অমল হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। আর কোঁকাতে কোঁকাতে বলে, "বিশ্বাস করো দিদিভাই, সুতো, লাটাই অর্জুনদা আমায় দিয়েছিল। আমি চুরি করিনি বড়মামার টাকা।"

- তোমাকে ওর হয়ে অত সালিসি করতে হবে না। কি আনলি বাজার থেকে, তাই বল, টাকায় কুলিয়েছিল? আরও কেনাকাটা করার জন্যে বুবু কি টাকা দিয়ে গিয়েছিল, নাকি আমি তোকে কিছু টাকা দেব?

- সেই কথাই তো তোমায় বলতে চাইছিলুম। অমলকে তুমি শুধু শুধু মারলে। তুমি ছিলে না, তাই জিজ্ঞেস করতে পারিনি। বলবার সুযোগই পাইনি। টাকাটা আমি নিয়েছি, বুবু এলে ফেরত দিয়ে দেব।

শুনে বড়মামা কোন উত্তর দিলেন না। যেন কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব দেখিয়ে বেতমোড়া ইজিচেয়ারে বসে একটা ইংরিজি দৈনিক সংবাদপত্রের পাতা উল্টোতে লাগলেন।

অমলের মা কিন্তু সেইকথা শুনে কেউটে সাপের মত ফোঁস করে উঠলেন। বলেন, "দাদা, আমার ছেলে যদি কোনো অপরাধ করে, তার জন্যে সে শাস্তি পাক, আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু বিনাদোষে ও শাস্তি পাবে, শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে বাধ্য হবে, তা আমি মা হয়ে মুখ বুজে সইব কেমন করে? আমি আজই ছেলেমেয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাব এ বাড়ি থেকে। কোথাও জায়গা না পেলে চলে যাব কোনও অনাথ আশ্রমে। কষ্ট হলেও, এ বাড়ির চেয়েও অনেক সুখে থাকবে ওরা।

শয্যাশায়ী আন্নাদেবী ঘাড় ফিরিয়ে বারবার অমলকে দেখার চেষ্টা করছিলেন। বোঝবার চেষ্টা করছিলেন, কি ঘটে গেছে একটু আগে, তাঁরই খাটের তলায়। অমলের সঙ্গে তাঁর একটা বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। অমল কোন নতুন কিছু পেলে, ঘুড়ি, সুতো, লাটাই যাই হোক, সবার প্রথমে তার এই

মামিমাকেই দেখাত আর মামিমার পা টনটন করলে, পায়ের ওপর চড়ে এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করত, বিনিময়ে পেত, মামিমার মাথার বালিশের তলায় রাখা কয়েকটা টফি। "কি হচ্ছে আমার বাড়িতে? এত চেঁচামিচি কিসের? জিজ্ঞেস করেও কোন উত্তর না পেয়ে অমলকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকলেন। অমল ফোঁপাতে ফোঁপাতে খাটের কাছে এগিয়ে যায়, আন্নাদেবীর পায়ে হাত রেখে বলে, "আমি কোন অন্যায় করিনি, মামিমা, তবু মার খেলাম, এমনি এমনি।"

কাপড়ের বোঁচকা হাতে অমল আর তার ভাই বোনকে নিয়ে অমলের মা রানী বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাশের বাড়ির কণেদাদুর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন। বললেন, "কণেমামা, আমাদের কি হবে? বাপমরা ছেলেপুলে নিয়ে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? দাদা আমাদের খেদিয়ে দিলে। ছেলেটাও বিনা দোষে অযথা শাস্তি পেল।"

অমলের এই কণেদাদু শুধু যে একজন ধার্মিক ও সন্ন্যাসী মানুষ ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন এই পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ। তাঁর প্রত্যেক কথাতেই একটা বিশেষ গুরুত্ব থাকত। তাঁর দেওয়া বিধান কেউ কখনও অমান্য করতে পারত না। তিনিই অমলের মামাকে বললেন, অমলদের গ্রামের বাড়িতে থাকার বন্দোবস্ত করে দিতে। আর বললেন, তিনভাই মিলে একটা মাসোহারার ব্যবস্থাও করতে, যতদিন না অমল বড় হয়ে একটা চাকরিবাকরি পাচ্ছে।

গ্রামে গিয়ে অমল চিনতে পারল জীবনকে নতুন করে। শহরের অনেক সুযোগ সুবিধে সেখানে ছিল না বটে, কিন্তু সেখানে লোকেদের কাছ থেকে যে আন্তরিকতা পেল, সেটা লোক দেখানো নয়। তাছাড়া শহরে খেলার জায়গা বলতে ছিল বড়মামার বাড়ির সামনে একমাত্র ফুটপাথটুকু আর সেই গলিতেই দুটো বাড়ির মাঝখানে পড়ে থাকা একফালি চোর- আর শেয়ালকাঁটায় ভরা বেওয়ারিশ জমি। আর গ্রামে? সারা গ্রাম জুড়ে ছিল অমলদের খেলার জায়গা।

শহরে প্রতিদিন বড়মামার পুজোর জন্যে পাড়া ঘুরে ফুল তুলে আনতে হত অমলকে। সেই সুবাদে অনেক ফুল চিনলেও, গ্রামে এসে অমল প্রথম উপলব্ধি করেছিল যে, তার কত কি না জানার আছে, শেখার আছে। গাছগাছালির মধ্যে কত যে রহস্য লুকিয়ে আছে, তাও সে বুঝতে শিখল। শহরে আশে পাশে যারা ছিল, কয়েকটা সমবয়সী মেয়ে ছাড়া, কেউ যেন অমলকে তেমন পাত্তা দিত না। আহা বাপমরা ছেলে, বলে বড়রা কেবল সহানুভূতি জানাত। শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে যেত অমল। কারণ, কারো কাছে কোন সাহায্য চাইতে গেলে, কারো কোন সময় বা উৎসাহ থাকত না। গ্রামে কেউ ওসব বলে ওপর ওপর দয়া দেখাত না। সবার সঙ্গে কেমন যেন মিশে গেল অমল। তবে একটা অভাব গাঁয়ে এসেও থেকে গেছিল। প্রতিদিন বড়মামার হাতে বেতপেটা খাওয়া। মাঝে মাঝে ব্যথা অনুভব করত পিঠে, মার না খেয়েও, প্রায় সন্ধ্যেবেলা।

মামার প্রতি একটা বিদ্বেষ থেকে যাওয়াটাই স্বাভাবিক, কিন্তু গাঁয়ে এসে অমল নতুন করে যে স্বাধীনতা পেল, তাতে সেই সব বিদ্বেষের মনোভাব ধোপে টিঁকল না।

এককালের সেই ছোট্ট অমল আর ছোট নেই। মামাদের দয়াতে পরে একটা ছোট চাকরি পেয়ে স্বাবলম্বী। মামাদের ওপর তার সেই ছোটবেলার রাগও আর সে পুষে রাখেনি।

অমল আজ অমলবাবু। পেটের যন্ত্রণায় কাতর। শালা, পার্কের ঘেয়ো কুকুরটা সেই যন্ত্রণা আরও এক দফা বাড়িয়ে দিলে। ফের কড়া নাড়তে হবে বড়মামার দরজায়।

বড়মামা অবাক হয়ে এবার জিজ্ঞেস করলেন, "অম্লা, কাজ হল?"

- হলে কি আর ফেরৎ আসি? কুকুরদের জ্বালায়...

- কেন কামড়েছে নাকি? বলিনি, দরজাটা টেনে দিতে। মানুষ কমছে, কিন্তু কুকুর বাড়ছে দিন কে দিন।

- কই, হরলিকসের খালি শিশিগুলো কোথায়? একটা দরকার।

মামার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এবার অমলবাবু আর কোথাও গড়িমসি করলেন না। সোজা ট্রামে করে পৌঁছে গেলেন ডাক্তারখানায়। পেটের ব্যথাটা এখন একটু প্রশম হয়েছে। রিসেপসনের পেছন থেকে বেরিয়ে এসে একজন নার্স হাত বাড়ালেন নমুনাসমেত শিশিটা নেবার জন্যে। নার্সের মুখের দিকে তাকিয়ে অমলবাবু বেশ নার্ভাস। পরিমাণ এত কম দেখে হয়তো উপহাস করবেন, এই ভেবে। হাত হড়কে পড়ে গেল শিশিটা মেঝের ওপর। বরফির নক্সায় সিমেন্টের সাদাকালো পালিশকরা মেঝে। অপেক্ষারত সমবেত নারীপুরুষ নির্বিশেষে সবাই উদ্বিগ্ন হলেন। শুরু হয়ে গেল বিনি পয়সার উপদেশবাণী।

- আরে মশাই, ওইটুকু জিনিষের জন্যে অত বড় শিশি কেন? একেই বলে সম্পদের অপচয়।

- মেঝে পরিষ্কার করলেও গন্ধটা থেকে যাবে। শুঁকলেও কেউ বুঝতে পারবে না কোথা থেকে আসছে।

- পরের বারে কোন কাঁচের পাত্র নেবেন না ।

নার্স বললেন, "টয়লেটে গিয়ে জল আর ন্যাতা এনে ফিনাইল দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে দিন। আবার চারদিকে থেবড়ে দেবেন না যেন। কাঁচের টুকরোগুলো বেছে বেছে জড় করুন ঝাড়ু দিয়ে, সাবধানে করবেন, আঙুলে ফোটে না যেন। আমি চামচে সমেত আর একটা প্লাস্টিকের পাত্র দিচ্ছি, কাল... না কাল নয়, কাল আমাদের ডাক্তারখানা বন্ধ, পরশু এনে জমা দিয়ে যাবেন।"

গাঁয়ের বাড়িতে বসে অমলবাবু প্লাস্টিকের ভরাপাত্রটা একটা সুন্দর কাগজের মোড়কে মুড়ছে দেখে তাঁর মা জিজ্ঞেস করলেন, "কিসের উপহার রে, অম্লা? কেউ বিয়ের নেমন্তন্ন করেছে বুঝি?"

- না মা, এটা একটা নমুনা। উত্তর দেন অমলবাবু।

- নমুনা? নমুনা... তো এত ঢাক গুড়গুড় কিসের? দেখতেই যদি না পাওয়া যায়, তাহলে সেটা নমুনা হয় কি করে?

- ও তুমি বুঝবে না, এ নমুনা দেখার নয়, মা। এ নমুনা শুধু পরীক্ষা করার।

- না দেখেই পরীক্ষা, সে আবার কি?

অমলবাবুর মা মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলেন না। চাকরি পাওয়ার পর থেকেই তিনি ছেলের হাবভাব ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। ভেবেছিলেন, বিয়ে-থা দিলে, ভুলোমনের স্বভাবটাও বদলাবে আর আবোলতাবোল কথাবলাও ঢিট হয়ে যাবে। কিন্তু বিয়ের প্রসঙ্গ তুললেই তো ছেলে একেবারে তিতিবিরক্ত হয়ে সজোরে ঘরের দরজা ঠুকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। তাই এতদিন কথাটা তুলেও তোলেননি। মাঝে মাঝে ইশারায় অবশ্য জানান, কি রে অম্লা, তোর কি ইচ্ছে করে না, নতুন হাতের রান্না খাওয়ার?

উল্টে অমলবাবু প্রতিবারই জবাব দেন, "তোমার হাতের রান্নাকে টেক্কা দেয়, এমন লোকই জন্মায়নি এখনও।"

প্রসঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে ধামাচাপা পড়ে যায়।

আজ প্রসঙ্গও আলাদা। আজ শুধু নমুনা পৌঁছে দেবার তাগাদা। ছুটিও নইলে ফুরিয়ে যাবে অকাজে। ট্রেনে মাত্র দেড় ঘণ্টার পথ, নমুনাটা তাজা থাকলে বাঁচি, ভাবেন অমলবাবু মনে মনে। আজ তিনি পাঞ্জাবি পরে যাবেন না, ঠিক করলেন কোটপ্যান্ট পরে যাবেন। কোটের পকেটে নমুনার মোড়ক।

শহরে পৌঁছে ট্রেন থেকে নেমে অমলবাবুর কেমন ক্ষিদে ক্ষিদে পায়। সকাল সকাল এসে পড়েছেন। ডাক্তারখানা খুলতে এখনও ঘণ্টা খানেক বাকি। স্টেশনের কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁয়

ঢুকে ভাবলেন ভাল ভাল কিছু খাবেন। পেটের ব্যথার কথা মনে এলেও অন্য কথা চিন্তা করার চেষ্টা করলেন। একা হলেও গিয়ে বসলেন পর্দা ঘেরা একটা কেবিনে। অর্ডার দেবার আগে পকেট থেকে মোড়কটা বের করে পাশের খালি চেয়ারটার রাখতে রাখতে, কেমন যেন উপহাসের হাসি হেসে অমলবাবু মোড়কটার উদ্দেশ্যে বললেন, হুঁ হুঁ বাবা, যাই খাই না কেন, চেয়ে চেয়ে শুধু দেখ, তার একরত্তি রেশও খুঁজে পাবেন না ডাক্তারবাবু তোমার মধ্যে। পর্দার ফাঁক দিয়ে রাস্তার খানিকটা দেখা যাচ্ছে। বাসস্টপও।

খাওয়াদাওয়া সারা হলে, বাস আসতে দেখে তড়িঘড়ি বিল মিটিয়ে দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়লেন চলন্ত বাসে।

ডাক্তারখানায় আগের সেই নার্স অমলবাবুকে দেখে চিনতে পেরে বললেন, "আপনাকে আজ আর বাড়তি অপেক্ষা করতে হবে না, এনেছেন, আমায় দিন।"

অমলবাবু পকেটে হাত ঢোকান। এ পকেট সে পকেট হাতড়ান। সব পকেটই ফাঁকা।

নার্স বললেন, "আরে, অত খোঁজাখুঁজির কোন দরকার নেই। আজ এখানেই চেষ্টা করে দেখুন। আমি পাত্র দিচ্ছি। বাড়ি থেকে আলাদা করে আনারও দরকার নেই।"

মাটি মাখা হাত

তুষ্টি ভট্টাচার্য

মাটি মাখা হাতে তুলি ধরেছে কিশোর,
নাকের বদলে চোখ, চোখের বদলে ঠোঁট
পিছলে যাচ্ছে তুলি
কিশোর চিবুকে দূর্বা দাড়ি...

আঁচড়ায় কামড়ায় জানলা দরজা
ছিঁড়ে যাচ্ছে নাড়ি বিবশ শরীর,
জংলি মুখ দেখেনি শহর
বাস ট্রেন রেলগাড়ির বেমক্কা ছুট...

এরোপ্লেনের খেলনা জানলায়
ফিতে নদী চৌখুপী খেত
পার হয়ে হয়ে পৌঁছতে হয়
শহরে বন্দরে তুমুল পৃথিবীতে...

সময়ের পদাবলী

অনিমেষ সিনহা

নর্দমার পাশ দিয়ে আমার সময় ছুটে চলে,
বারুদ আর রক্ত!
পাকা ফসলের খেতে যাত্রাপালা আসর
হাততালি দিতে হবে জোরে,
অস্ত্রের ডগায় ভ্রূণ গাঁথার তীক্ষ্ণ শব্দে।
লাশের পিঠে চেপে বাচ্চা বাচ্চা অবয়বগুলো
উল্লাসে ফেটে পড়ছে . . !
হলুদ দাঁতে প্রধান মূল নদী
নতুন বউ, রথের মেলা, রঙিন চুড়ি, রেশমি ফিতে,
সময়ের মাংস, খুঁটে খুঁটে বের করি নখে।
সময় ছুটে চলে
চেঙ্গিস তলোয়ার মাটি থেকে কিছুটা ওপরে বুড়ো আঙ্গুল!
আমি ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাই
আর সময় আমাকে আঁকড়ে ধরে
প্রেয়সীর ন্যায় লম্বা লম্বা আঙুলে...
সময়ের লাশ বোঝাই দেশজ বল্কল
নিয়ে ছুটতে থাকি,
আমার কালো রাস্তায় সান্ত্বনা
শুধু সরকারি ল্যাম্পপোষ্ট,
পাথর যুগ থেকে আজও ...
বৃষ্টি পড়লে বুকে বোঁটকা গন্ধটা আরো উগ্র হয়।

আকাশধারা

অভিলাষা দাশগুপ্তা আদক

স্মৃতির ভুবন নিরিবিলি,
বনপলাশীর পদাবলী,
আবেগ মাখা ভালবাসায়,
ঘর ভুলেছি মোহন নেশায়।
পরশকাতর আর্তি নিশির,
বানভাসি চোখে স্ফটিক শিশির।
অবোধ চাওয়ায় শ্রান্ত মন,
অপেক্ষাতে আর কত'খন?
দিনে রাতে, রৌদ্রে ছায়ায়,
মন উচাটন প্রেমের মায়ায়।
নকশিকাঁথার রঙের মত,
রঙিন হোক আজ স্বপ্ন যত।
মনবাগিচায় স্পর্শসুখ,
মনমুকুরে প্রিয়মুখ।
হাসিকান্নায় সময় হারায়,
নদী ছোঁয়া আকাশধারায়।

ইচ্ছা...

কাকলি পাল বিশ্বাস

ভেবেছি সমুদ্র দেখতে যাব,
জীবনটাই স্রোতের তোড়ে ভেসে গেল যেন...।

পুরনো দিনের শখ পাহাড় চিরে দেখা সব,
ঝর্নার জল কোথা চলে যায়...
দুর্গম পথের ঠিকানাও দমকা হাওয়ায় গেল হারিয়ে.....।।

ইচ্ছে ছিল চাঁদ আর সূর্যটাকে দু'হাতে জাপটে ধরে সাজিয়ে রাখব আমার হৃদয় বাগানে.....।

ইচ্ছেটা ভাসতে ভাসতে স্বপ্নের মতন মিলিয়ে গেল
তোমার ধূসর পৃথিবীতে.....।!

মরক্কোর খেজুরে মাংস

অনির্বাণ শ্যাম

এতদিন আমি সোজাসাপ্টা চটপট করা যায় এমন সব রেসিপি দিয়ে এসেছি। এবারে পুজোসংখ্যা বলে কথা, বেশ একটা জম্পেশ এবং অভিনব ডিস্ না হলে চলবে কেন ? শুধু গপ্পই খেজুরে হয় না, মাংসও খেজুরে পারে। আসলে মেজ্জুল খেজুর হলেই ভালো হয়, না পেলে কিমিয়া (এটা ভারতেও পাওয়া যায়) বা অন্যান্য রসালো, নরম শাঁসের খেজুর ব্যবহার করতে পারেন। মরক্কান রান্না বেছে নেবার প্রধান কারণ হলো উপকরণ এবং সময় একটু বেশি লাগলেও আসল রান্নাটা খুব সোজা এবং স্বাস্থ্যকর, অথচ বেশ জমকালো। মরক্কান রান্না পদ্ধতি খুবই প্রাচীন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপনিবেশকারীর দ্বারা প্রভাবিত, যার মধ্যে বের্বের, মুর, তুর্কি, জ্যু, আফ্রিকান, আরব, ইউরোপিয়ান সবাই আছে। এই রান্নাটি আসলে বের্বেরদের যারা নীলনদের পশ্চিমের উত্তর আফ্রিকা থেকে এসেছিল। প্রচুর মশলার পরিমিত ব্যবহারে এদের পদগুলি একেবারে অভিনব, যাকে বলে, স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়।

প্রধান রান্নার উপকরণ:

১. ভেড়ার রানের মাংস ১ কেজি, অভাবে বড় খাসি

২. কুচোনো খেজুর ১০০ গ্রাম

৩. আমন্ড বাদাম গুঁড়ো করা ১ টেবিল চামচ

৪. আমন্ড বাদাম সরু ফালি করা ১ টেবিল চামচ

৫. খোবানি (শুকনো এপ্রিকট) ৫০ গ্রাম

৬. বড় পেঁয়াজ ১ টা

৭. ধনেপাতা ১ আঁটি

৮. জলপাই (অলিভ) তেল ১ টেবিল চামচ

মেরিনেড করার উপকরণ:

১. জলপাই (অলিভ) তেল ২ টেবিল চামচ

২. গোটা জিরে ১ চা চামচ

৩. গোটা সাদা তিল ১ চা চামচ

৪. দারচিনি গুঁড়ো ১ চা চামচ

৫. লবঙ্গ ৩-৪ টি গুঁড়ো বা কুচোনো

৬. "রাস আল হানৌত" মশলা ১ টেবিল চামচ

এই "রাস আল হানৌত" মশলাটি বেশিরভাগ মরক্কান রান্নারই প্রধান চরিত্র, কাজেই বহুল প্রচলিত। এর অর্থ হলো "দোকানের সবথেকে ভালো মশলা", মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে পাওয়া মুশকিল বলে এই মশলার প্রস্তুতি প্রকরণটিও দিয়ে দিলাম। স্বাদ গন্ধে আমার জানা কোনো ভারতীয় মশলার সঙ্গে তুলনা করতে পারলাম না, ওস্তাদ ভোজন রসিকরা হয়ত পারবেন। এটি বানাতে আসলে গোটা চল্লিশ উপকরণ লাগে এবং সেগুলি মেশানোর পদ্ধতি সময় ও কষ্টসাপেক্ষ। এক মরক্কান বন্ধুর পরামর্শে একটি সহজীকৃত রূপ দেওয়া গেল।

উপকরণ, রাস আল হানৌত:

১. শুকনো আদার গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ

২. এলাচ গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ

৩. জায়ফল (নাটমেগ) গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ

৪. দারুচিনি গুঁড়ো ১/২ টেবিল চামচ

৫. ধনে গুঁড়ো ১/২ টেবিল চামচ

৬. জৈত্রী (মেস) গুঁড়ো ১/২ টেবিল চামচ

৭. হলুদ গুঁড়ো ১/২ টেবিল চামচ

৮. কালো মরিচ ১/৪ টেবিল চামচ

৯. লবঙ্গ গুঁড়ো ১/৪ টেবিল চামচ

১০. মৌরি ১/৪ টেবিল চামচ

১১. সাদা মরিচ ১/৪ টেবিল চামচ

১২. লাল লঙ্কা গুঁড়ো ১/৪ টেবিল চামচ

১৩. অল স্পাইস (পিমেন্ত) গুঁড়ো ১/৪ টেবিল চামচ

প্রস্তুতি, রাস আল হানৌত:

সব মশলা গুলো মিশিয়ে গুঁড়িয়ে বা গুঁড়িয়ে মিশিয়ে নিলেই হবে। এয়ারটাইট জারে রেখে দিন, মাস ছয় তো থাকেই। মাছ, মাংস, সবজি সবেতেই দেওয়া যায়.

প্রস্তুতি, মেরিনেসন, খেজুরে মাংস:

মাংসটা হাড় ছাড়িয়ে চৌকো করে কেটে নিয়ে একটা বোল-এ রাখুন মেরিনেড করার জন্য। হাড়গুলো ফেললে চলবে না, কুকারে হাড়গুলো দিয়ে ২ লিটার জল মিশিয়ে কম আঁচে সিটি ছাড়া ফোটাতে থাকুন চল্লিশ মিনিট, জলটা মরে এক তৃতীয়াংশ মত হলে স্টকটা ছেঁকে নিয়ে সমান দু'ভাগ করে ফেলুন। এক ভাগ স্টকে বেশ গরম থাকতেই মেরিনেড করার সমস্ত উপকরণ মিশিয়ে দিন। এবারে এই মশলা মিশ্রিত স্টকটি মাংসের বোল-এ ঢেলে ভালো করে মিশিয়ে দিন।

ঠান্ডা হলেই বোল-টি ভালো করে ঢেকে বা প্লাস্টিক ফিল্ম র‍্যাপ দিয়ে বন্ধ করে ফ্রিজে রেখে দিন। আসলে পুরো একদিন মেরিনেড করলে খুব ভালো হয়, মশলাগুলো ভালো করে মাংসে ঢুকে যায়,

আর মাংসও বেশ নরম হয়। বাকি স্টকটুকুও ঢেকে ফ্রিজে তুলে রাখুন। পশুপ্রেমীরা উচ্ছিষ্ট হাড়গুলো দিয়ে বিনামূল্যে কুসেবা (কুকুরের ভোজন অনুষ্ঠান) করতে পারেন।

প্রধান রান্না, খেজুরে মাংস:

রান্নার আগে মাংস ও স্টক ফ্রিজ থেকে বার করে সাধারণ তাপমাত্রায় ফিরতে দিন। মশলাযুক্ত স্টক মিশ্রিত মাংস আরেকবার ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে, গরম নন-স্টিক তাওয়াতে সামান্য তেল দিয়ে বেশ বাদামি করে ভেজে নিয়ে একটি বড় পাত্রে রাখুন, মাংস থেকেও যথেষ্ট তেল বেরোবে মেরিনেসনের দরুন। খেজুর, পেঁয়াজ আর খোবানি ওই একই ভাবে কিন্তু সামান্য নরম করে ভেজে নিয়ে মাংসে মিশিয়ে দিন। অর্ধেক ধনেপাতা আর পেষা আমন্ড বাদাম বাকি স্টকটুকুর সঙ্গে মাংসের ওপরে ঢেলে দিন। এবারে ক্লোজড গ্রিল বা ওভেনে কম আঁচে (১৪০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) ঘণ্টা দেড়েক রাখুন যতক্ষণ না মাংস বেশ নরম হয়ে আসে আর স্টকটা মরে বেশ গা মাখা হয়। প্রয়োজনে সামান্য গরম জলও মেশাতে পারেন সেদ্ধ করার জন্য। ওভেন ছাড়াও সাধারণ কুকার বা পুরু তলাবিশিষ্ট ডেকচি ধরণের পাত্রে ঢাকা দিয়ে করলেও অসুবিধে নেই। এবারে রান্না মাংসের ওপরে বাকি ধনেপাতা আর ফালি করা আমন্ড বাদাম ছড়িয়ে দিলেই খেজুরে মাংস তৈরি।

কি দিয়ে পরিবেশন করবেন ?

"খোব্জ" নামের মরক্কান বান রুটি দিয়ে খাওয়ার নিয়ম, তবে আমাদের দেশে যে ব্রাউন বান রুটি পাওয়া যায় সেটা একই জিনিস। আমি সাধারণ তন্দুরি রুটি এবং ভাত দিয়েও খেয়েছি, দিব্বি লাগে। এর পরে "মরক্কান চা" খাওয়া হয় যাকে মজা করে "মরক্কান হুইস্কি" বলা হয় এবং এরা সারাদিন চা খান, ঠিক বাঙালিদের মতনই. মরক্কান চা আসলে সাধারণ চাইনিস ব্রিক চা দিয়ে, প্রচুর চিনি মিশিয়ে এবং পুদিনাপাতা দিয়ে খাওয়া হয়। আবার অনেকে আমাদের মতই দুধ এলাচ আদাগুঁড়ো মিশিয়ে, রীতিমত মশালা চা বানিয়ে খান।

বেশিরভাগ আরবি ও আফ্রিকান খাবারেই রান্না করার সময় নুন দেবার প্রচলন নেই, বিশেষত মাংস ও সামুদ্রিক মাছে। ওনারা খাবার সময় সামান্য নুন মিশিয়ে নিতেই অভ্যস্ত, তাও সবার লাগে না। বাঙালির পক্ষে নুন ছাড়া রান্না মেনে নেওয়া শক্ত বলে উল্লেখ করছি যে আপনার রুচি অনুসারে নুন মিশিয়ে নেবেন।

রকমফের:

এই একই রান্না, ভেড়ার বদলে মুরগির মাংস দিয়েও করা যায়. আবার, সামান্য মধু দিয়ে আরো মিষ্টি আর ঘন করা যায়।

আমার পরিবারের ও কিছু আরব বন্ধুদের যারা এই পদটি মরক্কান রেস্তরা থেকেও খেয়েছেন, এই পদ্ধতির রান্না ভালই লেগেছে। আপনাদের ভালো লাগলে প্রচেষ্টা সফল জানব।

শিউলি ঝরা বসন্ত

ভাস্কর লাহিড়ী

একটা পুরনো বটগাছকে ঘিরে বাঁধানো দু'স্তর বেদী। গাঁয়ের চণ্ডীতলা নামেই জায়গাটার পরিচিতি। দু'দিকে দুটি মেঠোপথের ইশারা। বাঁধানো বেদির একটা ধাপে বসে রয়েছে পাগল সদৃশ একজন মানুষ, দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে ঢাকা তার মুখ, কম্বলে জড়ানো বাকি শরীর। তার অচঞ্চল দৃষ্টি নিবদ্ধ গাছের পাতায়-শাখায়।

পর্দা ওঠার ২/১ মুহূর্ত পর মেঠোপথ ধরে এসে দাঁড়িয়ে যায় ফতিমা, এই গাঁয়েরই মেয়ে সে; পেছনে এসে স্ত্রীর ইশারায় থমকে দাঁড়ায় তার স্বামী ইরফান।

ইরফান - কি ব্যাপার?

ফতিমা – [ইঙ্গিতে চুপ থাকতে বলে গাছের কাছে এগিয়ে এসে নরম স্বরে ডাকে] ভাইজান-

(সাড়া না পেয়ে) ভাইজান –

লোকটি এবার নড়েচড়ে ওঠে, ধীরে একবার এদের দেখে নিয়ে উঠে পড়ে, ধীর পায়ে চলে যায় গ্রামের মেঠো পথ ধরে।

ইরফান – কি ব্যাপার বলতো? কে লোকটা? কেমন যেন খুনে-খুনে দৃষ্টি ওর চোখে-

ফতিমা – কি বললে?

ইরফান – হ্যাঁ, ওর চোখ জোড়ায় কেমন যেন এক খুনে খুনে দৃষ্টি!

ফতিমা – তুমি ঠিক বলছ? ওর চোখে তুমি ওরকম দৃষ্টি দেখলে?

ইরফান – না মানে, বিশ্বাস কর- এক ঝলক দেখে আমার ওরকমটাই কেন জানি মনে হ'ল, অথচ তুমি ওকে ভাইজান বলে ডাকলে-

ফতিমা - (ম্লান হেসে) তোমার মনে হওয়াতে আমার কোন হাত নেই ইরফান, ওর চোখে খুনির দৃষ্টি দেখাটা হয়ত অস্বাভাবিকও নয়; আবার গ্রামসম্পর্কে আমার ভাইজানও তো বটে! এস, এখানে একটু বসি...

ইরফান - পথের মধ্যে এই গাছতলায় এখন বসবে! তোমার মতলবটা কি বলতো?

ফতিমা - মতলব টতলব কিছু না, বাপের বাড়ি গাঁ, গাঁয়ের চন্ডিতলা, মায়ের হাতের সোহাগ যেন এই বাতাস! এস এস তোমায় ভাগ দিচ্ছি।

ইরফান - ধ্যুস! কতদূর থেকে কতদিন পর আসছি বলতো! হনিমুন সেরে নিজের বাড়ি না গিয়ে সোজা চলেছি শ্বশুরবাড়ি, (মজা করে) শাশুড়ি এখন রাস্তার মাঝে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মেয়ে-জামাইকে বাতাস করবেন বলে?! (মিলিত হাল্কা হাসি) এখনও অনেকখানি রাস্তা না?

ফতিমা - খুব বেশি না, এই এক কিলোমিটার মত হবে,

ইরফান - স্টেশনে নেমে কেন যে তুমি হেঁটে যাবার বায়না ধরলে?

ফতিমা - বাঃ তোমাকে তো ঘাড়ে করে কিছু বইতে হচ্ছে না, ব্যাগ-ব্যাগেজ তো পাকা রাস্তা ধরে মনিরুল চাচার ভ্যান রিক্সায় চেপে বাড়ি পৌঁছে গেল এতক্ষণে।

ইরফান - হ্যাঁ মাল পৌঁছে গেল, মালিক এসে দাঁড়াল গাছতলায়; আমরাই বা ভ্যান রিক্সায় চেপে গেলে কি ক্ষতি হতো?

ফতিমা - বেশি না, সামান্য ক্ষতি। হাঃ হাঃ এই মাটির সঙ্গে যে আমার আজন্ম প্রেম ইরফান, এতদিন পর এসে এর ধুলো না মাখলে এই মা-মাটির অন্তর আমি ছুঁতে পেতাম? এস এস এখানে একটু বসে যাও-এই বিরাম-বৃক্ষের তলে।

ইরফান - তা বিরামটা কতক্ষণের?

ফতিমা- উ-উ ঠিক আছে ঐতো ঐ বাঁক ঘুরলেই সাতআনার মোড়। রিক্সা-ভ্যান সবই চলে, চেঁচিয়ে ডাকলেই এসে যাবে। এস না একটু বসি তারপর-

ইরফান - ঠিক আছে ঠিক আছে। আমি এখানেই বসছি। (সিগারেট ধরায়) পাগলি! তুমি সত্যিই একটা পাগলি, না হলে গ্রামের মাটি, গ্রামের মানুষজন দেখলেই এমন নস্টালজিক হয়ে পড় যে কোথাকার কে একজন খুনি-না-পাগল তাকেও তুমি ভাইজান ডেকে বস!

ফতিমা - পাগল! কে পাগল?

ইরফান - ঐ যে ঐ লোকটা... পাগলের মত দেখতে... গরমে কম্বল গায়ে...

ফতিমা - স্ট্রেঞ্জ! তুমি এক ঝলক দেখেই এমন ঠিক ঠিক বুঝলে কি করে?

ইরফান - এই ফতিমা প্লিজ বোর ক'রো না।

ফতিমা - এই না, সিরিয়াসলি. আমি একটুও বোর করছি না; তুমি ওর সম্পর্কে আলটপকা যা সব বলছ – খুনি, পাগল, এর কোনটাই একদম ফেলে দেবার মত নয় কিন্তু...

ইরফান - তাই?

ফতিমা - হ্যাঁ, তাই।

ইরফান - তার মানে তোমার ভাইজান একাধারে খুনি এবং উন্মাদ? তা কোনটি আগে খুনি না পাগল?

ফতিমা - হুঁ? হুঁ! প্রথম, প্রথমে তো ও খুনি তারপর...তারপরই তো ও অন্যরকম...

ইরফান - ইন্টারেস্টিং তো কাকে খুন করল তোমার ভাইজান? আর কবে?

ফতিমা - কাকে খুন করেছে?! তাকে তুমি চিনবে না। আর কবে?! এই তো এই তো দু'বছর হয়নি এখনও। খুনটা কোথায় করেছে জানো?

ইরফান - আমি কি করে জানব?

ফতিমা - ঠিক তুমি যেখানটায় বসে আছ, ঐখানে।

ইরফান - হাঃ হাঃ রাত্তিরে ট্রেনে ভালো ঘুম হয়নি তো তাই ভুলভাল বকছ এখন

ফতিমা - আমি সিরিয়াস ইরফান।

ইরফান - রিয়েলি? তা তোমার কথা যদি সত্যি হয়, তবে তো লোকটার এতদিনে জায়গা হওয়া উচিৎ ছিল জেল গারদে।

ফতিমা - অথবা পাগলাগারদে...

ইরফান - হ্যাঁ সেটাও মন্দ হতো না।

ফতিমা - কিন্তু মজা হল ও দুটোর কোনটাই আল্লার পছন্দ হলো না ওর জন্যে। তাই তো ভাইজানের জন্যে আল্লা বেছে দিলেন এই গাছতলা, চন্ডিতলার এই বেদী।

ইরফান - আল্লা বেছে দিলেন? খুনিকে মাফ করে দিলেন আল্লা?

ফতিমা - তা নয়তো কি! নাহলে পুলিস ওকে ধরেও ধরে রাখতে পারল না কেন? কেন ছেড়ে দিল!

ইরফান - হাঃ হাঃ এই তুমি কি গাঁয়ের চণ্ডিতলার কোনও অলৌকিক মাহাত্ম্য কীর্তন শুরু করলে? জান তো আমি ছোটবেলা থেকেই পদার্থবিজ্ঞানে বিশ্বাসী, কোনও বুজরুকি আমায় টানে না কোনদিন...

ফতিমা - বুজরুকি বা বিজ্ঞান কোন কিছু দিয়েই আমি তোমার বিশ্বাস টানতে চাইছিনা, কিন্তু এটা ঘটনা।

ইরফান - পুলিস ধরেও ধরে রাখতে পারল না, শাস্তি দিতে পারল না, এটা ঘটনা? হুঁ! দুর্ঘটনার গাঁজাখুরি সব।

ফতিমা - কি করে শাস্তি দেবে বল? একটা খুনের কেসে পুলিস ওকে ধরতে পারে কিন্তু বিচার করে শাস্তি দিতে গেলে তো তার বিরুদ্ধে সাক্ষী চাই, প্রমাণ চাই, এসবের কোনটাই তো পায়নি।

ইরফান - ওঃ ও যে খুন করেছে সেটার কোন প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না?

ফতিমা - সবাই দেখেছে, সবার চোখের সামনেই তো ও এক কোপে...

ইরফান - আশ্চর্য! সবাই দেখল অথচ একজনও সেটা বলল না পুলিসের কাছে! কেন ও কি বর্ন ক্রিমিনাল. নাকি দুঁদে পলিটিশিয়ান?

ফতিমা – ওসব কিছু নয়, আসলে আদালতে বিচার হবার আগেই আল্লা যে বিচারটা করে দিলেন, গাঁয়ের মানুষ সেটাকেই শেষ আর ন্যায্য বিচার বলে মনে করল যে...

ইরফান - তোমার কথা আমার কাছে খুব গোলমেলে ঠেকছে ফতিমা, একজন খুন করল, অথচ শাস্তি পাবে না?

ফতিমা - পেলো তো। আল্লার মার দুনিয়ার বার। প্র্যাক্টিকালি ভাইজানের তো মৃত্যুদণ্ডই হল। খুনের পরপরই ওর বোধশক্তি স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পেল। শেষের পরেও উপসংহারের মতো ও টিঁকে রইল। বেঁচে রইল কি! ইরফান ভাইজানের এতবড় শাস্তিটাকে তোমার কি নেহাতই কম বলে মনে হচ্ছে?

ইরফান - কি জানি বুঝতে পারছি না। গাঁয়ের মানুষ চোখের সামনে একটা খুন হতে দেখেও কি করে চুপ করে থাকে আমার মগজে ঢুকছে না। আই অ্যাম কনফিউসড।

ফতিমা - এই খুনটা ছিল একটা পোয়েটিক জাস্টিস।

ইরফান - পোয়েটিক জাস্টিস!

ফতিমা - ইয়েস আ পোয়েটিক জাস্টিস।

(বাইরে দূরে রিক্সার হর্ণ)

ইরফান - (হেঁকে) এই রিক্সা- ওঃ প্যাসেঞ্জার রয়েছে, যাই হোক থ্রিলিং স্টোরি লাইন, শুনতেও ইচ্ছে করছে কিন্তু এখুনি এখানে...

ফতিমা - এতে গল্প কোথায় পেলে? এতো ঘটনা। চোখে দেখা-ছুঁয়ে থাকা। মাত্র বছর দুয়েক আগের ঘটনা। এটা তো ঘটনা ঐ বোলরুদ্ধ-বোধশূন্য পাগল গান গাইত একসময় অপূর্ব গলায়!

ইরফান - ও বাবাঃ এতো একবিংশ শতাব্দীর নিরো। স্পেলন্ডিড কম্বিনেশন – খুনে পাগল আবার শিল্পী! নিরোতর!

ফতিমা - (দুদিকে হাত ছড়িয়ে চন্ডিতলায় ঘুরতে ঘুরতে বলে যায়) জানো ইরফান, এই গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভাইজান যখন গান গাইতো, তার গানের সুরে ঝরে পড়ত কখনো খুশির ফুলঝুরি, কখনও বা ব্যথার বরফকুচি; ওর খুশিতে ফিঙে নেচে উঠতো, ওর ব্যথায় গাছের পাখিরা পর্যন্ত ককিয়ে উঠতো সমব্যথায়। গাছের ময়না-বাবুই-দোয়েল-বুলবুলিরাই ছিল ওর সবচেয়ে আপনজন। কোন হিমেল সকালে যদি দেখতে, দেখতে এই গাছের নিচে পাখিতে-ভাইজানে কি নিবিড় মিতালি- ইরফান আমি তো চোখ বন্ধ করে এখানে দাঁড়ালে এখনও শুনতে পাই লখাই ভাইজানের গান; শোন শোন কান পাতো বাতাসে – ঐ শোন এক ক্ষুধিত পাষাণের কান্না, গাইছে গাইছে আমার ভাইজান গান গাইছে -

[ফতিমার কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রাম থেকে নামতে নামতে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে, আলোর বৃত্ত থেকে একটু একটু করে মুছে যায় এই দুটি চরিত্র, ক্রমশ স্বরগ্রামে ভেসে ওঠে লখাইয়ের গান। ক্রমোচ্চ ঔজ্জ্বল্যে ফিরে আসে মঞ্চের আলো। সময়টা তখন সদ্য ভোর, একটা-দুটো করে পাখি ডেকে উঠছে, সঙ্গত রাগে লখাইয়ের গলায় গান শোনা যায়।]

পালান - (রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ সাইকেল থেকে নেমে পড়ে) কিরে লখাই, এত ভোর সকালে এখানে তুই কি করছিস? মাঠে ঝাবি নি?

লখাই - না গো পালানদা আজ আর মাঠে যাবুনি ঠিক করিচি।

পালান - মাঠে ঝাবিনি! কেন রে শরীলে তেমন যুত নাই?

লখাই - না না শরীল আমার ঠিকই আচে, শরীলের যুতের কুন খামতি লাই গো।

পালান - তবে? মাঠে ঝাবিনি তো এই ভোর সকালে ঘর ছেড়ে বেইরে পড়িচিস, আধকোশ পথ ঠেনিয়ে এসে চন্ডিতলায় বসে কি কচ্চিস? গাছের নিচে বসে গুনগুন করি পাতা গুনচিস?

লখাই - পাখিদের গান শুনছি গো পালানদা, কি করে এমন মিস্টি গায় ওরা!!

পালান - গান শুনচিস না গান গাইচিস?

লখাই - ঐ ওদের সুর লিজের গলায় তুলে নিতি চেষ্টা কচ্চি, কিন্তু ধ্যুস তা কি হয়! দেবতার বর পেয়েচেন ওঁয়ারা, ঐ সুর কি একজন শিউলির গলায় উঠে আসে গো?

পালান - পাগল আর কারে বলে! তা হ্যাঁরে পান্তা খেয়ে ঘর ছেড়েছিস না একদম উপোসী পেটেই বেইরে-

লখাই - দ্যাখ দ্যাখ পালানদা ঐটুকু টুনটুনিটার কতটুকু-টুকু দুটো বাচ্চা! ঐ দ্যাখ বাবুইটা-

পালান - হুঁ দেকিচি, কিন্তু ছোট হলিও ওগুলান সেয়ানা হয়ি উঠিচে যথেষ্ট। বাসা ছাড়ার সময় হয়িচে, ডানায় আর এট্টু আলো এসে পড়লেই ফুড়ুৎ মারবে এ গাছের ডাল ছাড়ি, তুই ঝাবি কোতায়?

লখাই - ঝাক উড়ে, কিন্তু দিনের আলো তো এক সময় ফুইরে ঝাবে পালানদা, তকন গাছের পাখি আবার ফিরি আসবে এ গাছে, নিজির বাসায়; আমি একেনে বসে ওদের পত চেয়ে পতিক্ষে করব।

পালান - আজকের দিনে বেশ কাঝটি জুটয়ে নিয়েচ বাপু হে, কিন্তু মনে আচে তো ওবলায় এই গাছতলাতেই সালিশি বসবে আঝকের?

লখাই - কি বল, মনে লাই আবার! সেই ঝন্যেই তো আঝ মাঠে গেলুমনি। সারাদিন জন খেটে ঝদি সময় মতো এসে উঠতি না পারি তবে এট্টা অনথ হয়ে ঝাবেনি বল? পোধান আমায় গোটা রাকবে?

পালান - দ্যাক, আঝকের সালিশি সুন্দুরীর আর্জি মত বসলেও আসল ঝন হলি তুই। আজ কিন্তু তোরে পারতিই হবে, গেলবার ঝা পারিস নাই এবার কিন্তু তা পারা চাই। মনটারে শক্ত বাঁধন দিয়ি রাক। পোধানসায়েব বা গাঁয়ের পেরায় সকলিই আঝ সালিশিতে হাজির থাকবে, এরা তো কেউ তোর শত্তুর লয়, গাঁয়ের সকলেই তোর ভালোটা চাইরে বাপ, কিন্তু পারতি তো হবে তোরেই।

লখাই - আঝ ঠিক পারব দেকো, সকাল থিকিই মনকে বাঁধন দিতি নেগেচি পাখির সুর দিয়ি, মাটির বাস দিয়ি, পাতা খসখসানির আবাজ দিয়ি; এ এমন শক্ত বাঁধন পালানদা, কোনও সুন্দুরী ঝড়ও পারবেনি এ বাঁধন আলগা করি দিতি।

পালান - মরিচে, সকাল থিকিই তুই ঝদি সুর-বাস-বোলে মজে থাকিস, লখাই আঝও না একটা অনথ বাদিয়ে লিজের সব্বনাশ করে বসিস। সাবধান বাপু হে, আবার ঝেন লোতুন করি এট্টা ভুল করে বসনি-(কারখানার বাঁশি শোনা যায়) ঐ ঝাঃ ফ্যাকটারির বাঁশি বেজে গেল, আমি চলিরে লখাই, ঠিক সোময়ে এসি পড়ব আমি...

(সাইকেলে উঠে দ্রুত বেরিয়ে যায়)

লখাই - (হাসতে হাসতে গেয়ে ওঠে) হাঃ হাঃ হাঃ আমি যদি বাবু হতাম / ও শ্যামের বাঁশি শুনতে পেতাম / আধার মত ছুট লাগাতাম / ঐ কদমতলার পানে গো, / নুপুরের রুমুঝুমু বাজত আমার পায়ে গো...

[গান চলার মধ্যেই দেখা যায় দুজন সাইকেল থেকে নেমে পড়ে, থমকে দাঁড়ায় লখাইয়ের গান শুনে]

সুদর্শন - কি ব্যাপার রে লখাই; আজ সকাল সকাল কাঝকাম ছেড়ে যে বড় গান ধরিচিস, বলি ফুর্তিটা কিসের?

পানু - তুমি যে কি বল সুদশ্যনদা, লখাই ফুর্তিতে গাছতলায় ডাঁয়রে গান গাইবে না তো, তুমি আমি কেত্তন গাইব? বেড়ে ধরেচিস লখাই। তবে সুরটা ঝেন শুনিচি এফ-এম-এ! কতাগুলো ঝেন কেমন কেমন ঠেকচে।

লখাই - আমুও তো রেডিওতেই সুরটা শুনিচিরে পানু, তবে একবার শুনি কতাগুলান তো ঠিক ঠিক মনে রাখতে পারি নাই; সুরটা মনের মদ্যি রিয় গেছিল, আঝ পালানদা কলের ভোঁ শুনি এমন ছুট নাগাল, গলা দিয়ে সুরটা বেইরে এল, কতা বেঁদে সুর নাগিয়ে ছুঁড়ে দিলম গানখানি।

সুদর্শন - ওঃ বেটা কবিয়াল রে পানু, সুর পেলি কতা বেঁদে বেঁদে গান বাইনে দেয়।

পানু - তবে! আর তুমি তাকেই গান করতি মানা করচ?

সুদর্শন - আহা কৈ! আমি তো গান কত্তি মানা কচ্চিনে; গান তো লখাই গাইবেই, ও হল সাজাদাপুর-চুপরিঝারা-মায়াহরি- এই তিন অঞ্চলের মদ্যি সেরা গাইয়ে, সুতরাং ও তো গাইবেই, কিন্তুন আমি বলচি অন্য কতা, ওবলার কতাটা শুদু স্মরণে রাকতে বলচি ওকে।

পানু - কি কতা বলতো? ওবলা কি?

সুদর্শন - আচ্চা তুই-ই বলতো পানু মাটিতে বিষ্টি পড়ে কখন? না গগনে মেঘ জমলি, তেমনি গলায় গান আসে কখন? না পরানে ঢেউ উঠলি, অসের বান ডাকলি; কিন্তু লখাইয়ের পানে তো একন অসের ধারায় ভাটির টান, আর আঝ তো বিশেষ করি অসে এক্কেরে ঘোর মরা কটাল।

পানু - বুঝলম নি, এট্টু ব্যাখ্যা দাও।

সুদর্শন - ভুলে গেলি? আঝ তো ওর অগ্নিপরীক্ষে, বিচেরের দিন, এখেনেই তো ওবলা ওর আর সুন্দুরীর আপোষ-বিচ্ছেদের সালিশি বসবে।

পানু - আরে ছাড়ো তো তোমার বিচের। বিচের আবার কি? ঐ বজ্জাত মেয়েছেলেটা লখাইয়ের কাছ থেনে ছাড়ান চেয়েচে এই তো? হ্যাঁ এর আগের বার লখাই পারেনি, তো এবার পারবে! ওর ম্যুয়ে ধাঁই ধাঁই করে দুটো লাথি কষিয়ে দিবি। এট্টা গেলবারের পাওনা বাসি, আর এট্টা এবারের, কিরে পারবিনি?

লখাই - হেঁ পারব।

পানু - তবে, ওই ডাইনি মেয়েছেলেটারে তের হাত কাপড়ে কাছা দিতে শিখয়ে দিবি

লখাই - দুব। নিচ্চয় পারব। এবার আমায় পারতিই হবে, বল পানু? তোরা আমোয় পারতি বলচিস, সেও তো সিটাই চায় তো আমোর না পারার কি আছে! সবাইরে একসন্নে খুশি করতি...

সুদর্শন - দ্যাখ লখাই আজকের সালিশির তিনজন সালিশিয়ানের মদ্যি পঞ্চায়েতের মেম্বর হিসেবে আমুও একজন হাজির থাকব। মানি, মানি আগের থেনে কারও পক্ষ নেওয়াটা আমোর দিক থিকি বড়ই অনেয্য, তবু এ গাঁয়ে তো এমন কেউ নি যে

সভায় ডাঁয়রে তোর শত্তুতা করবে; তাই বলি কি শয়তান মেয়েছেলেটারে তোর জেবন থে জন্মের মত খেদয়ে দিয়ি তুই নিস্কিতি পা। তারপর গা না, সারাদিন ধরি গা। চাই কি, এই তো আমোদের পানুও এট্টু-আধটু গাইতে পারে, ওরে নি, আরও দু'চারজন জুটয়ে নিয়ি এট্টা গাজনের দল খুলি ফ্যাল। তাহলে আর তোরে গাছেও চড়তি হবে নি, ভুঁয়েও কোপাতি হবে নি, তকন তুই আসরে আসরে গেয়ে বেড়াবি।

পানু - আরে সুন্দুরী ছাড়ান চাইছে মানেটা কি? সুন্দুরী তো সোয়ামীরে ছেড়ে ভেগিচে সেই কবেই, একন সুদু তার ছাড়ান যাওয়ায় সোয়ামী লখাইয়ের 'হ্যাঁ'-এর এট্টা শিলমোর লাগবে, তার ঝন্যিই সালিশি, বিচের যত্তসব!

সুদর্শন - আচ্চা লখাই সুন্দুরী তোরে ছেড়ে পাইলেচে তা কদ্দিন হলো? বছর পেরয়ে গেচে তাই না রে?

লখাই - বছর ঘুরি গেচে কবে! তারপর আরও কতগুলান অমাবস্যি-পুন্নিমা কেটি গেল...

সুদর্শন - আহা লখাই, বেটাছেলে এত নরম মনের হলি চলেনে, বেটা ছাওয়ালের মনটারে কঠিন করি রাকতে হয়, নইলে সোমসারের যত দুঃখু ঐ বেটা ছাওয়ালের কপালি এসে জোটে।

পানু - আচ্চা তুই এট্টা কতা আমোরে বুঝ করি দেতো লখাই, তুই হলি জাতে শিউলি, গাছে উঠে ভাঁড়ে করি অস লামানো তোর কাঝ, তা হঠাৎ করি তুই গাছের আগা ছেড়ি এক্কেরে গোড়ায় এসি নামলি কেন? জাত-ধান্দা ছেড়ি জন খাটার কাঝে মতি দিলি কেন?

লখাই - সুন্দুরী বলল ঝে...

পানু - সুন্দুরী বলল?

লখাই - হ্যাঁ, সুন্দুরী বলল –অসের ভাঁড় লামাতি তোমারে রাত থাকতি বিছনে ছাড়তি হয়, একা বিছনেয় পড়ি থাকতি আমার ভয় নাগে। এর থেনে ঢের ভালো জমির কাঝ বা কলের কাঝ, আলো ফোটা পয্যন্তি ঘরে থাকতি পার; সেই বে'র পরপরই বলেছেল এ কতা। আমু শুনি নাই, বলেছিলম-আমি হলম শিউলির ছাওয়াল, এটি আমোর জাত ধান্দা, এটি আমি ছাড়তে পারবুনি।

পানু - ওঃ ধড়িবাজ মেয়েছেলে, বজ্জাতের আঁটি; একা বিছনেয় থাকতি ভয় নাগে।

সুদর্শন - কিন্তু শেষ ইস্তক সুন্দুরী তোরে গাছ-ভাঁড় ছাড়াই কল্লতো?

লখাই - নাগো সুদ্যশনদা ও যতদিন ঘরে ছেল আমি গাছ ছাড়ি লাই, রাত থাকতি বেইরে পড়তাম ওঝকার কাঝে, পরের দিকে ও আর বিরূপ হতো নি। অথচ আমু ঝদি পেরথমেই ওর কতায় আপত্তি না করি মান্যি করি লিতম তবে তো আমার এ সব্বোনাশটি হতো নি...

পানু - তা হ্যাঁরে সুন্দুরী যে অসের ভাঁড় ছাড়ি নাগরে মজিছে সে শুয়োর বাবুলালটারে জোটালে কোত্থেনে? সে তো এ গাঁয়ের কেউ লয়!

সুদর্শন - না না সে তো থাকে গোচরণে, চরনের ভাঁটিপাড়ায়।

লখাই - বাবুলাল ভাটিপাড়ায় থাকলিও ও কিন্তু চোলাই মদের কারবার করে নে, ও করে স্বাদীন ব্যপসা। নিজের হাতে তাড়ি বাইনে বেচে। আসতো আমোর কাছে শাবন-ভাদোর মাসে তালের অস কিনতি। স্বাদীন ব্যপসা তো, হাতে কাঁচা পয়সার জোর খুব...

সুদর্শন - তা তো হবেই, এখন দুনিয়ার নিয়মই হয়েচে এমন; মধুর চেয়ে বিষের দর দরো। আলুচাষি আলু বেচে পয়সা পায়নে, পোকামারা বিষ খেয়ে মরে; কিন্তু সেই আলু ভেজে পেকেটে করে যে ব্যপসা কচ্চে, পয়সা কামাচ্চে সে।

লখাই - পয়সার জোরেই বাবুলাল, ঘরে এট্টা বউ থাকতিও আমোর ঘর ভেনে সুন্দুরীরে ফুসলে নে গেল। ভাটিখানার পাশে লোতুন ঘর তুলি রাখল ওরে, হুঁ! তবু ঝদি লিজের বাস্তুঘরে তুলতো, আজরাণি হয়েচে সুন্দুরী আজরাণি! ঝানো সুদশ্যনদা মাজে মাজে মনে লেয় – দিই একদিন গে বাবুলালের গলা পেঁচয়ে এক হাসুয়ার টান...

পানু - তাই দিস নে কেন? শুদু ভাবলে চলবে? দিয়ি দিবি একদিন এক পোঁচ

লখাই - (কেঁদে ফেলে) দিতি পারি না, পারিনা সুন্দুরীর কতা ভেবে। এ নাও ছাড়ি ও নাওয়ে উঠিচে ও, আম্যু এক নাওয়ের মাঝি হয়ি অন্য নাওটা কি ডুবয়ে দিতি পারি? সুন্দুরী ডুবে ঝাবে যে...

পানু - হুঁ! তুই বেটাছাওয়াল? তোর ছু-ছুন্দুরী তোরে এমনি ছেড়ি ঝায়নি, আমোর তো মাঝিমাঝি সন্দ হয় তুই আদৌ মরদ কিনা!

সুদর্শন - আঃ পানু!

লখাই - মরদ পোমান কত্তি কত অক্ত ঝরাবো? যে হাসুয়ার টানে টানে একদিন গাছের বুক চিরে অস ঝরাতাম সে হাসুয়ার এক পোঁচে অক্ত ঝরাতি হবে? কেন, নিজিরি মরদ পোমান কত্তি! কিন্তুন না সে আম্যু পারবুনি, অক্তে আমার বড় ভয়, আম্যু পারবুনি।

সুদর্শন - থাক, কারও গলা তোরে কাটতি হবেনি। তুই হলি অসের মানুষ, অক্ত তোর ধাতে সইবেনি। হেসোয় শান না দিয়ি মনটারে টানটান রাক ঝাতে ওবলা সবার মদ্যি ডাঁয়রে মনে কোন দোলাচল না আসে, সুন্দুরীর আজ্জিতে যাতে এক কতায় হ্যাঁ করি দিতি পারিস মনটারে তেমন মত তৈয়ার রাখ। লখাই, আমরা গাঁয়ের সবাই চাই তুই ডাইনি ছাড়া হয়ে জীবন শুরু কর। আমরা সবাই ডাঁয়রে থেকে তোর আবার বে দুব।

পানু – চল সুদশ্যনদা, হাটের মদ্যি এট্টা ঘুরণ দে বিডিও আপিসে একবার ঝেতি হবে, কাজ আচে...

সুদর্শন - (বিড়ি ধরিয়ে) হ্যাঁ, নে, চ, আমার আবার তারপরেও পঞ্চায়েত আপিসে গে বসা আছে, বি পি এল কাডগুলান সব ঠিকঠাক দেয়া হচ্চে কিনা দেকতি হবে; চলি রে লখাই, দেকিস বাবা আঝ আবার ডুবোসনি ঝেন, এট্টা 'হ্যাঁ' করি দে সবার মানটা রাকিস।

- কারখানার ভোঁ বাজে –

পানু - এই হয়েচে এক কলের ভোঁ, পোহরে পোহরে উনি বেঝেই চলেন। গাছের ডালে পাখি বসা দায় হয়ি উঠিচে, এই উৎপাতটা পেঁচো কোত্থেনে আমদানি কল্লে বল দিনি?

সুদর্শন - হাঃ হাঃ সিদিন ওই পেঁচো হালদাররে জিগ্যেস করলুম – হ্যাঁগো হালদারের পো গাঁয়ের মদ্যি এই বল-ডুমের কারখানা পাতলে কোন আক্কেলে? তা সেই কতা শুনি পেঁচো কি বলে ঝানিস? বলে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দেছে গিরামের সকল ঘরে ইলেকট্রি আলো পৌঁছে দেবেন, তা আলো পৌঁছনোর আগে তো বাতির জোগাড়টা

করি রাকতে হবে নাকি! আবার হাসতি হাসতি বলে টাটা যেটা পারলনি সেটা আমি করে দেকলম ভিটের লাগোয়া এক টুকরো বাঁজা জমিতে। এই জন্যেই গব্ব ভরে ভোঁ মেরে ডাক দিয়ে বলি 'জাগো'!

পানু - (হাসতে হাসতে) বেটা, চাষার বেটা হালদার এবার ডুম বেচে মালদার হবার কল করেছে! তাও আবার টাটাকে টক্কর! তবে বুঝলে সুদশ্যনদা, পেঁচোর মত সবাই যদি গেরামটারে এমন পাগলপারা ভালবাসতি পারতো, গেরামের ছপিটাই আঝ পেল্টে ঝেতো, গেরামের মানেটাই পেল্টে ঝেতো...

সুদর্শন - পেল্টে ঝাবে, পেল্টে ঝাবার কাজ তো শুরু হয়ে গেচে পানু, তবে একা বা কয়েকঝন মিলি তো সব পেল্টে দিতে পারবেনি, সকলা মিলি সেই চেষ্টাটা করতি হবে। তবে আমোদের ঝেটি সব্বার আগে করতি হবে পানু সেটি হল গেরামের মদ্যি লেকাপড়ার চচ্চাটি বাড়য়ে তুলতি হবে-(পথ ধরে এসে দাঁড়ায় আসরফ আর ফতিমা) এই দ্যাকো, লেকাপড়ার কতা বলতিই স্বয়ম মা সরস্বতী এসে হাজির! কিরে আসরফ শহর থে বুইনরে সঙ্গে নে এলি?

আসরফ - হ্যাঁ গো দাদা ফতিমা তো কলকাতায় মেসে থেকে পড়াশুনা করে, তো কাল আমি শ্যেলদার কোটে গিছিলাম এট্টা কাঝে, তো সেটা তাড়াতাড়ি সারা হয়ি গেল বলি ওর সন্নে দেকা করতি গেলম, তো মুখপুড়ি বায়না ধল্লে – সামনে তিনদিন ছুটি আচে, আমোরে বাড়ি নে চল। কিন্তুন কাল বিকেল থিকেই কেমুন কালবোশেখি এসে পড়ল দেকলে তো, তাই আত্তিরে আর আসা হলনি, আজ ভোর-ভোর ভাই বুইনে রওনা দিছি।

সুদর্শন - বেশ করেচিস।

পানু - আকাশের হাল কিন্তু আঝও বিকেলের দিকি বিগরতে পারে, দিদিমনি কটা বাঝল?

ফতিমা - (ঘড়ির দিকে দেখে) তা বাজল...

পানু - উরিব্বাস! সুদশ্যনদা আমি চললাম তাড়া আছে । (প্রস্থান)

সুদর্শন - তুই এগো, আমি আসতিছি – তারপর ফতিমা?

ফতিমা - আদাব ভাইজান।

সুদর্শন - আদাব... আদাব... কি পড়ালিখাতে কোন অযতন হচ্চে না তো?

ফতিমা - না ভাইজান, চলছে।

সুদর্শন - হ্যাঁ দেকো, ওখানটিতে ঝেন কোনও ফাঁকি না পড়ে; নাও এবার এগোও, সেই কোন ভোর সকালে বেইরেছ, বাড়ি গে বিশ্রেম নাও।

আসরফ - সুদশ্যনদা (লখাইকে দেখিয়ে) আসামি তো এখনই হাজির, ওবলা তো বসছে তো সালিশি?

সুদর্শন - নিচ্চই। তুই থাকবিনি সভায়?

আসরফ - থাকবুনি মানে! আমি না থাকলি – (আড়চোখে লখাইকে দেখে নিয়ে) হুঁ! বাবুলালের তেল চুকচুকে মোচটা দেকেচ? এক্কেরে শিকেরি ভাম।

সুদর্শন - হাঃ হাঃ হাঃ ঘাবড়ে দিসনি অকে, চলিরে সবাই, লখাই মনে রাখিস বাকি কথাগুলান... (প্রস্থান)

আসরফ - ভাবিসনি, আঝ এট্টা হেস্তনেস্ত করি ফ্যাল। টকাস করি এট্টা 'হ্যাঁ' ঝেড়ে দে সুন্দুরীর আজ্জিতে, তারপর দ্যাকনা গেরামের সকলে মিলি তোর জেবনটাই কেমন পেল্টে দুব, ঠিক আছে? আয় ফতেমা। (প্রস্থান)

ফতিমা - তুমি এগিয়ে যাও, আমি যাচ্ছি – কি গো লখাইদা, আজ তো তোমার আর সুন্দরীভাবীর তালাকের আসর বসছে?

লখাই - এই তোরে কে বলল রে?

ফতিমা - বাঃ এই সব হেটো খবর কি কারও বলা কওয়ার অপেক্ষায় থাকে নাকি? হাটের খবর এমনি হাওয়ায় ভাসে আর ভাসতে ভাসতেই কানে পৌঁছে যায়।

লখাই - তুই ছেলেমানুষ, সব কতা সবসময় কানে লিতে নি, ঝা একন ঘর ঝা।

ফতিমা - হাঃ হাঃ ছেলেমানুষ বলে ঘরে পাঠাচ্ছ না মেয়েমানুষ বলে পাত্তা দিচ্ছ না।

লখাই - ফতেমা, দু'পাতা পুঁথি পড়েছিস বলেই বড়দের সব ব্যাপার স্যাপার বুঝে লিবি, এটা ভাবিসনি। সব কিছু বোঝার বয়স তোর এখনও হয়নি।

ফতিমা - ঠিক বলেছ, বড়দের ব্যাপার স্যাপার আমি সবটা বুঝি না, তা বলে আমি এতটা ছোট নই লখাইদা, যে আমি কিছুই বুঝি না।

লখাই - অ্যাই অ্যাই তুই মেয়েমানুষ, তুই কি বুঝবি রে?

ফতিমা - এই তো, এইবার ঠিক হয়েছে, এখন তোমাকে বেশ পুরুষসিংহ পুরুষসিংহ মনে হচ্ছে; তা সিংহমশাই এবার কি ঠিক করেছ? গতবারের মত গ্রামশুদ্ধ সবাইকে ডোবাবে, নাকি নিজে ডুবে সবাইকে এবার ভাসিয়ে তুলবে, হুঁ?

লখাই - হুঁ! আমি ঠিক করার কে! গেরামের সবাই ঝা চাইছে, সবাই ঝা ঠিক করিছে তাই হবে।

ফতিমা - কিন্তু আগেরবার তো তা হয়নি, সবাই যা চাইছিল সেবার তো হয়নি, পারনি তো?

লখাই - এবের পারব। এবের আর ভুল হবেনি, ঠিক পারব।

ফতিমা - তুমি ঠিক জানো? ঠিক পারবে তুমি – সুন্দরীভাবীর তালাক চাওয়ার আর্জিতে 'হ্যাঁ' বলে দিতে?

লখাই - তুই-কি-কি বলতে চাইছিস তুই?

ফতিমা - 'হ্যাঁ' এই ছোট্ট কথাটা বলতে একটুও গলা কাঁপবে না তোমার? হৃদয় একটুও দুলে উঠবে না? তোমার চোখের পাতা একটুও ভিজে যাবে না তো? (প্রশ্নের মুখে লখাই হতবাক, ফতিমা প্রসঙ্গ পাল্টায়) হাঃ হাঃ আচ্ছা লখাইদা, তুমি এখনও গান গাও? আজ গেয়েছ?

লখাই - হ্যাঁ গাই, গেয়েছি।

ফতিমা - আজও গেয়েছ?

লখাই - বাতাস থেনে শ্বাস লিই আর বাতাসেরে গান শোনাবনি? ঝানিস বুইন আমোর বুকের মদ্যি বুঝি এট্টা মউর বসে আচেন, উনি রোদ-মেঘলা বোঝেন না, যকন তকন পেখম মেলে ধরেন আর পেখমের রামধনু রং ধুয়ে সুর ঢেলে দেন আমোর গলায়; সে সুর দুক্কু-সুকের ধার ধারেনে, গান হয়ি ঝরি পড়ে যকন তকন...

ফতিমা - ব্যস ব্যস তাহলেই হয়েছে।

লখাই - কি হয়েছে?

ফতিমা - যা হবার, হাঃ হাঃ তুমি এবারেও পারবে না।

লখাই - এই, এই তুই কু গাসনি তো এঁ! এতটুকুন মেয়ে দাঁত বের করি হাসতি নেগেচে দ্যাকো!

ফতিমা - আমি কু-সু কিছুই গাইছি না লখাইদা, গাইছ তুমি; তোমার গলার সুর মনের কথা নিয়ে সে গান গাইছে অহরহ, তাতে তোমার নিস্তার নেই। তুমি ভাবীকে এত ভালবাস, এখনও এত ভালবাস যে তার ছাড়ান আর্জিতে তুমি এবারেও রাজি হতে পারবে না।

লখাই - কিন্তু গেরামের সবাই যে চাইছে আমি রাজি হই, সুন্দুরীর পোস্তাবে 'হ্যাঁ' করি দিই, সবারে খুশি করতি আমোর কি 'হ্যাঁ' বলাটাই নেজ্য লয়?

ফতিমা - না।

লখাই - কি না?

ফতিমা - গ্রামের সবাইকে খুশি করতে, এমন কি ভাবীকে খুশি করতে তোমার 'হ্যাঁ' করাটা, তাকে ছাড়ান দেওয়াটা উচিত হবে না তোমার। এতে তোমার ভালবাসা যে অপমানিত হবে লখাইদা, আর সকলকে খুশি করতে তোমার ভালবাসাকে ঠকাবে তুমি? সুতোটুকু ছিঁড়ে দিয়ে অপমান করবে তাকে?

লখাই - সবার কতা বাদ দিলিও সুন্দুরী? আমার রাজি হওয়াতে সুন্দুরী তো খুশি হবে, ওরে খুশি করতি পারলিই ঝে আমোর সবচেয়ে সুক রে বুইন।

ফতিমা - না, তাতেও তোমার সুখ নেই। এর আগেও তো সে আর্জি জানিয়েছে ছাড়ান পেতে, সালিশি বসেছে, সে সময় তুমি 'হ্যাঁ' করনি কেন? করলে তো অনেক আগেই তুমি ভাবীকে খুশি করে নিজের সুখ কুড়িয়ে নিতে পারতে। তখন পারনি কেন?

লখাই - কেন? কেন তুই বল বুইন, তুই তো পুঁথি পড়া মেইয়ে, তুই বল সুন্দুরী খুশি হবে ঝেনেও সিদিন আমি 'হ্যাঁ' না বলি কেন গোঁ ধরি 'না' বলি দিছিলম? কেন?

ফতিমা - গোঁ ধরে নয়, সেদিন যেটা করেছিলে তা তোমার ভালবাসার জোরে। একতরফা ভালবাসা, যার কোন বিনিময়তা নেই, অনেকের চোখেই তোমার ভালবাসা মর্যাদাহীন, কিন্তু আমি শ্রদ্ধা করি তোমার প্রেমকে। ভাবীর প্রতি তোমার এই বিনিময়তাহীন ভালবাসাকে আমি চিরকাল কুর্নিশ করে যাব, কেন জানো?

লখাই - আমি তো আকাট মুখ্যুরে ফতেমা, তোর শক্ত শক্ত কতার কোনটার কি অথ্য হয় তা কি আমি ধরতি পারি?

ফতিমা - হ্যাঁ, শক্ত, এক কঠিন সত্যি কথা। এ আমার বিশ্বাস। আমি বিশ্বাস করি- জুলিয়েটের সাড়া না থাকলে ইউরোপীয় সাহিত্যে একাকী রোমিওকে কেউ চিনত না। লায়লা পিঠ পেতে না দিলে শরিয়তি পাথরের আঘাতে আঘাতে দিওয়ানা মজনু আরব মরুতে মাথা কুটেই মরতো, ইতিহাস তাকে মনে রাখতো না। লাবণ্য ছাড়া কি নিঃসঙ্গ অমিত শোনাতে পারতো বাংলা সাহিত্যের অমর প্রেমগাথা 'শেষের কবিতা'? কিন্তু তুমি! তুমি একা! একধারে একা তুমি, আর বিপরীতে শুধুই লোভ আর উৎকট রিরংসা। তাই, বিশ্ব সাহিত্যের বহু প্রেমিকপ্রবরকে তোমার পাশে দাঁড় করিয়ে দেখি, দেখি-না, এরা কেউ তোমার সমতুল্য নয়। তুমি এদের চেয়ে অনেক অনেকখানি বড়...হ্যাঁ...

লখাই - বুইন তুই তো মা সরস্বতীর বর পেয়েছিস, একন তুই বল দেখি আমি কি করব? হ্যাঁ বলব না বলব? বুইন?

ফতিমা - অ্যাঁ!

লখাই - আমি কি করব একন?

ফতিমা - ওঃ! (ম্লান হেসে) আমি তো ছেলেমানুষ আমি কি বলব বল? নিজের বুকে হাত রেখে নিজেই জিজ্ঞাসা কর না ভাইজান, তুমি কি করবে!

লখাই - সিখানে তো সদাই উল্টো তালে তেহাই বাজে – না-না-না (খেদে আর দৃঢ়তায় পা ঠোকে মাটিতে)

ফতিমা - তবে তো উত্তর পেয়েই গেছ, পরোয়া কাকে?

লখাই - আমি তো তাও বুঝি না রে ফতেমা – গেরামের সক্কলের মুয়ে যকন এক রা – লখাই হ্যাঁ বলে দে, লখাই রাজি হয়ে যা, একমাত্তর বুইন তুই-ই কেবল...

ফতিমা - (ভয় পেয়ে) এবার আমি যাই ভাইজান।

লখাই - চলে ঝাবি?

ফতিমা - যাব না! দাদা কতদূর... বোধ হয় এতক্ষণে বাড়ি পৌঁছে গেল।

লখাই - হ্যাঁ, হ্যাঁ চলে ঝা। বড্ড দেরি করে ফেললি।

ফতিমা - তুমি? এই দুপুর রোদে কি করবে এখানে?

লখাই - আমি? আমি দেখি, ওবলা তো এই হাড়কাঠেই গলা দিতি হবে, হাড়কাঠটারে আঝ বেলা ধরি পোদোক্ষিণ করি, আগাম পোনাম লিবেদন করে রাখি, তুই ঝা...তুই ঝা...

ফতিমা - (ম্লান হেসে) ভাইজান তোমারে একটা অনুরোধ করে যাই, আজকের সভায় তোমার হাতে বাঁশিই থাকবে নাকি হাতে হাঁসুয়া তুলে নেবে সেটা নিজের মর্জিতেই স্থির কর। সভায় বসে অন্যের ভুজুংভাজুং-এ গোলমাল করে ফেলো না। আসি, তোমার জন্যে বোনের শুভেচ্ছা রইল, তোমার জয় হোক। (প্রস্থান)

লখাই - জয়! আমোর জয়! মানে সুন্দুরীর হার! না, না সে কি করি হয়? সবার ইচ্ছেহাওয়ায় বৈঠা মেরে মেরে মনের নাওকে ঝদি বা পারের কাছে আনলাম, বুইন তুই এক উলটা বাতাসে তারে আবার মাঝ দরিয়ায় ঠেলে দিলি! বুইন এ দরিয়ার মাঝে বড় তুফান রে বুইন, আমি যে একা... (ভেঙে পড়ে)

(নেপথ্যে বেজে ওঠে গানের সুরঃ দরিয়ায় আইল তুফান...। ধীরে আলো নিভে দৃশ্যান্তর ঘটায়। পুরনো দৃশ্যপটে নতুন আঙ্গিক, মঞ্চ জুড়ে শুরু সালিশি সভা। সালিশি শুরু হয়ে গেছে প্রায়)

সুদর্শন - বিকেল বেলাতেই সাঁঝের আঁধার লেমে পড়বে পোধান সাহেব, সভা শেষ পয্যন্ত চললি হয়।

প্রধান - হ্যাঁ, আশমান বড় মুখ ভার করি রইছে। আর এজন্যেই বোদহয় সভার শরীল এত পাতলা। কাইলকার মত আঝও কালবোশেখি এসি পড়তি পারে ভেবে মানুষঝন সব ঘরে সেঁধয়েছে। যাইহোক আমোদের আর বিলম্ব করা উচিৎ লয়। মাস্টারবাবু আঝ আমোদের মদ্যি এসে পড়েছেন। সভার মদ্যি উনিই এ গাঁয়ের সবচেয়ে বয়স্ক এবং জ্ঞানী-গুণী-মান্যি লোক। তাই ওনার উপরেই আঝ সভা চালানোর দায়িত্ব অপ্পন করা হোক; কি বল তোমরা?

পানু - হ্যাঁ হ্যাঁ মাস্টারবাবুই আঝকের সভার সভাপতি হলেন। কি এতে মত কর তো সবাই?

সুদর্শন - বেশ বেশ ব্যস, তালি মাস্টারবাবু নিন, শুরু করে দিন। বোবা আকাশ থেনে একনও ঝেটুকু আলো আসতিছে এরপর তাও বোদহয় থাকবেনি।

মাস্টার - (গলা ঝাড়া দিয়ে) মাননীয় অঞ্চলপ্রধান জনাব আব্দুর রউফ সাহেব, মাননীয় পঞ্চায়েত সদস্য সুদর্শন নস্কর মশাইকে আমার অভিনন্দন এবং গাঁয়ের সকল মানুষজনকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের সালিশি সভা। গাছের ফাঁক দিয়ে পাতার আড়াল ডিঙিয়ে আমাদের সভাস্থলে যে একটি মনোরম সুন্দর আলো এসে পড়েছে আপনারা দেখছেন, সে আলোটির একটি সুন্দর নাম আছে- কনে দেখা আলো।

সুদর্শন - কি বুললেন? কি আলো?

মাস্টার - কনে দেখা আলো।

সুদর্শন - বাঃ বাঃ বেশ নাম; বেশ আলো।

মাস্টার - এই আলোর সঙ্গে একটাই সুর মানায়, তা হল সানাইয়ের সুর; কিন্তু আজ যে আর্জি নিয়ে আমরা সালিশি করতে বসেছি সেখানে ভাঙা নহবতের বেহালাই হয়ত শুনতে পাওয়া যাবে, তবু যা অবশ্যম্ভাবী তাকে তো আমাদের মানতেই হবে।

প্রধান - মাস্টারবাবু আমনার এই মিঠেকড়া ভাষণ গাঁ ঘরের মানুষঝন অত মগজে নিতে পারবেনি, আমনি একটু সরল সোজা করি বলেন সব। আর দু'পক্ষই ঝখন হাজির হয়ে পড়েছে আমনি বিষয় নিয়ে কতা শুরু করেন।

মাস্টার - হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সেই আলোচনাতেই আসছি প্রধান সাহেব।

প্রধান - (নিচু স্বরে) হ্যাঁ, তাই এসে পড়েন, এট্টু তাড়াতাড়ি পা চালান...

পালান - আকাশের অবস্তা কিন্তু কোমশই খারাবের দিকে যাচ্চে।

মাস্টার - (আবেগতাড়িত উঁচু গলায়) ভাইসব, আপনারা জানেন যে সুন্দরী মণ্ডল, যে একসময় এ গ্রামের বধূ ছিল- ছিল কেন সে তো এখনও তো আইনত এবং ধর্মত এ গ্রামেরই সন্তান লখাই মণ্ডলের স্ত্রী। সে একখানা আর্জি জানিয়ে এই সভার কাছে সালিশি চেয়েছে। আর্জিতে সে বলেছে যে সে আর লখাই-এর স্ত্রী হয়ে তার ঘর করতে চায় না। এবং তার এই আবেদনে লখাই মণ্ডলের সম্মতি আদায় করে দিতেই আর্জিটি জানিয়েছে।

আসরফ - সুন্দুরীর এই আজ্জি তো এই পরথম লয়, এর আগেও সুন্দুরী এই একই আজ্জি...

মাস্টার - হ্যাঁ সুন্দুরীর এই একই আর্জি নিয়ে আগেও একবার সালিশি সভা বসেছিল কিন্তু সুরাহা সেবার কিছু হয়নি, ফলে সে এবার আবার আবেদন করেছে।

পানু - কিন্তু সেবার কি ঘটেছিল যদি ম্যাস্টরবাবু একবার এই সভাকে মনে কইরে দ্যান তো সভার সবাই সবটা বুঝতে পারে, মতামত দেওয়াটা সবার পক্ষে সহজ হয়।

মাস্টার - কি ঘটেছিল তার বিশদ বিবরণ আমার জানা নেই কারন সে সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম না। তবে মোদ্দা ব্যাপার হল লখাই, সুন্দরীর আবেদন মঞ্জুরে অসম্মতি জানিয়ে না বলেছিল।

পানু - তা ধম্মসিদ্ধ, আইন মোতাবেক সোয়ামি ইস্তিরির আবেদনে কেন ‘না’ বলেছিল, সেটা জানাও কিন্তু বিশেষ জরুরি ম্যাস্টারবাবু।

মাস্টার - হ্যাঁ মানছি তা জরুরি, কিন্তু আমি তো সে সভায়- (গলা ঝেড়ে) ইয়ে প্রধান সাহেব এখানে আপনাকে তো হাল ধরতে হয়।

পালান - পোধান সায়েব আছেন, মেম্বর সুদশ্যনদা আছেন, গেল সালিশিতেও ওনারাই মাতব্বর ছিলেন, ওনারাই কিছু বলুন...

প্রধান - বেশ আমরা অস্বীকের যাচ্ছি না যে সালিশিতে বসে আগের সালিশির বেত্তান্ত ঝানাটা জরুরি; ঠিক আচে শোদ্দেয় পঞ্চায়ত মেম্বর সুদশ্যনবাবুই আমনাদের শোনাচ্চেন গেল সালিশিতে কি হয়েছিল, কি ঘটেছিল সেসব বেত্তান্ত।

সুদর্শন - (গলা ঝেড়ে) মানে... গত সালিশি তো বসেছিল... হ্যাঁ, তো পেরায় ছয়-সাত মাস আগে, না কি পোধান সায়েব?

প্রধান - হ্যাঁ তা তো হবেই – সেটা ছিল বোদহয় আমন তোলার সময়, হুঁ ছ’ সাত মাস তো হবেই।

সুদর্শন - ধরুন ওই রকম সময়ই হবে, তো সেবার সভার মদ্যে ডাঁয়রে সুন্দুরী বলল ঝে সে আর সোয়ামীর ঘর করবেনি, ছাড়ান চায়। আমরা তকন লখাইরে তার মতটা ঝানাতে বললাম। লখাই তকন সভার কাচে এট্টা অত্যন্ত জরুরি পোশ্ন উথ্থাপন করিছিল লিজের মত ঝানানোর আগে।

আসরফ - তো সেই পোশ্নটা কি? আচ্ছা তারও আগে বলুন তো সুন্দুরী ঝে গেল সভায় লখাইয়ের থেনে ছাড়ানের আজ্জি জাইনে ছিল সে সময়ে কি সুন্দুরী লখাইয়ের ঘর করতিছিল?

সুদর্শন - না, না একেবারেই না, সুন্দুরী তার আগেই বাবুলালের হাত ধরি চলি গেছিল গাঁ ছাড়ি।

পানু - তো সোয়ামী থাকতি পরপুরুষের সন্নে ভেগে ঝাওয়াটা কি মানুষের ধম্মের মদ্যি পড়ে, না অধম্ম হয়? কি পোধান সায়েব আমনি কি বলেন?

প্রধান - (অস্ফুটে) তওবা তওবা।

পানু - আর এটি ঝদি অধম্মই মানেন তবে তার জন্যি কিচু শাস্তি কি সুন্দুরী পেইছিল সে সভায়?

পালান - কি বলুন আমরা ঝানতে চাই।

প্রধান - বে-তালাক অওরতের এরম কাঝ বিলকুল গুনাহ, স্রেফ না-পাক, একদম বদতমিজি। শরিয়তি বিধানে এরম অওরতকে কঠোর শাস্তি দেবার বিধান আছে আমাদের হাদিসে। কিন্তু পানুভাই সে আইন তো এখানে লাগু হতে পারেনি।

পানু - কেন? পারে না কেন? সুন্দুরী মুসলমান নয় বলে? আইন লাগু না হোক, শাস্তিটা দিতে কি দোষ কি ছিল সে সভায়?

পালান - আর পোধান সায়েব আমাদের গাঁয়ে তো কোন সামাজিক সমস্যা ঘটলে হিন্দু-মোল্লারে কুন ভেদদিষ্টিতে দেকা হয় নে। সমাজের পক্ষে যেটি খারাব সেটি খারাবই;

হিন্দু বা মিঁঞা পরিবারের যে কেউই সেই খারাব কাঝ করুক, পাপের শাস্তি তার পাওনা।

আসরফ - হক কতা।

সুদর্শন - পানু, পালান, আসরফ তোমরা ঠিকই বলেছ পাপ পাপই। অপরাধ সে যেই করুক সেটা অপরাধই। এর মদ্যি হিন্দু মুসলমানে তো কুনো ভেদ নেই, অন্তত এ গাঁয়ে তো নেই-ই।

পানু - তবু সেদিন অপরাধী জেনেও সবাই চুপ করি ছিলেন, শাস্তি বিধেন হল নি কেন?

সুদর্শন - কেন? (গলা ঝেড়ে) পোথমত সেদিন সালিশি বসেছিল সুন্দুরীরই আবেদন মতো, তারই আজ্জি মত। সুন্দুরীর ধম্ম অধম্ম নিয়ে তো সে সভায় তকন কেউ কুনো পোশ্ন তোলেনে, আর সুন্দুরীর সোয়ামী লখাইও চায়নে তার ইস্তিরির কুনো শাস্তি হোক।

পানু - হুঁ, ইস্তিরি।

সুদর্শন - সে তোমরা কেউ মানো না মানো সুন্দুরী একনও লখাই মণ্ডলের ধম্মবউ।

আসরফ - আচ্ছা বোঝা গেল ধম্ম অধম্ম বিষয়টা। একন বল দিনি সেদিনের সভায় লখাই ঝে গুরুত্বপূর্ণ পোশ্নটি উত্থাপন করিছিল সেটি কি?

সুদর্শন - হ্যাঁ, সে কথাতেই এসি পড়ছি, পোধান সায়েব এখেনে আমনি কিছু বলবেন?

প্রধান - আমি শুদু সবায়রে বলব শান্ত থাকতি। আর বলব কোন হটকারী সিদ্ধান্ত নেয়ে গাঁয়ের মানমর্য্যাদা লস্ট করবেন নি। আর আমনারে বলব ঝা বলতি নেগেচেন তাড়াতাড়ি বলে ফ্যালান নইলে আসমান কিন্তু হার্মাদি হানা হানবে যে কুনো সময়।

সুদর্শন - হ্যাঁ হ্যাঁ আকাশের কোমশই... বন্ধুগণ (গলা ঝেড়ে) গেলবারে সুন্দুরী যখন সভায় ডাঁয়রে তার আজ্জি ঝানায়, সোয়ামির থেনে ছাড়ান পেতি চায় সে ছিল তখন গভ্ভবতী, পোয়াতি।

পালান - অ্যাঁ?

পানু - হ্যাঁ পাঁচমাসের পোয়াতি।

পানু - ও খচড়ি মেয়েছেলেটা এক্কেরে সন্যেসী চরিত্তের রে, সোমসার ত্যাগ করি বনবাসী হতি ছাড়ানের আজ্জি জাইনেছিল, শুদু লখাইয়ের অনুমতির এট্টা শিলমোর দরকার ছিল ওর।

আসরফ - হ্যাঁ, আর ওর বনবাসের সঙ্গী? দোসর? পীর-পয়গম্বর ছিমান বাবুলাল।

[সভার মাঝে হালকা হাসির রোল]

প্রধান - আঃ একন হাসি মশকরার সময় লয়, আমোদের কাঝ করতি দিন। নিন নিন আমনি শুরু করুন, লখাই কি পোশ্নটি করিছিল তার উল্লেখ করেন।

সুদর্শন - হ্যাঁ এই করি... লখাই সিদিন ঠিকঠাক বলতি গেলি এট্টা নয়, পোশ্ন করেছিল দুটি। পোথমটি করিছিল সুন্দুরীকে, দ্বিতীয়টি সভাকে। সুন্দুরীর কাছে তার পোশ্ন ছিল - আচ্ছা লখাই তোর মনে আছে সিদিন তুই সুন্দুরীরে কি জিগিয়েছিলি?

লখাই - মনে আছে গো সুদ্যশনদা, আমোর সবটাই মনে আছে। পোশ্ন-উত্তর সবটাই; কিন্তু কি হবে একন সেসব পোশ্ন-উত্তরে মিছিমিছি? ওসব ছাড়ান দাও তোমরা।

মাস্টার - লখাই আমরা বুঝি তোমার কষ্ট, পুরনো ক্ষতে নতুন করে আঁচড় পড়লে ক্ষতস্থান টাটিয়ে উঠবেই, তবে বাবা এসব একেবারে মিছিমিছি নয়, তুমি বল।

প্রধান - তোমার যখন মনে আচে, পোশ্নটা আর একবার করলি ক্ষতি কি?

- আকাশে মেঘের গর্জন -

লখাই - আমারে ছেড়ি ঝাবার সাত মাস পর এই গাছতলায় সিদিন সালিশি বসিছে। এতদিন ঝা আমি জানতে পারি নাই, সিদিন সভায় ডাঁয়ড়ে সবটাই বুইতে পারলম। ওরে লতুন করে দেকলম। দেকলম সুন্দুরীর শরীর লতায় সুখের ফুল ধরিচে, কিন্তু ওর বুকে প্যাটে তো লেখা ছিলনি মাস অংকের হিসিব। তাই আমি শুদোলম – সুন্দুরী তোর পেটে যে এয়েচে, তার বাপ কে রে?

সুন্দরী - (এতক্ষণ বাবুলালের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে পান চিবচ্ছিল, এখন পিক ফেলে উঠে দাঁড়ায়) আহা, মিনসে! আমি তো তোরে তকুনই বললাম – এর বাপ বাবুলাল, তুই নোস...

(আকাশে গুরুগুরু মেঘের ডাক, গ্রামবাসীর উত্তেজক সোরগোল, এসব ছাপিয়ে প্রধানের গলা)

প্রধান - এই এই থামো সব, থামো থামো, সভার কাঝ এগোতি দাও, (নিচু স্বরে) বেশরম জিনপরী! নিন আমনি এগোন। (কেটে কেটে স্বগতোক্তি) তোর চেয়ে আসমানেরও শরম জ্ঞান বেশি রে ছেমড়ি, ম্যাঘের ফরদায় মুখ ঢেকিছে। নিন পুরনো কথাতেই ঝদি এতডি সময় চলি যায়, আঝকের সভা শেষ হবে কখন?

সুদর্শন - আমনারা লখাইয়ের পোশ্ন আর সুন্দুরীর উত্তর তাদের মুখেই শুনলেন। এরপর আর কি বলার থাকতি পারে? কিন্তু না লখাই সুন্দুরীর সে বিষও হজম করি নিল, অতবড় এট্টা আঘাতেও সোয়ামী বিচলিত হলনি তেমন বড়; সভার সামনে সে তখন তার দ্বিতীয় পোশ্নটি করে বসল। পোধান সায়েব আমনার মনে আছে লখাইয়ের সে পোশ্নটি?

প্রধান - আঃ আমনি মিছামিছি সব লেট কইরে দিচ্চেন সুদ্যশনবাবু, বাসি পোশ্ন-উত্তরের পালাটি তাড়াতাড়ি সেরে ফেলে মিটিনটারে পেছন থে সামনে টেনে আনেন দিকি...

পালান - পোধান সায়েব বেশি তাড়াহুড়ো কল্লি কাজির বিচের অনেক সময় পাজির বিচের হয়ে দাঁড়ায়, সেটা কিন্তু গাঁয়ের মানুষ মেনে নেবে নি।

প্রধান - কে বললেন ভাই কতাটি?

পালান - আমি, পালান।

প্রধান - ওঃ একান্ন লম্বর মৌজার তেষট্টি দাগের পালান নাইয়া! কিন্তু ভাই এত বেশি বাসি কতা চালালি তো আঝকের আসর সালিশিটাই কালে পড়ে বাসি হয়ে ঝাবে, যে কুনো সময় বিষ্টি এসি পড়তি পারে...

আসরফ - এলি আইসবে, কিন্তু সবারে সবটা পোষ্কার ঝানানোটা তো জরুরি

প্রধান - বেশ, আমনারা যকন সকলেই চাইছেন আমি তো তার বিরুদ্দে যেতে পারবুনি; লখাইরে বলুন সভার কাছে সেদিনের পোশ্নটি উল্লেক করতে, আমি ঝে উত্তর সেদিন দিছিলম, না হয় আর একবার সেটি শুনাবো।

পানু - (লখাইকে গুঁতো মেরে) লখাই... আরে কুথা তুই...

সুদর্শন - দাঁড়া দাঁড়া, লখাই সেদিন যখন সুন্দুরী বলল ঝে ওর বাচ্চাটির বাপ তুই নোস, বাবুলাল; তকন তুই সবার কাচে, মানে পোধান সায়েবকে একটা পোশ্ন করিছিলি, পোশ্নটি মনে আছে তোর?

লখাই - আছে, পোশ্ন, উত্তর সবই মনে আছে, কিন্তু সব চুকেবুকে ঝাবার কালে সে পোশ্ন আর লতুন করি...

সুদর্শন - লখাই!

লখাই - মশাইঝন, সুন্দুরী তো বলে দিল ওর গব্ভের সন্তানটির বাপ আমি লই, কিন্তু আমি তো ওরে আঝও ছাড়ান দিই লাই; তবে ইস্তিরির গব্ভে যে সন্তানটি রইছে সোয়ামী ছাড়া কে তার বাপ হবার হক পায়?

প্রধান - অ্যায় সন্নে সন্নে এ পোশ্নের উত্তরে আমার রায়টিও ঝানয়ে দিলম- ইস্তিরির গব্ভের বাচ্চার পিত্তিত্ব সোয়ামীরই অধিকারে পড়ে। লখাই যকন একনও ধম্মত সুন্দুরীর সোয়ামী, তখন এই পিত্তিত্বে একমাত্র লখাইয়ের অধিকার

মাস্টার - হা ঈশ্বর! এটা অধিকার! স্ত্রীর গর্ভস্থ গরলকে যে অমৃতজ্ঞানে অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করে সে কি শুধুই মানুষ? মানুষের মনে তুমি এত প্রেম দিলে কেন ভগবান? শুধু তাকে কষ্ট দিতে?

প্রধান - মাস্টারবাবু একনই আবেগে ভাসলি কিন্তু বিচেরের নাওটি মাঝদরিয়ায় ডুবে যাবে, ইস্থির থাকুন।

আসরফ - এরপর কি হল?

সুদর্শন - তারপর আর কি হতি পারে?

লখাই - এরপরই তো আমি বলে দিলম সভারে – যে বাপের মর্য্যাদা, ওধকার, হক আমি একনই ছাড়তে পারবুনি, আ- আমারে সময় দিতি হবে, আমোরে ভাবতি হবে, ওর আজ্জির মুয়ে নাথি মেরে সিদিন আমি 'না' বলে দিছিলম।

সুদর্শন - ব্যস, সিদিনের মত সভা সেকানেই খতম।

সুন্দুরী - কিন্তু সময় তো অনেক চলি গেল, তোমার দেকা-ভাবা এখনও শেষ হলনি অসের ভাঁড় হি হি হি...

লখাই - সুন্দুরী তুই আমায় এতডা অপছেদ্দা করিস কেন রে? মানছি তুই আমোর কাচে... মানে আম্যু তোরে সুক, যতন দিতি পারি নাই, তা বলে আমোর এতটুকুন সুকের ক্ষেতে বাজ মারিস কেন সুন্দুরী? বাপের হক মর্য্যাদাটুকুন কেন কেড়ে নিতি চাস তুই? আমোরে এট্টুখানি দয়া কর, ছাড়ান নিসনি আমার থে, অন্তত আমোরে তাকি বাপ বলতি...

সুন্দরী - কি?!

লখাই - (বেশ তেজের সাথে) সুন্দুরী আমি তোর সোয়ামী, তোর বাচ্চার বাপ আমি, ধম্মবাপ হলিও বাপ।

সুন্দরী - বাপ! হুঁ! ধম্মবাপ হতি গেলেও কপালের আর ধম্মের জোর নাগে গো ধম্মবাপ; শিউলির পো, তুমি যারে আমোর শরীলের মদ্যি উঁকি মারতে দেকে বাপ হবার সপনে বেভোর ছিলে সে তিনি জন্মান নাই গো।

লখাই - কি! কি বলছিস তুই সুন্দুরী।

সুন্দরী - জম্মান নাই। জম্মান নাই বলাটা ভুল, জম্মেছিলেন, তবে মরা জম্মেছিলেন। পেটের মদ্যিই মরে গে পিথিবীতে এয়ে পড়েছিলেন শুদু এখেনের মাটি পাবার ঝন্যি। পিথিবীর বাতাসে শ্বাস নিতে মন ছিলনি তার, মাটির উপর বুঝি খুব নোভ।

বাবুলাল - এ সুন্দারী, জাদা বকওয়াস লাগাচ্ছিস কেন?

লখাই - আঃ এ কতাটা তুই আমোরে আরও আগে বলিস নাই কেনে সুন্দুরী?

সুন্দরী - বললে কি করতে মরা ছাওয়ালের ধম্মবাপ? কানতে? শাদ্য শান্তি করতে?

লখাই - আঃ চুপ ঝা, চুপ ঝা তুই...

- আবহে বৃষ্টির আভাস -

প্রধান - মাস্টারবাবু পানির ফোঁটা গায়ে পড়ল?

মাস্টার - হ্যাঁ প্রধান সাহেব, আমাদের আকাশ মায়ের চোখের জল

প্রধান - মিটিন তো আমোদেরও এবার শেষ করতি হয়, লখাই-

লখাই - পোধান সায়েব আমোরে আর এট্টু ভাবতে সময় দেন

পালান - আবার সময়?

লখাই - গাছের পাখি তো দিন ফুরলি গাছেই ফিরে আসে পালানদা, আমোরে তুমরা আর এট্টু পতিক্ষে করতি দাও।

আসরফ - ওর কাছে তুই কি আশা করিস রে?

লখাই - আসরফ ভাই বাবুলাল কেমনতারা লোক আমি তো ঠিক মত তার হদিস ঝানিনে, ও যদি কুনোদিন ওরে খেদয়ে...

আসরফ - তুই ওর ভালমন্দ নে এত ভাবতি যাচ্চিস কেন রে অ্যাঁ? ওর ভালমন্দ নে ভাববার তুই কে?

(কথার মধ্যেই বৃষ্টি এসে পড়ে, বিদ্যুতের এক জোরালো ঝলক দেখা যায়)

লখাই - (চেঁচিয়ে উঠে) সুন্দুরী কানে চাপা দে, এখুনি বাঝ পড়বে... ভয় নাই...

পানু - আঃ লখাই তুই এখনও...

লখাই - পানু পানু সুন্দুরী বাঝের আবাজে ভয় পায় রে! (আবার বিদ্যুতের চমক) সুন্দুরী!

(জোরালো শব্দে বাজ পড়ে, সে আওয়াজে লখাইয়ের 'সুন্দুরী' ডাক শোনা যায় না, সুন্দরী ভয়ে বাবুলালের বুকে মুখ গোঁজে। সে দৃশ্য দেখতে পেয়ে লখাই ডুকরে কেঁদে উঠে কান্না ভেজা গলায় বলে)

লখাই - আমি রাজি, আমি রাজি পোধান সায়েব আমি রাজি, আমি ছাড়ান দেলম সুন্দুরীরে, আমনি এবের রায় দেন...

(লখাই কান্নায় ভেঙে পড়ে, ২-১ মুহূর্তের জন্য আর সমস্ত শব্দ থেমে যায়, ফতিমার স্বর নেপথ্য থেকে ভেসে আসে "আর সকলকে খুশি করতে তোমার ভালবাসাকে ঠকাবে তুমি? সুতোটুকু ছিঁড়ে দিয়ে অপমান করবে তাকে?" লখাইয়ের ফোঁপানি আরও বেড়ে যায়, সভার জনতা খুশিতে ফেটে পড়ে। সুন্দরী দু'চোখে গভীর বিস্ময় আর এক অব্যক্ত ব্যথা নিয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে লখাইয়ের মুখের দিকে। বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে।)

প্রধান - (গলা ঝাড়া দিয়ে) তাহলে আমনারা শোনলেন লখাই মণ্ডলের কতা; সে তার পরিবার সুন্দুরীরে ছাড়ান দেল এবং সালিশিতে এই রায় সাব্যস্ত হল ঝে সুন্দুরী মণ্ডলের সন্নে তার সোয়ামী লখাইয়ের সব সম্পর্ক ছিন্ন হল। এখন আর দোজনের কেউ কারও স্বাদীনতায় হাত দিতে পারবেনি। (কয়েকজন হাততালি দেয়) ব্যস মিটিন আঝকের মত একেনেই সমাপ্ত হল। এঃ বাজ-বাদলে আজ একেবারে পোলয় লামিয়ে ছারবে, মাস্টারবাবু চলেন ঝাই... আসেন... (প্রস্থান)

মাস্টার - (কাছে এসে, সস্নেহে লখাইয়ের মাথায় হাত রেখে) লখাই, যিনি তোর প্রাণে এত প্রেম দিয়েছেন তাঁর কাছেই তোর হয়ে প্রার্থনা জানাই- আজকের এই বৃষ্টিধারায় তোর জীবনের সব দুঃস্বপ্নগুলি ধুয়ে মুছে যাক তোর দু'চোখ থেকে। (প্রস্থান)

বাবুলাল - চল সুন্দারী, আজ সে তু হামার হলি, স্রিফ হামার। দুলহানিয়া তু আগে বাড়, হামি আসছি।

(খুশি-নেভা সুন্দরী তার ব্যথা-বিস্ময়-অভিমানে ভরা দুই চোখ তুলে একবার তাকায় হেরে যাওয়া লখাইয়ের দিকে। তারপর অনিচ্ছুক পা-দুটো টানতে টানতে চলে যায় অঙ্গন সীমানার বাইরে। পানু, পালান, আসরফ মিলে একটা জোন-এ দাঁড়িয়ে নিরুচ্চারে শলা পরামর্শ করছিল, এখন তা ভেঙে এসে দাঁড়ায় লখাইয়ের সামনে)

আসরফ - লখাই, চল যাই।

বাবুলাল - শালা বেওকুফ, আপ্পন জেনানাকে বাঁধতে পারলি নাই...

লখাই - না, আমি পারলুম নি রে বাবুলাল, তুই ওকে সুখী করিস।

বাবুলাল - হুঁ হুঁ হামি ওকে সুখ দিব, সোহাগ দিব, খুব দিব; রে বুরবক কাঁহিকা, তু সমঝনে নেই পায়া সুন্দারীর সুখটো মিলবে কিসসে।

লখাই - আমি আজ ইস্তক কুনো হদিস পেলুমনি রে বাবুলাল...

বাবুলাল - তু এক লম্বর বুরবক আছিস। হামি তুয়ার পাশ যেতম তাড়ি বানাবার কাঁচামাল কিনতে, লেকিন ও ছোটা ছোটা ভাঁড়ে হামার ন দিল ভরে ন জেব ভরে। হাঁ এই বাতটো সহি আছে কি হামার ঘোরে একঠো বহু আছে, জেবমে পয়সা ভি আছে। লেকিন দিলঠো হামার উয়ো বতক্ কা মাফিক হরওয়াক্ত পেঁক পেঁক করে। বিলকুল, উ কি বোলে হুঁ শুনশান লাগে। তো একদিন তুয়ার কোঠিতে দিল ভরা ভান্ডারটোর খোঁজ মিলে গেল তো ব্যস ডাকাতি করে দিলম, জেনানা বনকে হামার দিল ভরিয়ে দিল মেরা নয়া দুলহনিয়া সুন্দারী, হাঁ এ ভি সহি বাত কি অওর কুছুদিন বাদ সুন্দারী অওরত বনকে হামার জেব ভি ভোরাবে – ঝন্ ঝনা ঝন্, ঝন্ ঝনা ঝন্...

লখাই - বাবুলাল!

বাবুলাল - হাঁ, কি হল? তেরা দিল মে চোট লাগা ক্যা? হাঃ হাঃ রে মূর্খ, হামি তো কারবারি আছি রে বেওকুফ, আভি নেহি, আভি ভি কুছ দেনেওয়ালি হ্যায় সুন্দারী, লেকিন উসকে বাদ হামি উকে শোহরে লিয়ে যিব, ছোকড়িগলিতে মৌসির কোঠিতে সুন্দারীর বাকি জওয়ানি হামি ছুপিয়ে রাখব, দো হাতে দানা খিলাব অউর ও দশ হাত ঘুমতে ঘুমতে বিশ হাতে হামার জেব ভরাবে – ঝন্ ঝনা ঝন্, ঝন্ ঝনা ঝন্!

লখাই - (কঠিন গলায়) তুই শহরে নিয়ে সুন্দুরীকে বেচে দিবি?

বাবুলাল - আরে নাই নাই, বেচে দিব কাহে? সোনে কা ডিম দেনেওয়ালি হনস, বেচে দিব কাহে? খিলাব, পিলাব অউর হাঃ হাঃ ঝন্ ঝনা ঝন্...

আসরফ - তাড়িখোর তোর ইমান বলতে কিছু নাই?

বাবুলাল - আরে ছোঃ ! ইমান রাকলে কারবারের ধরমঠো বাঁচে নাই। অউর ইসি লিয়ে তো হমার কানে – এক হি গানা বাজে হরওয়াক্ত ঝন্ ঝনা ঝন্, ঝন...

লখাই - শালা কুত্তা, হারামি!

(কেউ কিছু বোঝার আগেই বেদিতলা থেকে হাঁসুয়া বের করে এনে টেনে দেয় বাবুলালের ঘাড়ে। কাটা কলাগাছের মত বাবুলালের ধড়খানা আছড়ে পড়ে চন্ডিতলার মাটিতে। চিৎকার ক'রে উঠে পানু, পালান, সভায় উপস্থিত অন্যান্যরা এসে ঘিরে দাঁড়ায় বাবুলালের শরীরটাকে। মাঝ মঞ্চে নিথর শূন্য দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে একা লখাই। হাতে তার রক্তাক্ত হাঁসুয়া। হাঁসুয়াটা হাত থেকে খসে পড়ে। স্তব্ধতা ভেঙে আবহ বাদ্যয় হয়ে ওঠে পাখোয়াজ বা অন্য কোনও যন্ত্রসংগীতের মুর্ছনায়। মঞ্চের আলো মিলিয়ে গিয়ে নতুন আলোয় দৃশ্যান্তর ঘটে।)

ইরফান - (ব্যগ্র স্বরে) আর সুন্দরী? তার কি হল?

ফতিমা - সুন্দরী! সুন্দরীর কী পরিণতি হল, তাই না? আসলে জানো, সেদিন আমি ভুল বলেছিলাম, প্রকৃত ভালবাসার একটা বিনিময়তা থেকেই যায়; হয়ত খুব সূক্ষ্মভাবে যা চোখে ধরা যায় না সব সময়, তবু থাকে। এদের মধ্যেও ছিল সেই বিনিময়। সুন্দরীর ভালবাসাটা আমি ধরতে পারিনি তখন...

ইরফান - (অবিশ্বাস নিয়ে) সুন্দরী ভালবাসত? কাকে? লখাইকে?

ফতিমা - হ্যাঁ। তা না হলে সুন্দরী কেন বারবার সালিশির বাহানায় এ গ্রামে আসত? ও তো কোনও কিছুকে পরোয়া না করেই ছেড়ে গিয়েছিল ভাইজানকে, ছেড়ে দিয়েছিল এই গ্রাম; আসলে ও ভাইজানকে দেখতে চাইত, দেখতে আসত। ভাইজানের ছাড় না

দেওয়াটা সুন্দরী উপভোগ করত, ভাল লাগত তার। সুন্দরীর ভালবাসা এরকমই, যা লখাই ভাইজানের থেকে আলাদা।

ইরফান - হুঁ, কিসের থেকে যে তুমি সুন্দরীর ভালবাসার গন্ধ পেলে!

ফতিমা - না হলে, সেদিন যখন ভাইজান ওকে তালাক দিল, মানে সুন্দরীর ছাড়ান পাওয়ার আর্জিতে সম্মতি জানালো সুন্দরীর দু'চোখে এত বিস্ময় এল কোথা থেকে? বেদনার বলিরেখাগুলো ওর মুখে অত গভীর করে জেগে উঠলো কেমন করে? ভাইজানের সম্মতি পেয়ে সেদিন তার জিত হয়নি ইরফান, হয়েছে চরম হার, আর তারই প্রকাশ তার চোখের বিস্ময়ে, মুখের ওপর জেগে ওঠা বেদনার বলিরেখায়।

ইরফান - তবু, তবু ওর এক ভয়ানক পরিণতিই উপযুক্ত হত।

ফতিমা - তাই তো হয়েছে।

ইরফান - কি হয়েছে?

ফতিমা - বাবুলাল খুন হওয়ার পর সেদিন অনেকের সাথে সুন্দরীও ফিরে এল এই চন্ডিতলায়। ও বাবুলালের জন্যে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল তাই ফিরতে দেরি হল ওর। কিন্তু খবর পেয়ে ছুটে এল সুন্দরী, আর এসেই এক বুক কান্না নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।

ইরফান - কোথায়? গলাকাটা বাবুলালের বুকে?

ফতিমা - নাঃ নিথর নিস্তব্ধ এক পাথরের বুকে।

ইরফান - মানে?

ফতিমা - মানে? ওই আসছে সুন্দরী, মানেটা বুঝে নাও-

(দেখা যায় যৌবনের অকাল অবসানে বিধ্বস্ত পাষাণবৎ সুন্দরী। এক হাতের বেড়ে জ্বালানিপাতার এক বিশাল বোঝা আরেক হাতে শক্ত করে ধরে ধরা পাগল সদৃশ লখাইকে নিয়ে চন্ডিতলা পেরিয়ে যাচ্ছে ধীর শ্রান্ত পদক্ষেপে। ফতিমা আর ইরফান এক পাশে দাঁড়িয়ে ওদের পথ পেরনো দেখে, দু'জন দু'জনের দিকে তাকায়, দু'জনেই নির্বাক। একটু দূরে রিক্সার হর্ন।)

ইরফান - এই রিক্সা! এই দাঁড়াও... ফতিমা রিক্সাটা দাঁড়িয়েছে, চল...

ফতিমা - (ম্লান হেসে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে) হ্যাঁ এবার চল।

- দু'জনে মাইমে হাঁটা শুরু করে, পর্দা পড়ে -

দিনপঞ্জি

শতরূপা ব্যানার্জি

চেনা ক্লাসরুম, চেনা চেনা কত মুখ
আবছা আলোয় অচেনা সবকিছু
হাতড়ে বেড়ায় সেই দিনকার সুখ
ঘুরছি কেবল স্বপ্নের পিছু পিছু।

দিনের আলোয় আগামীর খুঁজি পথ
রাতের আঁধারে জলে ভেজা দুই চোখ
ফেলে আসা দিন আগামীর সম্পদ
আশা একদিন জীবনের ভোর হোক।

আমার কবিতা আমার মতই চুপ
না বলার কথারা লেখার খাতায় জড়ো
আকাশের আজ অন্যরকম মুখ
একলা থাকার ইচ্ছে হয়েছে তারও।

লিখছি কেবল পাতার পর পাতা
আবোল তাবোল নেই কোনো তার মানে
লিখব ভাবছি রাত-পরীটার কথা
মনের কথা আর বুঝি কেউ জানে?

হারায় এভাবে গল্পগুলো সব
কবিতা ভাসে কাগজ নৌকায়
দিনের শেষে ক্লান্ত কলরব
চাঁদ উঁকি দেয় আমার দরজায়।

চলতে চলতে এইভাবে দিন শেষ,
নেই কথারাই লুকায় কথার ভিড়ে
কোথায় কথা আমার অভ্যেস
বিশ্বাস ঠিক এভাবেই ভাঙে গড়ে।

তোমায় দিয়ে দিনপঞ্জির শুরু
তোমায় দিয়েই হোক না এবার শেষ,
তুমি থাক যেমন খুশি পারো,
আমি আছি আমার মতন বেশ।

হৃদয়পুর

অয়ন চট্টোপাধ্যায়

হৃদয় নামের এক সে দ্বীপের
নাম শুনেছ? সেই যেখানে
অনেক অনেক পাখি ছিল, অনেক বড় বালুবেলায়
সকাল সন্ধ্যা খেলত রোদের ঝিকিমিকি
গভীর রাতে চাঁদের হাসিগান শোনাতো ,, ঘুম পাড়াতো
সেই যে সেই, রোজ সকালে সোনার টিয়া
গান গেয়ে সব জাগিয়ে দিত
সুরের মাঝেই চলতো সবাই, ফুটত মুখে সুখের রেখা।
কত কিছুই মেলত পাখা
সেই সে দ্বীপের সোনার তীরে,
স্বপ্ন খেলার খেলনা নিয়ে হারিয়ে যেত,
হারিয়ে যেত মেঘবালিকা বর্ষার মেঘ সঙ্গে নিয়ে।
রুমঝুম ওই বৃষ্টি নামত, ভেসে যেত জলের ধারায়,
হৃদয়পুরের প্রাণের ধারা উঠত হয়ে বাঁধনহারা
খেলত জলে নীল ডলফিন, গান গাইতো কাকাতুয়া
স্বপ্নরা সব বেরিয়ে এসে গড়ত ইটের ঘর বাড়ি,
ভেঁপু দিয়ে আসত গাড়ি
পার হত দিন পার হত রাত সময়টাকে দিয়ে ফাঁকি
সময় শেষে বুঝতে পেরে বলত করে দুহাত জোড়,
"হার মেনেছি, তোমরা বাপু সৃষ্টিছাড়া মানিক জোড়"।।
এসব অনেক দিনের কথা, এখন নেইকো হৃদয়পুর
মেঘবালিকার দেখা নেই, বৃষ্টিও তাই বিদায় নিল

সঙ্গে নিয়ে টিয়া, ময়না, গায়ক পাখি যত ছিল
খটখটে রোদ শুধুই এখন হৃদয়পুরকে পুড়িয়ে দেয়
মেঘ আসেনা, বৃষ্টি হয়না, হৃদয়পুরটা শুকিয়ে যায়
এখন তাই কেউ যায় না, হৃদয়পুরের সেই বাগানে
বাগান এখন জঙ্গল তাই, শ্বাপদের বাসা সেখানে।
অনেক অনেক দিনের জন্য হৃদয়পুরটা মরেই গেল
শুধু হয়ত কেউ এখনো মনে মনে, হৃদয়পুরকে বাঁচিয়ে রেখে
স্বপ্ন দেখে একদিন সে হৃদয়পুরে শেষ দেখাটা দেখতে যাবে।

আত্মজীবনী

সৈকত ঘোষ

অসাবধানে পা বাড়ালে শেষ বৃন্তে
কখন যেন ভাঙ্গন ধরে
ভাঙ্গনের অগ্র পশ্চাত বিচার বিবেচনা করলে
নিভৃতে গুম মেরে থাকা আকাশ আর
মিলনের আগে প্রজাপতির রং মিলান্তি
দেখতে পাই ...

খেলাঘর নতুন করে অলীক হয়ে যায়
মাঝে সূর্য, একপাশে সেতু অন্যপাশে কবিতা
অস্থিরতা হেঁটে যায়
পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে

দৃশ্যের অলিগলি মগজ ফাটিয়ে অসহ্য তাপ
কিছু ধ্রুবক, কিছু ভালত্ব, কিছু সরিয়ে রাখা বিকেল
পুড়ে যায়...

আমি যতই না বোঝার ভান করি
অনুতাপ নেমে আসে শূন্য থেকে

আমার চোখে ঘুম নেই ,আমার চোখে আগুন ...

এবারে বরং

নবকলম

এবারে বরং কলস হয়েই বাঁচ ,
পাহাড়ি নদীর জল তুলে নিস খানিক ,
সময় হলেই হবিখন তুই ঝিনুক ,
পেটেতে ধরিস চোখ ধাঁধানো মানিক ।

মানিক হঠাৎ জ্বললে জোনাক হয়ে
কৃষ্ণপক্ষে ইচ্ছেকে দিস পাখা ;
কাকভোরে ঠিক বালিশ হাতড়ে পাবি -
একটু সূর্য , স্বপ্ন - জ্যোৎস্না মাখা ...

শিবঠাকুরের আপন দেশে

উত্তরায়ণ সেনগুপ্ত

দূরে জোনাকির মত বিন্দু বিন্দু চিতা জ্বলছে। গোধূলির আলো ত্রিফলা আলোর মত ম্লান হয়ে এসেছে প্রায়। ঝিরি ঝিরি শ্রাবণের কুয়াশা পর্দায় দিশেহারা গরু বাছুরের দল, দিনের শেষ সাপারে তড়িঘড়ি ভিজে ন্যাতানো কাশফুলেদের সদগতি করতে ব্যস্ত। সামনের রাজপথে এলোমেলো কিছু গাড়ির যাওয়া আসা ছাড়া বাকি সব প্রয়োজনের থেকেও "মনমোহনিক" শান্ত। বোহেমিয়ান বাতাস কোন দূরের ঢাকের আওয়াজে কচিকাঁচার রিনিঝিনি পুরে, পৌঁছে দিচ্ছে কর্ণকুহরে। ঝিনচ্যাক সব পুজো-টুজো হচ্ছে। সারদারা ব্যাকফুটে চলে যাওয়ায় পুজোর বাজারে খানিক হাহুতাশ এয়েছিল বটেক; কিন্তু ক্লাবগুলো ব্যালেন্স মেরে সরকারি দাক্ষিণ্যে ফের ঠেক জমিয়ে নিয়েছে। চাদ্দিকে জম্পেশ আয়োজন। আলোকের এই ঝর্না ধারায় ধুইয়ে দাও। সিজনড ধর্ষকরা রাতজাগা আলোর আনুকূল্যে বেজায় ব্যাজার। তারা মনে করেন – সরকার বা পুজো কমিটি, কারোর ব্যাক্তিগত স্বাধীনতায় আলোকক্ষেপ করতে পারেন না। তা সে যে শেপেই হোক; ছিনতাই অথবা রেপ। ডলারের দাম বেড়েছে; মলে জামার কলারের দাম বেড়েছে, বাজারে ফলারের দাম বেড়েছে ; আর কুমোরটুলিতে প্রতিমার দাম কমেছে। সব মূর্তি ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার পরেও শিল্পীরা মাটি ফাটি মেখে অবসন্ন হয়ে ঝিমিয়ে রয়েছেন। শিক্ষিত আঁতেল বাবু বিবিরা কদিন মজেছিলেন গ্যারেথ বেল নিয়ে। রুপোর চাকতির সস্তা তুবড়ির মত ঘোর ওঠা নামা দেখে তারাই তারপর দোকানে দোকানে সেল খুঁজতে লাগলেন। প্রতি শনি রোববার ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত গুঁতিয়ে গাঁতিয়ে তুমুল মার্কেটিং করে পাব্লিক এখন শান্ত বাবুসোনা।

এই ক'টা দিন মস্তিষ্কপ্রিয় বাঙালিকে নতুন এনার্জি দেয়। তাই নতুন জামায় ঘেমে নেয়ে, নতুন জুতোর ফোস্কা পায়ে, চার চাকায় বা নিজস্ব এগারোতে সবাই আসলে শহরমুখো। মা দুর্গা স্বয়ং পুজোর অজুহাতে ভ্যাকেসনে ; এই জশনে ওয়াইল্ড নাচন-কোঁদনে শামিল বাঙালি এখন পাহাড়ি

তেনজিং। এদিকে অদূরেই সবার অজান্তে এক প্রাচীন অশ্বত্থের মায়াবি ছায়ায় স্বয়ং মহাদেব ল্যাদ খেয়ে পড়ে আছেন। মেগায় দেখা মডেল-স্লিম মাসকুলার নটরাজ কাটিং নয়; আসল নাদুসনুদুস কালোকেলো জটাজুটধারী ভার্সন। শপিং মল চেখে দেখে আজকাল যেমন আধুনিকাদের পুরনো মার্কেটে গোঁসা; মহাদেবেরও হয়েছে সেই একই দশা। দুর্গার থিমের জাঁকজমক রোশনাইতে হাতের রিচে থাকা "কিং অফ দি কিংস" শিবঠাকুর টোটাল পিচ ব্ল্যাক। ধুনি জ্বলছে ধিকিধিকি। অন্ধকারের আনাচ কানাচে ধেড়ে মশাদের পিং পিং। ডেঙ্গু, ফাইলেরিয়া তো বাঁধা খদ্দের। কিউলেক্স বা এডিস কেউ এসে মর্জি মতো খিমচে দিলেই চিত্তির। এমনিই হাসপাতাল জায়গাহীন; ওভারফ্লোতে রুগিদের ভিড়। কোনও সরকার এই উড়ন্ত ভিলেনদের তো পাকড়ে শো-কজ ধরানো বা ট্রান্সফার কিছুই করতে পারে না। দেবতার নারকীয় অভিশাপে বা ধারালো খবরের সংলাপে ওদের চাপে পড়ার কেসই নেই। নন্দী চুলকোতে চুলকোতে গোমড়া মুখে এগিয়ে এসে আগুনে একটা শুকনো মতন চ্যালা কাঠ গুঁজে মুখ বুজে সাইড হল। ভৃঙ্গি মহাদেবের পা টিপতে টিপতে এক্সট্রা বাঘছালগুলো আগুনে শুকিয়ে নিচ্ছে। মাঝে মাঝে পাতার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট স্যাট করে ঢুকে অনিচ্ছাকৃত ময়েশ্চরাইজ করে যাচ্ছে। সে তো ভেবেই পাচ্ছে না, কেন যে মহাদেব কৈলাসের পাহাড় ছেড়ে এখানে মশাদের আহার হতে এলেন? মনে মনে বলছে "বড় দেবতাদের ব্যাপার-স্যাপার।" তবে কৈলাসেও অবস্থা শান্ত নয়। বাইরের অক্কা পাওয়া কিছু ভূত প্রেত এসে বেমক্কা স্বায়ত্ত্বশাসন চাইছে। যখন তখন মিটিং মিছিল, চাক্কা বনধ। একবার তো ঐরাবতকেও কৈলাসের এক গুহায় বেঁধে রেখেছিল। রেয়ার স্পিসিস টিসিস বলে ইন্দ্র পটিয়ে-পাটিয়ে ফিরিয়ে এনেছেন। ইচ্ছে না থাকলেও আসন রাখতে কখনো স্বর্গের গাজর ঝুলিয়ে, কখনো সন্তামনা, মিষ্টি সোনা ইত্যাদি বুলি সহযোগে ঝুঁটিতে হাত বুলিয়ে শিব ওদের তোয়াজ করে রেখেছেন।

পাঠক বুঝতেই পারছেন এইমাত্র যে শ্মশানটির লোকেশন বর্ণিত হল তা মোটেও কোন মেলুহা বা জাভায় নয়। এমনকি দার্জিলিং বা লাভায় নয়। হয়তো আমাদের চেনা শহরের এক পুরনো

শহরতলির উপকণ্ঠে। এখানেই উমার পুজোর কদিন মহাদেব এসে ডেরা গেড়েছেন। লং শটে নজর রাখছেন বেঙ্গলের অ্যাটলাসে। তার আণুবীক্ষণিক দিব্যদৃষ্টির র‍্যাডারে বসিরহাটের চুল্লুভরা ব্লাডার, আলিমুদ্দিনের পার্টি ক্যাডার, অ-ভিআইপিদের লাল বাতিওয়ালা কার; ভুঁইফোঁড় পাঠশালা টু পোকাওয়ালা কোকাকোলা কিছুই বাদ পড়ে না। কয়েক ছিলিম টানার ধুনকিতে দেবাদিদেব আড়মোড়া ভেঙে মুঠো ভর্তি ছাই দিয়ে বডিটা আর একবার অকারণ ঘষে নিলেন। তারপরই জেমস গলায় সেভেন্থে হাঁক - "শালা ক্লাইমেট নিয়ে বরুণকে একসেট ঝাড় দিতে হবে। বারিধারার নাটক ছারচে খেপে খেপে; দিলে একবারে দিক নিক্তি মেপে! উমার প্রোগ্রামগুলো গুবলেট করে দেবে র‍্যা"।

ভৃঙ্গি লিকার চা গাছের ডাল দিয়ে গুলে একখানা খুলিতে ঢেলে মহাদেবকে দিল। উনি চোখ কুঁচকে তাকালেন। খুলিটা কোত্থেকে তুলে এনেছে কে জানে! এদিকে ভৃঙ্গি সেদিকে আড়চোখে একবার তাকিয়েই স্মার্টলি সুড়ুৎ করে খানিকটা জোলো চা টেনে একটু হ্যা হ্যা করে নিজেই জিভ থুড়ি মুখ খুলল।

-"গুরু মনে হচ্ছে বরুণদার কন্সটিপেশন হয়েছে মেলা। প্রতিবার দুগগো পুজোর আগে এই এক জ্বালা। নেক্সট বার নারদমুনিকে দিয়ে আকাশে একটু ইসবগুল ছড়িয়ে দিও প্লিজ।"

অনেক খুঁজে পরনের বাঘছালে একটা এঁটুলি খুঁজে পেয়ে শিব বেশ তুষ্ট। সেটাকে হাসিমুখে টিপুনি দিয়ে মেরে ছিলিমে পরপর কটা লম্বা টান দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। চোখ ঢুলুঢুলু, মুখে তৃপ্তির ফুর্তি। হাতটা খুব কষ্টে তুলে মুদ্রা দেখিয়ে বললেন

-"তথাস্তু। ঐ বরুন শালা যেদিন থেকে ফিল্মে মন্দাকিনীকে ভিজতে দেখেছে; মেয়ে দেখলেই এক্সট্রা জলের সাওয়ার। কৈলাসে ফিরি, দেখাবো আমার পাওয়ার। এমনিতেই মর্তে ধর্ষণের বর্ষণ চলে। তার ওপর ওনার ন্যাক অন্তরমহলে।"

মহাদেব এখন টোটাল হ্যালুতে। একটু ফাজলামো করবার লোভ সামলাতে পারলো না ভৃঙ্গি। বলে উঠল

-"সিনেমার কোট করলে কি গুরু? নাকি সিরিয়া-স কিছু সিম্বলিকাল বাঁশ? তোমার মহিমা অপার।"

এদিকে হ্যালুসিনেসনেও শিবের জ্ঞ্যানের নাড়ি টনটনে। ভৃঙ্গির কথায় খোঁচার টাচ সহজেই আঁচ করে ফেললেন। কড়কে উঠলেন

-"সিরিয়ার ওগুলো বাঁশ ছিল না; ছিল রাসায়নিক গ্যাস। বড্ড ভায়োলেন্স। আর নয় ব্যস।"

শিব ভূমিকম্পের আফটার শকের মত বারবার ভুঁড়ি সহ শিউরে উঠতে লাগলেন। শ্মশানভূমি কাঁপতে লাগলো। একটা পুরনো পাখির বাসা একটু দূরেই প্রায় ন্যাড়া একটা গাছ থেকে টুপ করে খসে পড়ল। দেবাদিদেবের কাঁচুমাচু মুখ দেখে ভৃঙ্গি তক্কের সলতেতে আগুন দিতে গেল

-"স্যার, এসবই তো হচ্ছে ডেইলি; রাম তেরি গঙ্গা মেইলি।"

-"ওসব আঁতলামো ছাড়। ও ছবি ডিভিডি তে দেখেই আমি তো নীলকণ্ঠ প্রায়। সে কি পেইন গলায়।"

শিব ত্রিশূল দিয়ে গলাটা চুলকে মৌনতা নিলেন। কি একটা গাছের ফল নিয়ে কামড়ে খাওয়ার চেষ্টা করছিল নন্দী। মুখে দিয়ে থু থু করে ফেলে দুঃখ দুঃখ মুখ নিয়ে ঘাড় নেড়ে বলল

-"আমাদের হোমটাউনে টি-টুয়েন্টির টি.এন.টি গ্ল্যামার নেই গুরু। কোথায় চিয়ার লিডার আর কোথায় ডিস্কো থেক; যতসব ওল্ড স্কুল অপ্সরাদের ঠেক। মিনিমাম সিনেমা হলের রেশ নেই

পর্যন্ত। দেখতে হলে সেই মর্তে মাল্টিপ্লেক্স। সেই আমারও তো গুরু ফিল্মস্টার হব, শখ ছিল মনে...।"

-"যাস নি কেন ভূতের ভবিষ্যতের অডিশনে? কোথায় লাগে বুম্বা কি দেব। হয়ে যেতিস রাতারাতি সেলেব। না হলে তো ছিল চাঁদের পাহাড়। ওখানে তো আছেই ক্যারেক্টার।"

এই ফাঁকে আকাশ মেঘলা করে নতুন এক পশলা উপহার দিয়ে গেল। দূরের জ্বলন্ত চিতাগুলোর ইমিউনিটি খতম। সাধের ধুনি নিভে যাওয়ায় আকাশের দিকে তাকিয়ে মহাদেব রাগী রাগী চোখে যেন নিরুচ্চারে মন্ত্রটন্ত্র কিছু বলছেন। ভৃঙ্গী প্রমাদ গুনল। হেব্বি খতরনাক এই ভৈরবের ঝাড়। খচে গেলে ডেসট্রাকশন এন্তার। দেবীও পুজো সামলাতে ব্যস্ত। একটাই উপায়, যদি গুরুর মনটাকে সরিয়ে রাখা যায় কিছুক্ষন। কথা ঘোরায় ভৃঙ্গী।

-"গুরু পুজোতে বৃষ্টির থিওরি কি আসলে রটনা? ধর্ষণ তো নাকি ড্রামাটিক সাজানো ঘটনা।"

শিব একটু বেশিই ঠাণ্ডা হয়েছেন মনে হল। তবে প্রতিবারের শিবরাত্রিতে নিউমোনিয়া নিয়ে বাড়ি যান। অভ্যাস হয়ে গেছে এত স্নান। গুছিয়ে এক ডজন হাঁচি দিয়ে একরাশ পাতা, ডালপালা উড়িয়ে তারপর মুখ খুললেন। রাগটা পুরোপুরি যে পড়ে নি সেটা বোঝা যাচ্ছে বেশ।

- "ওসব স্ট্যাট গুনতে জানলে ইন্দ্রের সিটে এবার আমিই দাঁড়াতাম রে শালা। কতশত বছর ধরে গদি আঁকড়ে আছে। সেই তো এই শর্মা আর লেডি উমাই জগতের সেভিয়ার। বাকি সবের বুকনিই সার। ঘেন্না ধরে গেছে এসবে। আর কপি করে পলিটিকাল স্টেটমেন্ট ঝাড়িস না। ভয়ে ভয়েতেই তো স্বর্গের লাক্সারি ছেড়ে এই মর্গের বারোয়ারিতে পড়ে আছি। চার চারটে দিন বউটা আর ছেলেমেয়েগুলো কোথায় চরবে কে জানে। এমনিতেই মর্তের লোকগুলো দেদার বজ্জাত মনে। শালাদের হাতে পেলে মারব এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে"।

মিঠুনদার ডায়ালগ দেওয়ার উত্তেজনায় মহাদেবের খেয়ালই নেই যে তিনি শ্মশানেই বসে আছেন। এখানে লাশ বাইপাস করাটাই নিয়ম। নন্দীর এখনো খিদে মেটেনি। একটা গাছে চড়ে কিছু খাবার-দাবার খুঁজে চলেছে। সুযোগ বুঝে সেও মগডাল থেকে ফুট কাটল।

-"আমাদের স্টেডি বিজনেস তো শ্মশানেই গুরু। সেই ধুপকাঠি থেকে শুরু। কেউ কাঠি করলেই যমলোকে পার্সেল। ঐ আদালতে স্ট্রেট শাস্তি; নো বেল।"

-"যমলোক কি তোর বাবার নাকি রে শালা? বিচার কি এক্কা দোক্কা খেলা? আবার গান টানও কোট করা চাই। দেবো নাকি থার্ড আই দিয়ে অ্যাশ সরি ভস্ম করে?"

থার্ড আই বের করবার জন্য বাঘছালের পকেটে হাত ঢোকালেন। চ্যালাদের ভড়কে দেওয়ার জন্য এমনটা তিনি মাঝে মাঝেই করে থাকেন। নন্দী গাছের আড়ালে হামা দিয়ে খানিক পিছিয়ে গেল। তারপর আবার এগিয়ে এল। একগাল হেসে বলল

- "এসব নিউজ ওপরে গিয়ে দেবেন স্যার। মর্তে আপনার দৈবীশক্তি ফিউজ।"

কোন এক্সকিউজ নেই দেখে মহাদেব ঝিমিয়ে গিয়ে খালি কঙ্কেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। তারপর ভৃঙ্গির দিকে এগিয়ে দিলেন। ভৃঙ্গি ঠোঁট উল্টে একটা শ্রাগ ঝাড়ল শুধু।

-"মাল নেই গুরু। পুলিশ রেইড মেরে মার্কেট থেকে সব তুলে নিয়েছে। মহিষাসুরের কাছে গেলে কিছু পাওয়া যেতে পারে ব্ল্যাকে। হাতকাটা ন্যাপলা, কানকাটা কেলোরা তো চলে ওরই ছকে।"

আত্মসম্মানে ঝড়ে কাঁপা মোমবাতির মত হঠাৎ ফুঁসে উঠলেন দেবাধিদেব

-"নেভার। স্বার্থের জন্য বউয়ের ইয়ারলি শত্রুর ফেভারে গেলে তাকে কি বলে জানিস? একঘর ট্রেইটর । শেম অন ইউ, ভৃঙ্গি। আমার চ্যালা হয়ে এমন অশাস্ত্রীয় খেলা...।"

আরও কিছু বলতেন হয়তো। এদিকে ভৃঙ্গিও মনে হয় আধপেটা থেকে শুধু জ্ঞানের ডোজ খেয়ে খেয়ে বিরক্ত হয়ে তুমুল ডেস্পারেট মুডে

-"সবই পালটি খাওয়ার পলিটিক্স গুরু। "তুমিও... ব্রুটাস।" ব্রুটাসের বাবা কোন এককালে তার ছেলেকে বেড়ে জপিয়েছিল। ঐ যে সেক্সপিয়ারের থেটারে।"

শিবের কিন্তু এত গাঁজা টেনে আর ধূসর ছাই ঘষেও সেন্স অফ হিউমার বেশ কালারফুল, টগবগে রসে। বরং ভৃঙ্গির বেসিক এডুকেশনকেই ঠুকে দিলেন কষে

"উফ কি উচ্চারণের ফোয়ারা। ওপর থেকে বীরেন ভদ্র শুনতে পেলে তোর বাপের নাম খগেন করে ছাড়বে। ঘাড় ধরে লকনেসে ছুঁড়ে দেবে তোকে। থাকিস ডাইনোর সাথে ভালোবেসে।"

কটা পাকা পেয়ারা খেতে পেয়ে নন্দী একটু চনমনে হয়েছে। করোটিতে কয়েক গ্যালন জল খেয়ে ঢেঁকুর তুলে নাক গলাল আলোচনায়

-"প্রভু কি জোট বাঁধার কথা বলছিলেন? তবে ডাইনোর সাথে জোটে চোট পাওয়ার আশঙ্কাই বেশি। এটাই নিয়ম এদেশি।"

-"আবার কথায় ইশারায় দিল্লি আর আইন নিয়ে এলি তো রে বেয়াদব! পার্টিবাজি নিয়ে আমার সঙ্গে কিচাইন নয়। খাদি না পরেও আমি সত্যবাদী বাসুদেব। সত্যি বলে ফেলব।"

উত্তেজিত হলে ভৃঙ্গি সব ভাষা মিশিয়ে বলে থাকে। তখন ওর কথা বোঝা দায়।

-"নেক কাম মে পুঁছ পুঁছ নেহি গুরু। সুইস ব্যাঙ্কে ইকোনমিক ডাইস। ইউটিউবে কোলাভরি, ওখানে হিট ঝাড়ি। কোরাপশনের ঘুঁটের মালা নিয়ে ওরা হল সংস্কারের রাজনীতিওয়ালা।"

নন্দী পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল- "অসম শালা, অসম শালা।"

শিব ত্রিশূল নিয়ে নন্দীকে খোঁচা মারার জন্য একটু চেষ্টা করেও না পেরে আবার থেবড়ে বসলেন

-"ওসব ভাঁড়ামো শেখা হচ্ছে রিয়েলিটি দেখে। তাই না? দিল্লি না হাতি। ইচ্ছে হলেই হল? অর্থনৈতিক সংস্কার নয়, এ তো শালা গরিবের পেটে লাথি। ছ' কোটির বাথরুমে হিসির সময় সংস্কারে ফ্ল্যাশ টেনে দিলো কে? জনগণ কি খাচ্ছে ঘাস? পারডন মাই ওয়ার্ডস।"

-"এমন কি হয় না গুরু? যৌথ খামারও হবে না, কারো বাবারও হবে না। যা হবে আরপার অপার!"

শিব এখন সাধারন মানুষের মতই দার্শনিক মুডে। বললেন-

-"ট্যাকটিকাল কচকচিতে আমার তোর আজ কাল বরবাদ করার কোন মানে আছে? যা করছিস কর। নিজের পকেট ভর।"

ভৃঙ্গি আবার মহাদেবের পা টেপায় মন দেয়। চোখ বন্ধ করে বলে

-"গুরু আমাদের ত্রিকালজ্ঞ। আর আমরা? সিমপ্লি অজ্ঞ।"

শিব খুব একটা ফ্ল্যাটারড হননি দেখা গেল। গলার সাপটাকে খুঁজে গাছের কোটর থেকে বের করে কাতুকুতু দিয়ে বলেন-

"বার খাওয়াস না বেশি। গাঁজা খাওয়ালে ও.কে। স্থানীয় সংবাদ বল। প্যান্ডেল কেমন হল ফার্স্ট লুকে?"

-"ঐ পুকুরপাড়ের ক্যাওড়া ক্লাব বিয়ারের বোতল দিয়ে সাজাচ্ছে থিম। ওরা বলে রিসাইকেল টিম। সব মালের বোতল ঐ ক্লাবের পেছনের পুকুরেই সাঁতরাচ্ছিল। স্রেফ জাল ফেলে বামাল তুলেছে।

নো খরচাপাতি।” বলে প্যাঁচার মত মুখ করে, বাসুকি নাগের স্টাইলে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল নন্দী।

-“কাল আপনি যখন দিবানিদ্রায় নাক ডাকাচ্ছেন, তখন ওরা এলো। হাতে হকি স্টিক, সাইকেলের চেন। রসিদ কেটে আপনার ব্র্যান্ডেড বাঘছালের সেট চাঁদা বলে নিয়ে গেলো।” ভৃঙ্গি জুড়ে দিল।

শিব আরাম পেয়ে ঝিমিয়ে পড়েছিলেন। একটা পোড়া বিড়ি কুড়িয়ে পেয়ে, পকেট থেকে সেটের তিন নাম্বার চোখটা আলতো করে জ্বেলে সেটা ধরিয়ে একটু এনার্জি নিয়ে বাবু হয়ে উঠে বসলেন।

-“কি স্পর্ধা। এরপর দেখছি বিড়ির বান্ডিল দিয়েও থিম হবে রে নন্দী। প্যান্ডেল ভেঙে নিজেরাই ঘ্যামা ডিস্ট্রিবিউট করে নেবে। এত মানসিক ট্রমা নিয়ে উমাকে আর আসতেই দেব না নেক্সট ইয়ার।”

সুযোগ বুঝে কথার তুবড়ি ফোটাল নন্দী। মহাদেবকে বাগে পাওয়া কি সোজা কথা!

-“দেবতাদের শ্রেষ্ঠ হয়েও ক’টা এক্সট্রা সিলিন্ডারে ভর্তুকি দেওয়াতে পারলে না গুরু। হেঁশেলে পড়লে টান, শিব হবে খানখান ! দেখবে ব্ল্যাকে গ্যাস পাওয়ার জন্য দেবী নিজেই মহিষাসুরের সঙ্গে রফা করে নিয়েছেন যেচে।”

মহাদেব উঠেই ছিলেন। আরও একটু উঠে বসলেন।

-“এরকম দেবী- মহিষাসুরে কোয়ালিশন সরকার হলে তো পুজোটাই উঠে যাবে রে। তা একদিক থেকে ভালই, কি বলিস। একই সিরিয়ালের রিপিট টেলিকাস্ট আর কত ভাল্লাগে বাপ! এমনিতেও দেশের কন্ডিশনে উলটোটাই খাপে খাপ।” বলে একটু হাসলেন মনে হল। যদিও অন্ধকারে দাঁত দেখা গেল না।

শ্মশানের সামনের রাস্তাটা আর শুনশান নেই। নেড়ি কুকুর, মানুষ, বাস, অটো, ট্যাক্সির ঠ্যালায় কান পাতা দায়। সস্তা সিনেমা, ঘর ভাড়া, পেইং গেস্ট এবং গোপন রোগের পোস্টার সাঁটানো বট, অশ্বত্থের গাছগুলিও ধোঁয়ায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ছেলে ছোকরারা মদ খেয়ে হুল্লোড়ে মত্ত। কেওড়া ক্লাব টেম্পো চাপিয়ে বেঁধেছেঁদে প্রতিমা নিয়ে চলেছে। বিসর্জনে কলকাতা থেকে হট ডিজে আনবার প্ল্যানও হচ্ছে। আর কোনদিকে কারোর মন দেওয়ার সময় বা অবসর কোনটাই নেই। এদিকে পাশের শ্মশান থেকে এক সুপ্রাচীন বৃদ্ধ আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছেন।

ঝড়ের শেষে

শান্তনু পাল

অ্যাম্বিশন মানুষকে উঁচুতে, অ-নে-ক উঁচুতে টেনে নিয়ে যায়; কিন্তু সে তো দূরবীনের সামনের দিক দিয়ে দেখা। যদি এর পিছনদিক দিয়ে তাকানো যায়, তবে সেই দেখাটা ঠিক কি রকম?

'ইউ মাস্ট প্রিসাইড ওভার দিস ফ্যাসিনেটিং ওয়ার্ল্ড অফ ফ্লরা এন ফনা' – কে, কে বলল কথাটা? বোধ-বুদ্ধি-চেতনা বিকাশের সেই একদম আদিপর্বে যখন আমি মাথা দিয়ে ঢুঁ মেরে মেরে নরম মাটির বুক চিড়ে ছোট্ট চারাগাছটি হয়ে দুলছি, তখন কে আমার আমার কানের কাছে এই শব্দবাণ ছেড়ে গেল, আমার শিশুমনকে নেড়ে দিয়ে গেল ভীষণ ভাবে? তাকালাম চোখ মেলে। কই, কেউ তো নেই আমার নজরের ত্রিসীমানার মধ্যে।

আর তখন, ঠিক তখনই চোখে পড়ল মাথার ওপর সুনীল আকাশের দিগন্তব্যাপী বিপুল বিস্তার – আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসছে, আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে, বলছে – 'এই তো আমি, তোমার কত কাছে, এস, একটু হাত বাড়ালেই ধরে ফেলবে আমায়।'

তার মুচকি হাসি, তার হাতছানি, তার মায়াবি চোখের ইশারায় কেমন যেন ঘোর লেগে গেল মনে, রোমাঞ্চ জাগল সারা দেহে। সত্যিই তো, মাথার এই তো কয়েক হাত ওপরেই রয়েছে সে। আকাশ ছোঁয়া কি আর এমন কঠিন কাজ! আর যত কঠিনই হোক আমাকে আকাশ ছুঁতেই হবে – মনের মাঝে এমনই একটা শক্ত বাঁধন দিলাম; ভীষণভাবে আঁকড়ে ধরলাম সেই প্রথম শোনা শব্দগুলিকে। নিজের মত করে গড়েও নিলাম তাদের – আই উইল গো টু দ্য টপ, দ্য টপ, দ্য টপ। সব দিকের দরজা-জানালা বন্ধ করে খুলে রাখলাম শুধু মাথার উপরের ছাদটিকে, আকুল হয়ে চেয়ে রইলাম শুধু উপরের দিকে। আমার যে শুধু উপরে ওঠারই সাধনা; এতটাই উপরে যে আমাকে ঠাহর করতে সকলের যেন ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়, আমার নাগাল পেতে চোখে যেন ধাঁধা লাগে সবার।

এরই মাঝে একদিন ঈশানকোণে জমে উঠল একখণ্ড লালরঙা মেঘ। আশেপাশের গাছগাছালি, আম-জাম-পলাশ-শিমূল-বকুল-পারুল – সবার মধ্যে সে কি উন্মাদনা – 'ওই দ্যাখ, ঝড় আসছে, চল, ঝাঁপ দিয়ে পড়ি, লুটোপুটি করি, পাগলা হাওয়ার সাথে পাল্লা দিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠি। তারপর, তারপর সেই ধুলোর আস্তর ধুয়ে নেব বৃষ্টিধারায়। আহা, কি আনন্দ!' ডাকলে আমাকেও। বিরক্ত হলাম, খুবই বিরক্ত হলাম আমি। ধমকে বললাম – 'আচ্ছা তোমাদের অভিধানে কি অ্যাম্বিশন, ডিটারমিনেশন, রেজোলিউশন এই শব্দগুলো নেই? এভাবে সময় নষ্ট করে তোমরা কি পাবে?' গ্রাহ্যই করলে না তারা আমার কথা। আনন্দে কলকল করতে করতে চলে গেল। খুব করুণা হল ওদের ওপর; ওরা তো জানে না ওদের মত সাধারন পাঁচপেঁচি জীবনের আটপৌরে, সাদামাটা যাপন আমার জন্যে নয়। আমি হব অসাধারণ, হব অনন্য।

এগিয়ে চললাম আমি। পাখির চোখের মত সামনে রইল শুধু খোলা আকাশ। কৈশোরের উচ্ছ্বাস আমাকে টেনে নিয়ে গেল খানিকটা, পৌঁছে গেলাম মহীরূহদের একান্ত সমীপে একটি সম্ভ্রম জাগানো অবস্থানে।

এল যৌবনের উদ্দীপনা। তার বাঁধভাঙা জোয়ার আমাকে এগিয়ে দিল আরও, আরও অ-নে-ক-টা দূর। আমার দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে রবি ঠাকুর এঁকে ফেললেন সাদায় কালোয় একটি ছবি – তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে

সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে

আর আমি? নিচের দিকে তাকিয়ে তখন আমার মুখে এক পরম আত্মপ্রসাদের হাসি। ইচ্ছে হচ্ছিল চিৎকার করে বলি – আই অ্যাম দ্য মনার্ক অফ অল আই সার্ভে। সে আওয়াজ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ুক আকাশে-বাতাসে, দিক থেকে দিগন্তে। পেরেছি, আমি পেরেছি, সবাইকে হারিয়ে

আজ আমি জিতে গেছি এই খেলায়, সফল হয়েছে আমার স্বপ্ন, সত্যি হয়েছে আমার সাধনা, আমার সাধ, আমার আকাশ ধরা –

কিন্তু কোথায়? নিমেষে চোখ ফেললাম ওপরের দিকে। আকাশ কোথায়, কোথায় আকাশ? সে যে এখনও ঠিক ততটাই দূরে। সে যে এখনও সেভাবেই সোনালি আলোর হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তবে, তবে কি আমি মরীচিকার পিছনে ছুটেছি? আমার সংকল্প যা আমার চলার সাথীদের অনেক পিছনে ছেড়ে রেখে এসেছে, সে কি শুধুই প্রতারণা? তবে কি আকাশ সত্যিই অধরা, 'আকাশছোঁয়া' কথাটি কি আসলে সব ধরাছোঁয়ার বাইরে?

হঠাৎই একটা ঘন শীতের চাদর জড়িয়ে ধরলে আমায়। আজ আমি একা, সম্পূর্ণ একা, ভীষণভাবে একা; আজ এমনই একটা অবস্থান আমার যেখানে আমার মুখের হাসি, চোখের জল, রাগ-অনুরাগ-ভাব-ভালবাসা-যন্ত্রণা – কেউ, কেউই ভাগ করে নিতে আসবে না। যার টানে সবাইকে ছেড়ে পা বাড়িয়েছিলেম, কই মনের সেই সাধ তো আমার মিটল না, বরং আমিই স্বজনহারা, সকলছাড়া হলাম। অ্যাম্বিশন আর অ্যালিয়েনেশন যে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। সেটা এতখানি দাম দিয়ে বুঝতে হল আমায়!

ভয়, ভীষণ ভয় করছে আমার। অজানা এক আতঙ্ক যেন শরীর-মন সব গ্রাস করছে আমার। রাতের আকাশটাও আজ যেন কেমন অচেনা, ঘোরলাগা। তারাদের আলোকলতা নিভিয়ে দিয়ে কে যেন গোটা আকাশে সর্বনাশা লাল রং লেপে দিয়েছে। তবে কি ঝড় উঠবে?

উঠল, ঝড় উঠল মাঝরাতে। আমার আশঙ্কাই সত্যি হল। উথালপাথাল সেই ঝড়ের তান্ডবে চারিদিক যেন লন্ডভন্ড হয়ে যেতে থাকল, আকাশভেদী বজ্রনাদে জগৎসংসার যেন বধির হয়ে যেতে লাগল, নিকষ কালিমা ভেদ করে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চরাচরে অন্ধকার গভীর, গভীরতর হল।

.....যন্ত্রণা, বড় যন্ত্রণা! দামাল হাওয়ার ঝাপট আমার দেহকান্ডে ক্রমাগত আঘাত করতে করতে আমাকে ছিন্নমূল করতে চাইছে; আমার সব প্রতিরোধ ক্ষীণ হয়ে আসছে। জল, একফোঁটা জল, একবুক বাতাস, একটুখানি আলোর রেখা – না, নেই, কিছুই নেই, চারিধারে কোথাও কিছু নেই। আচমকা একটা ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে নস্যাৎ হয়ে গেল আমার শেষ প্রতিরোধ; মুখ থুবড়িয়ে পড়ে গেলাম আমি। যেখানে যত ছিল আমার বন্ধু, আত্মীয়স্বজন, পাখপাখালি – সবাই মিলে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আমায়। জলভরা চোখে তাদের আকুল জিজ্ঞাসা – 'কোথায় চলে গিয়েছিলে আমাদের ছেড়ে, আমাদের মায়ার বাঁধনকে দূরে ঠেলে ফেলে?' স্নেহমমতার সেই পরশে আমার হৃদয় গেল জুড়িয়ে, কেঁদে ফেললাম আমি। দেহের যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে বুকের মধ্যে এক অচিন পাখির কি যে পাখার ঝাপটানি, একটা দুমড়ানো, মোচড়ানো অব্যক্ত ব্যথা। আকাশ ভেঙে শুরু হয়েছে তখন সব কিছু ছাপিয়ে বয়ে যাওয়া, সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া বৃষ্টির অবিরাম ক্ল্যারিওনেট।

দু'চোখ ভেঙে ঘুম নেমে আসছে আমার। যেন কত রাত কেটেছে জেগে। ঘুমের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে দেখলাম সবার চোখে জল। একদিন যাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আমি পা বাড়িয়েছিলেম সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে, তাদের বুকেই জমে ছিল আমার জন্যে এতখানি ভালবাসা! বোধ হয় এই উপলব্ধির জন্যই একদিন যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, আজ সেখানেই ফিরে এসে সম্পূর্ণ হল আমার বৃত্ত, আমার জীবন চক্র।

বৈভব

সিদ্ধার্থ দেব

নিউ টাউন। নতুন শহর গড়ে উঠছে পুরনো শহরের পাশে। ঝকঝকে চওড়া রাস্তা; নতুন নতুন আকাশ ছোঁয়া বাড়ি, অফিস এবং শপিং মল। রাস্তায় আধুনিক গাড়ি; হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন বিদেশ। মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে একটি দুধ সাদা গাড়ি – 'বিএমডব্লিউ'; খুব কেতার গাড়ি এবং ভীষণ দামি, ছন্দা বলেছিল। চালকের আসনে ধবধবে উর্দি এবং টুপি পরা একজন মাঝবয়সী লোক; ছন্দার খাস ড্রাইভার। ছন্দার বরের অন্য ড্রাইভার আছে। তিন তলা বাড়ির সামনে বেশ কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। ক'জন ড্রাইভার আছে কে জানে?

মৃদু গুঞ্জনে এসি চলছে; ভেসে আসছে একটু হাল্কা সেতারের শব্দ, খুব আস্তে। কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে ব্রততীর। ছন্দাকে বলেছিল ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাবে। কোনও অসুবিধে হবে না। ছন্দা শুনতেই চাইল না। জোর করে ড্রাইভার দিয়ে পাঠাল। গাড়িটা নাকি সারাদিন প্রায় বসেই থাকে, ব্রততীকে পৌঁছে দেবার অজুহাতে একটু চলবে। এই গাড়ি নিয়ে পাড়ায় ঢুকতে একটু লজ্জা-ই করছে। পৌঁছনোর আগে হয়তো দীপ্তও বাড়ী পৌঁছে যাবে। ঠিক পেছনে লাগবে, "বড়লোক বান্ধবী" "গরিব স্বামী"... পারেও বটে দীপ্ত। সুযোগ পেলেই পেছনে লাগে। একটু হাসিই পেল ব্রততীর। মনটা বোধহয় একটু হাল্কা হল।

ঘটনার সূত্রপাত মাস খানেক আগে। দুপুর একটা নাগাদ, পাশের বাড়ির রূপার সঙ্গে সাউথ সিটি মলে এসেছিল ব্রততী। বাড়ির কাছেই, হেঁটেই যাওয়া যায়। কেনা কাটার বিশেষ কিছু ছিল না। রূপা জোর করল, "চল না ব্রততীদি, কিছু কেনার তো দরকার নেই, জাস্ট ঘুরে বেড়াব, এই একটু টাইম পাস"। রূপাটা খুব পারে টৈ টৈ করতে। মলে ঢুকলে কিছু একটা কেনা হয়েই যায়, দরকার না থাকলেও; কিংবা কিছু জিনিস হঠাৎ দরকারি মনে হয়। সেদিনও তাই হল। দিদির শাশুড়ি অসুস্থ, আগামী কাল দেখতে যাবার কথা, একটা গেট-ওয়েল কার্ড কেনা হল, অথচ কোনও

দরকার ছিলনা। মিন্টির খুব সফট টয় পছন্দ, তাও একটা কেনা হল যদিও মিন্টির ঘরে সফট টয়ের ছড়াছড়ি। রূপা বেশ কিছু দামি পারফিউম কিনল।

শপিং মলের ফুড কোর্টটা বেশ আকর্ষণীয়, সব সময় বেশ একটা গমগমে ভাব। নানা রকমের কেনাকাটার পর সবাই এখানে বসে কিছুটা সময় কাটিয়ে যায়। ব্রততী এবং রূপাও এসে বসল কফি খেতে। রূপা অবশ্য শুধু কফিতে সন্তুষ্ট নয়,

– ব্রততীদি, লুচি মাংস খাবে? দারুণ করে, ঐ যে দেখছ স্পিরিট অফ বেঙ্গল, ওখানে।
– ও বাবা না, প্রচণ্ড স্পাইসি, আর মাংসের থেকে হাড়ই বেশি থাকে, আমি খেয়েছি
– এমন কিছু স্পাইসি নয়, আর এক আধদিন খেলে কিছু হবে না। আর লোকগুলোকে চিনি আমি, বলে দেব ভাল ভাল পিস দিতে।
– না রে রূপা তুই খা। আমার আজ ভাল লাগছে না। আমি বরং একটা পাপড়ি চাট নিচ্ছি। আর শোন আজ কিন্তু আমার টার্ন, আগের বার তুই দিয়েছিলি।
– ও হো, তোমার মনেও থাকে বাবা, বড্ড হিসেব করে চল তুমি।
– ঠিক আছে, ঠিক আছে চল টোকেন কিনে নিয়ে আসি।

লুচি মাংস বেশ ভালই বাসে ব্রততী, কিন্তু খেলো না কিছুটা বিবেকের দংশনে। আসলে দীপ্ত প্রচন্ড লুচিপ্রিয়, লুচি পেলে আর কিছুই চায়না। ইদানিং একটু প্রেশার ধরা পড়েছে, তাই ব্রততী একটু সাবধান হয়ে গেছে, আজকাল মাসে বড়জোড় এক দিন লুচি হয় বাড়িতে। আগে তো সব রবিবার সকালে লুচি আর আলুর তরকারি হত। আজকাল শুকনো রুটি করে, প্রচন্ড রেগে যায় দীপ্ত। দীপ্তর ওপর এত কড়াকড়ির পর বাইরে এসে নিজের আর লুচি খেতে মন চাইল না।

রূপা লুচি মাংস খেল বেশ তারিয়ে তারিয়ে, ব্রততী পাপড়ি চাট শেষ করল। কফি প্রায় শেষ হয়ে আসছে এমন সময় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ছন্দার সঙ্গে। মধুছন্দা, সেই কলেজের বন্ধু। ছন্দাই ডাকল,

– ব্রততী না?

ছন্দাকে প্রথম চিনতে পারেনি ব্রততী, বেশ মোটা হয়েছে, পরনে দামি শাড়ি, একগাদা গয়না, হাতে একটা বাদামি রঙের ঢাউস ব্যাগ। দুপাশে দুজন সালোয়ার কামিজ পরা মেয়ে, এই পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে, দুজনেরই দু'হাতে অজস্র শপিং ব্যাগ।

– একি ছন্দা, তুই?
– এই একটু কেনা কাটা করতে এসেছিলাম। আসলে এই সাউথ সিটি মলে আমার আগে আসা হয়নি, বাড়ি থেকে অনেকটা দূর পড়ে। আজ ঠিক করলাম একটু ঘুরে যাই
– কোথায় তোর বাড়ি?
– বাগবাজারে আমার শ্বশুর বাড়ি, তবে বছর তিনেক আগে আমরা রাজারহাটে শিফট করেছি।
– ও মা তাই, দাঁড়া আলাপ করিয়ে দিই, এ হচ্ছে রূপা, আমার প্রতিবেশী, আমরা একই বিল্ডিংয়ে থাকি, একই ফ্লোরে। আর এ হচ্ছে ছন্দা, মধুছন্দা, আমার কলেজের বন্ধু।

রূপা হাত তুলে নমস্কার করে। ছন্দা একটু মৃদু হাসে।

– তুই কি এদিকেই থাকিস - জিজ্ঞেস করে ছন্দা
– হ্যাঁ রে, কাছেই, হাঁটা পথ। যাবি? চল না একটু বসে যাবি। কতদিন দেখা হয়নি
– ঠিক আছে চল। বেশিক্ষণ বসব না কিন্তু, বাড়ি ফিরতে হবে।

ছন্দার গাড়িতেই সবাই এল ব্রততীর বাড়ি। ছন্দা মোবাইলে ফোন করার পাঁচ মিনিট পর গাড়ি এসে দাঁড়াল সাউথ সিটি মলের দোরগোড়ায়। বিরাট গাড়ি। মিৎশুবিশি পাজেরো, জানালো ছন্দা। ধবধবে সাদা পোষাকের ড্রাইভার। তিন সারি সিট। গাড়ির ভেতরটা কুলকুলে ঠান্ডা মাখানো, এসি চলছে। মাঝখানের সারিতে বেশ আরাম করেই বসল ছন্দা, ব্রততী ও রূপা। পেছনের সারিতে ছন্দার দুই সঙ্গিনী। মেয়ে দুটোর মুখে কোনও কথা নেই। হঠাৎ দেখলে মনে হয় ছন্দার বডিগার্ড। রাস্তায় বেশ জ্যাম, ব্রততীদের বাড়ি পৌঁছতে পনেরো মিনিট লেগে গেল। হেঁটে পাঁচ সাত মিনিটেই পৌঁছনো যায়।

রূপা চলে গেল নিজের ফ্ল্যাটে। বাড়ি পৌঁছে বাইরের ঘরে ছন্দাকে বসালো ব্রততী। পাখাটা চালিয়ে দিল ফুল স্পিডে। এসি গাড়ি থেকে বেরিয়ে যেন বেশি গরম লাগছে। ছন্দা ব্যাগ থেকে টিস্যু বের করে গালে কপালে ঘাম শুকিয়ে নিচ্ছে মাঝে মাঝে। সঙ্গের মেয়ে দুটোকে ডাকতে হল না, নিজেরাই নেমে এল। পেছন পেছন এল কিন্তু ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকল না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ঠিক দরজার বাইরে, যেন হুকুমের অপেক্ষায়। ছন্দাকে দেখে মনে হল এক বিলাস বহুল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। দুই গ্লাস শরবত বানিয়ে নিয়ে এল ব্রততী, ছন্দা অর্দ্ধেকটা খেয়ে বাকিটা নামিয়ে রেখে দিল। বসল না বেশিক্ষণ। বাড়িতে কাজ আছে বলে উঠে পড়ল। যাবার আগে ব্রততীর ফোন নাম্বার এন্ট্রি করে নিল নিজের মোবাইল ফোনে। ব্রততী এগিয়ে এল গাড়ি অব্দি। মাঝের সিটে এবার একা বসল ছন্দা। দুই সহচরী সেই পেছনের সিটেই। কয়েক মিনিট একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল ব্রততী। ছন্দাটা বেশ পালটে গেছে। ব্রততীর সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গতা না থাকলেও মোটামুটি বেশ ভালই ভাব ছিল। খুবই সাধাসিধে মেয়ে ছিল। এখন যেন চলনে বলনে একটা প্রাচুর্যের অহঙ্কার, কথাবার্তাও ঠিক স্বতস্ফূর্ত নয়, একটু আড়ষ্ট, মাপা মাপা। আর এত গয়নাগাঁটি পরে কেউ মলে আসে?

ছন্দা রওনা হতেই রূপা এসে হাজির। মনে হয় তক্কে তক্কে ছিল,

– বসল না?

– না, কাজ আছে বলল।

– কাজ না হাতি, কিছু মনে করনা ব্রততীদি, একটু অদ্ভুত আছে কিন্তু তোমার বন্ধু। একটা কথা বলল না আমার সঙ্গে। আমি নমস্কার করলাম, ও কিন্তু করল না।

– না রে, আসলে একটু লাজুক জানিস তো...

– লাজুক না হাতি। তুমি যাই বল না কেন, বেশ অহঙ্কারী আছে।

– যাক গে ছেড়ে দে না, আর তো দেখা হবে বলে মনে হয়না। একটু শরবত খা।

ছন্দার সঙ্গে ঐ একদিনের দেখার স্মৃতি হয়তো হাল্কাই হয়ে যেত ধীরে ধীরে। কিন্তু তিন সপ্তাহ পরে দুপুর বেলা হঠাৎ ফোন এল ছন্দার,

– এই ব্রততী, সেদিন একটু তাড়া ছিল বেশি কথা বলতে পারিনি। তুই বরং পরের সোমবার চলে আয় আমার বাড়ি। বারোটা নাগাদ চলে আয়, একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করব আর সারা দুপুর আড্ডা মারব।
– না রে এমনিই যাব একদিন, খাওয়া দাওয়া কেন আবার?
– তুই না করিস না, চলে আয় আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব।
– না না শোন, গাড়ি পাঠতে হবে না। আমি এমনিই চলে যেতে পারব। কিছু অকেশন আছে কি? অনেকে আসছে?
– না রে, শুধু তুই আর আমি। কোনও অকেশন নেই। সাড়ে এগারোটায় আমার গাড়ি পৌঁছে যাবে
– না ছন্দা, গাড়ি পাঠাস না। - এবার একটু জোর দিয়েই বলে ব্রততী।
– কেন? আচ্ছা ঠিক আছে। – একটু দমে যায় ছন্দা
– তোর বাড়ির ঠিকানাটা দে।

ঠিকানাটা একটা কাগজে লিখে নেয় ব্রততী। একটু কৌতুহলও হচ্ছিল ছন্দা সম্পর্কে। তাই রাজি হল। আশ্চর্য লাগছে। সাধারণতঃ বন্ধুরা বরদেরও নিয়ে আসতে বলে, নিজেদের বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। ছন্দা তো দীপ্তর নামও জিজ্ঞেস করল না। সেদিনও দীপ্ত সম্বন্ধে কিছু জানতে চায় নি। সত্যিই অদ্ভুত, রূপা ঠিকই খেয়াল করেছে।

দীপ্ত বাড়ি এসে সব শুনে অবাকই হল।

– এই ভর দুপুরে একা একা কোথায় যাবে তুমি? রাজারহাট বেশ নির্জন জায়গা। বড় বড় বাড়ি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু লোকজন বেশি থাকে না। ট্যাক্সি ঐ অসময়ে যেতে চাইবে কিনা কে জানে। আর ফেরার সময় ট্যাক্সি পাবার চান্স খুব কম।
– বাস?
– বাস রুটও বেশি নেই। কাগজে পড় না, পরিকাঠামোর অভাব ইত্যাদি।
– তবে কি করব? না করে দেব। কিছু একটা অজুহাত দেখিয়ে।

– দেখি আমি কোনও ড্রাইভার ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। আমাদের গাড়িতেই তোমাকে পৌঁছে দেবে। ফেরার সময় যদি ট্যাক্সি না পাও, ফোন করে দিও। আমিই তুলে নেব তোমাকে। আমি কিন্তু তোমার বন্ধুর বাড়ি ঢুকব না।

– ঠিক আছে।

– তোমার বন্ধু বেশ শাঁসালো পার্টি মনে হচ্ছে। গাড়ির অফার দিল যখন নিয়ে নিলেই পারতে।

দীপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি করে। উঁচু পোস্টে আছে। ইচ্ছে করলে অফিসের গাড়ি ড্রাইভার দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারে। কিন্তু দেবে না। অফিস থেকে কোনও রকম ব্যক্তিগত সুবিধে নিতে চায় না দীপ্ত। অথচ ওর সহকর্মীরা অফিসের গাড়ি নিয়ে দিঘা বেড়াতে চলে যায়, মহিলারা শপিং করতে যায়। দীপ্ত অফিসের গাড়ি শুধু অফিসের কাজেই ব্যবহার করে। নিজের বা পরিবারের জন্য বরাদ্দ পাঁচ বছর আগে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে কেনা একটি মারুতি অলটো। তবে এই সততার স্বীকৃতি আছে। কোথাও কোনও রকম দুর্নীতির আঁচ পেলে দীপ্তকেই অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সংবাদ মাধ্যমও দীপ্তকে খুব সম্ভ্রমের চোখে দেখে।

নির্দিষ্ট দিনে সময় মত পৌঁছে গেল ব্রততী। দীপ্তর অফিসের এক রিটায়ার্ড ড্রাইভার, এখন পার্ট টাইম গাড়ি চালান একটু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে, পৌঁছে দিলেন ব্রততীকে, ঠিকানা দেখে একেবারে বাড়ির সদর অব্দি। এবং বসে রইলেন ব্রততী ভেতরে না ঢোকা অব্দি। পেল্লায় তিন তলা বাড়ি। বাড়ির সামনে বেশ কেতা দুরস্ত বাগান। সামনে বেশ কয়েকটি গাড়ি। গেটে খাকি পোষাকে সিকিউরিটি গার্ড। ব্রততীর নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। নাম শুনে সসম্ভ্রমে গেট খুলে দিল, বোধহয় ছন্দা বলে রেখেছিল। দেয়ালে একটা সুইচ টিপে কথা বলল কারও সঙ্গে। এগিয়ে দিল সিঁড়ি অব্দি।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল সেদিনের এক সালোয়ার কামিজ। আজও একই রকম পোষাক। একটু হাসল ব্রততীকে দেখে, কথা বলল না, ইশারা করল ওপরে উঠে আসতে। সাদা ধবধবে সিড়ি। ওপরে উঠে একটা লম্বা প্যাসেজ, বেশ চওড়া, দেয়ালে নানা রকমের পেইন্টিং, এক মাপের ফ্রেমে,

সারি সারি। মাঝে মাঝে নানা কায়দার গাছ গাছালি। বেশ সুন্দর সাজানো, একটু বেশিই যেন সাজানো। মনে হয় এই সাজানোর মধ্যে আন্তরিকতার চেয়ে পেশাদারিত্বের ছাপ বেশি। প্যাসেজের ডান দিকে এক বিরাট মাপের ঘর, ভারি পর্দার ফাঁকে চোখে পড়ল বড় বড় সোফা সেট। বাঁ দিকে মনে হল বিরাট এক ডাইনিং হল। বসার ঘরের ঠিক পাশে একটা দরজা একটু ভেজানো, দরজায় মৃদু টোকা দেল মেয়েটি। ভেতর থেকে ছন্দার গলা শোনা গেল "আয়"।

ভেতরে ঢুকল ব্রততী। এ ঘরটাও বেশ বড়, সোফা সেট দিয়ে সাজানো, দেয়ালে বড় বড় ফ্রেমে কিছু ছবি। পেইন্টিং নয়, নানা রকম পারিবারিক ছবি মনে হল। প্রায় পুরো মেঝে জুড়ে কার্পেট। এসি চলছে। মাঝখানে এক বিরাট গদিওয়ালা চেয়ারে গা এলিয়ে, পা মুড়ে বসে আছে ছন্দা। আজকেও গায়ে বেশ ভারি ভারি গয়না। হাল্কা পারফিউমের গন্ধ। সামনে একটা বড় এলইডি টিভিতে কোনও একটা সিরিয়াল চলছে।

– এসেছিস ব্রততী, বোস। বাড়ি খুঁজতে অসুবিধে হয়নি তো?
– না রে খুব সহজেই পেয়ে গেছি।

ব্রততী পাশের একটা চেয়ারে বসে। ছন্দা বসেই থাকে।

– কি করে এলি, ট্যাক্সি?
– না, গাড়িতেই, ড্রাইভার নামিয়ে দিয়ে গেছে।
– গাড়িটা ছেড়ে দিলি?
– হ্যাঁ, দীপ্তর মানে আমার বরের যদি দরকার হয়।
– ও, কি খাবি বল, চা, কফি, কোল্ড ড্রিংক?
– একটু পরে। এখন একটু জল খেতে পারি। ফ্রিজের না কিন্তু।
– ঠিক আছে।

এবার সালোয়ার কামিজের দিকে তাকালো ছন্দা,

– রেবা, দু গ্লাস জল নিয়ে এসো।

– আচ্ছা বৌদি।

– আর শোনো।

রেবা থেমে ঘুরে দাঁড়ালো।

– টিভিটা বন্ধ করে দাও।

ছন্দার হাতের পাশেই একটা ছোট কাশ্মিরি টেবিলে টিভির রিমোট কন্ট্রোল। রেবা মৃদু পায়ে এসে রিমোট কন্ট্রোল তুলে টিভি অফ করে। বেরিয়ে যায়, দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যায় সন্তর্পণে।

– আজ তোর সঙ্গে আড্ডা মারব বলে আমার বরকে বলেছি অফিসে খেয়ে নিতে।

– উনি রোজ বাড়িতেই খেতে আসেন বুঝি?

– হ্যাঁ, এই নিচের তলায় তো অফিস। তবে প্রায়ই এদিক ওদিক যেতে হয়, সাইটে কাজ থাকে। আজ বলেছি খাবার নিচে পাঠিয়ে দেব।

– ওনার কি নিজের ব্যবসা?

– ফ্যামিলি বিজনেস। আমার শ্বশুর মশাই শুরু করেছিলেন। মারা গেছেন। এখন আমার বর আর ভাসুর দেখাশোনা করে।

– তোর শাশুড়ি?

– এখানেই থাকেন। ওপরে। খুব একটা নীচে নামেন না। দিনে একবার বাগবাজারের বাড়ি যান, বাড়িতে রাধাকৃষ্ণের মন্দির, প্রতি অমাবস্যায় কালিঘাট। এমনিতে খুব শক্তপোক্ত। তবে সংসারের ভার আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। পুজো-আচ্চা নিয়ে থাকেন।

– তোর জা আর ভাসুর?

– ওরা বাগবাজারের পুরনো বাড়িতে আছে। বেশ বড় সাবেকি বাড়ি। আমার ভাসুর ঐ বাড়ি ছাড়তে চান না। শ্বশুর মশাই সবাইকে নিয়ে এ বাড়ি আসতে চেয়েছিলেন, বড় ছেলে রাজি

হয়নি। তা ছাড়া ছেলে মেয়েরা কাছাকাছি সব স্কুলে পড়ে।, আমার ভাসুর আর জা'ও একটু ধর্ম কর্ম নিয়ে থাকতে ভালবাসে।

– তোর ছেলে মেয়ে?

– এক ছেলে। দার্জিলিঙে আছে। বোর্ডিং স্কুল।

প্রায় একতরফাই বকে যায় ছন্দা। বরের নাম দিব্যেন্দু। কয়েক পুরুষের ব্যবসায়ী পরিবার। দিব্যেন্দুর ঠাকুরদার আমলে তেলের কল, লোহা লক্করের আড়ত আর একটা প্রেস ছিল। এখনও আছে। সেগুলো ভাসুর দেখাশোনা করেন। এই কন্সট্রাকশনের ব্যবসা শুরু করেছিলেন শ্বশুর মশাই। সেটা রমরমিয়ে চলছে। দিব্যেন্দু নিজে সিভিল এঞ্জিনিয়ার, এই ব্যবসাটা এখন একাই সামলাচ্ছে। ভাসুরের অফিস অন্য জায়গায়, মাঝে মাঝে কাগজপত্রে সই করতে আসেন। সব ব্যবসাতেই সমান ভাগ দুই ভাইয়ের।

ছন্দা ব্রততীর কথা কিছুই জানতে চাইল না। ব্রততীও নিজে থেকে কিছু জানালো না। মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগছিল একতরফা কথায়। মনঃস্থির করে ফেলল এর পর কোনও যোগাযোগ রাখবে না। এই ছন্দা সেই কলেজের ছন্দা নয়। এই ছন্দা বিত্ত বৈভবে আপ্লুত এক বিলাসিনী। রেবা এসে জল দিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে এল ঠান্ডা বাদামের শরবত, সঙ্গে কিছু মিষ্টি। মিষ্টি খেল না ব্রততী। দুপুরে খাওয়ার কথা বলেছিল ছন্দা, এসব খেলে আর কিছু খাওয়া যাবে না পরে। ছন্দা একবার সেই সালোয়ার-কামিজ রেবাকে ডেকে খবর নিল শাশুড়ি খেয়েছেন কিনা। দেড়টা নাগাদ আবার রেবাকে ডাকল ছন্দা, বলল খাবার দিতে। মিনিট পনেরো পরে রেবা এসে খবর দিল খাবার দেওয়া হয়েছে। এই প্রথম উঠে দাঁড়ালো ছন্দা। চেয়ারের সামনেই এক জোড়া চটি রাখা ছিল, সে জোড়াই আবার নিচু হয়ে রেবা এগিয়ে দিল ছন্দার পায়ের কাছে।

– হাত ধুবি তো?

ঘর থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করল ছন্দা। সামনেই একটা বাথরুম। রঙিন টাইল, দেওয়াল। একই রঙের তোয়ালের সেট, শাওয়ার কার্টেন। বেসিনের ওপরে রাখা লিকুইড সোপে হাত ধুয়ে নিল ব্রততী, তোয়ালেতে হাত মুছল।

ঢোকার সময় বাঁদিকে যে ঘরটা দেখেছিল, সেটাই খাবার ঘর। এখানেও এসি চলছে। মনে হয় পুরো বাড়িটাই এয়ার কন্ডিশনড। বিরাট লম্বা এক ডাইনিং টেবিল। মেহগনি, জানালো ছন্দা। একদিকে টেবিলের মাথায় বসল ছন্দা। পাশে ব্রততী। বাড়িতে শাশুড়িকে নিয়ে তিনজন লোক, এত বড় টেবিল তো ফাঁকাই পড়ে থাকে।

এই ডাইনিং রুম রোজ ব্যবহার হয় না – ব্রততীর প্রশ্ন অনুমান করে জানালো ছন্দা। বেশি লোকজন থাকলেই এখানে খাওয়া দাওয়া হয়। কিচেনের পাশে একটা ছোট ডাইনিং রুম আছে, দৈনন্দিন খাওয়া দাওয়া সেখানেই হয়।

টেবিলে বেশ বড় একটা রুপোর থালা ঘিরে গোটা দশেক রুপোর বাটি। সাবেকি কায়দায়। থালায় সুগন্ধী চালের ভাত, এক কোনায় নুন, সদ্য কাটা গন্ধ লেবু। বাটিতে শুক্তো, ছোলার ডাল, পেল্লায় সাইজের ভাজা পার্শে মাছ, এঁচোড়ের ঘন্ট, ধোঁকার ডালনা, চিতল মাছের পেটি, সর্ষে ইলিশ, পাঁঠার মাংস, চাটনি ও মিষ্টি দৈ।

একটু পেছনে রেবা দাঁড়িয়ে। রেবার পাশে সেই দ্বিতীয় সালোয়ার কামিজকেও দেখা গেল। ব্রততী আর ছন্দা টেবিলের কাছে দাঁড়াতেই দুজনে এগিয়ে এসে চেয়ার দুটো একটু টেনে পিছিয়ে দিল বসার জন্য।

ব্রততী আঁতকে উঠল পদের বাহার দেখে,

– আমি পারব না রে ছন্দা, তুই তুলে নিতে বল।
– তুলতে হবে না। যা পারিস খা। জোর করব না। আমাদের রাঁধুনি কিন্তু খুব ভাল। আগে এক বড় রেস্তোরাঁয় কাজ করত। আমার বর ওকে বাড়িতে কাজ দিয়ে নিয়ে এসেছে।

ব্রততী শুধু শুক্তো, ধোঁকার ডালনা আর ইলিশ মাছটা খেল। ছন্দা অবশ্য জোর করল না খুব একটা। ছন্দা নিজে কিছুই খেল না, একটু পার্শে মাছ ভেঙে খেল শুধু। খুব নাকি মোটা হয়ে যাচ্ছে। কথাটা অবশ্য খুব মিথ্যে নয়, ব্রততী ভাবে, কলেজে পড়াকালীন বেশ ছিপছিপে রোগা ছিল ছন্দা। বেশ মিষ্টি চেহারা ছিল, ফ্যাশন ট্যাশন একেবারেই করত না। আর এখন? বেশ মোটা সোটা চকচকে চেহারা হয়েছে। পরনে দামি শাড়ি, গয়না। বাড়ির কাজকর্ম তো কিছুই করে বলে মনে হয় না।

হঠাৎ বাইরে থেকে এক উত্তেজিত কন্ঠস্বর শোনা গেল, পুরুষ কন্ঠ -

– বৌদি কোথায়? আলমারির চাবি দিতে বল, জলদি।

বলতে বলতেই একটি লোক ঘরে ঢোকে। বেশ লম্বা পেটানো চেহারা, ভুরু কুঁচকে প্রথমে ব্রততীকে দেখে তারপর ছন্দার দিকে তাকায়,

– আলমারির চাবিটা দাও তাড়াতাড়ি।

একটু হাসে ছন্দা,

– আলাপ করিয়ে দিই, দিব্যেন্দু, আমার কর্তা। ব্রততী আমার কলেজের বন্ধু, সেদিন তোমাকে বলছিলাম না ...

দিব্যেন্দুর ডান রাতে একটা ফাইল, বাঁ হাতটা একটু তুলে হাল্কা নমস্কার জানায়...

– তাড়াতাড়ি কর দেরি হয়ে যাচ্ছে।

দিব্যেন্দু বেরিয়ে যায়। একটু বিব্রত দেখায় ছন্দাকে,

– দাঁড়া আসছি,

ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে যায় ছন্দা, রেবাও ছোটে পেছনে।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসে ছন্দা, মুখে একটু অপ্রস্তুত হাসি,

– কিছু দরকারি কাগজ পত্র নিতে এসেছিল। খুব ব্যস্ত আছে জানিস, অফিসে উকিল বাবুর সঙ্গে জরুরি মিটিং চলছে। ব্যবসা চলাতে গেলে নানা রকম ঝামেলা তো লেগেই থাকে। পরে একদিন ভাল করে আলাপ করিয়ে দেব। এমনিতে খুব মজার লোক। মিষ্টি খেলি না?
– না রে আর পারব না।

বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নেয় ব্রততী। মনটা বিষিয়ে উঠেছে হঠাৎ। আর একদন্ড থাকতে ইচ্ছে করছে না এখানে। অপমানিত লাগছে নিজেকে। একে একতরফা গল্প, তার ওপর এই ব্যবহার। ঘড়ির দিকে তাকায় ব্রততী,

– আমি এবার রওনা হব বুঝলি?
– না রে, এখন যাবি কি? খেয়ে উঠেছিস একটু বিশ্রাম করে যা। চা, কফি কিছু খাবি?
– ও বাবা, এর পর চা কফি খাবার জায়গা নেই। আসলে আমার বর অফিস থকে ফিরবে, আমার মেয়ের একটু দেরি হবে আজ, নাচের ক্লাস আছে।
– দাঁড়া তোকে বাড়িটা একটু দেখাই, দিব্যেন্দু আর্কিটেক্টদের সঙ্গে বসে সব কিছু প্ল্যান করেছে।

এবারও ছন্দা ব্রততীর স্বামী সন্তান সম্বন্ধে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করল না। বাড়ি দেখালো ঘুরে ঘুরে। সারা বাড়িতে বিলাস এবং বৈভবের চিহ্ন। তিন তলায় নিয়ে গেল শাশুড়ির কাছে, মানুষটি ভাল, সাদা সিধে। মাঝারি মাপের একটা ঘরে বসে আছেন বিছানার ওপর। এ ঘরে এসি নেই, পাখা চলছে। বিছানার পাশে মোড়ায় বসে এক পঞ্চাশোর্দ্ধ মহিলা, বোধহয় শাশুড়ির পরিচারিকা গোছের কেউ।

শাশুড়ি যত্ন করে বসালেন। জিজ্ঞেস করলেন বাড়ির কথা, মেয়ের কথা, মা বাবা কোথায় আছেন ইত্যাদি। হঠাৎ মন ভাল হয়ে গেল ব্রততীর, বেশ অনেকক্ষণ গল্প করল বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে। ছন্দাকে মনে হল একটু অধৈর্য হয়ে উঠছে। শাড়ির আঁচলে কপালের ঘাম মুচছে মাঝে মাঝে। খেয়াল করলেন শাশুড়ি,

– খুব ভাল লাগল তোমার সঙ্গে কথা বলে মা, যাও নিচে যাও। এখানে গরম লাগছে তোমাদের। আমার আবার ঐ মেশিনের ঠান্ডা সহ্য হয় না।

ব্রততী মৃদু আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল, কিন্তু ছন্দা উঠে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে,

– হ্যাঁ মা, ব্রততীকে আবার ফিরতে হবে ...

নীচে নেমে এল দুজনে। ছন্দা চায়ের প্রস্তাব দিল আবার। কিন্তু আর বসতে চাইল না ব্রততী। এবার সত্যিই দেরি হয়ে যাচ্ছে। ট্যাক্সি পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞেস করতে, ছন্দা রেবাকে বলল ড্রাইভারকে ডেকে গাড়ির ব্যবস্থা করতে। ব্রততী বারণ করেছিল, শুনল না ছন্দা। ব্রততী এল গাড়ি অব্দি, পেছনে সেই দুই বডিগার্ড। ড্রাইভার দরজা খুলে দিল। পেছনের সিটে উঠে বসল ব্রততী।

অনেকটা রাস্তা, রাস্তায় বার তিনেক ট্র্যাফিক জ্যামে আরও দেরি হল। বাড়ি পৌঁছে ড্রাইভার দরজা খুলে দিল, নেমে এল ব্রততী। নেমেই দেখল দীপ্ত গাড়ি থেকে নামছে। তখনই পৌঁছেছে। দীপ্তর চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত। হাঁ করে তাকিয়ে আছে গাড়ির দিকে। এই ভয়টাই করছিল ব্রততী, এখন হাজারটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। আর পেছনে তো লাগবেই।

– এই গাড়ি?
– ওপরে চল, বলছি।

দীপ্ত পেছনে তাকায়, ছন্দার গাড়ি অনেকটা এগিয়ে গেছে। ফ্ল্যাটে পৌঁছে আর সময় দেয় না দীপ্ত। বসতে না বসতেই জেরা শুরু হয়,

– তুমি এই গাড়িতে কেন?
– কেন মানে? ছন্দা এই গাড়িতে পাঠাল আমাকে।
– ছন্দা? ছন্দা কি করে এই গাড়িতে তোমাকে পাঠায়?
– কি মুশকিল? এটা ওদের গাড়ি আর ওরা খুব বড়লোক, তুমিই তো সেদিন বললে শাঁসালো পার্টি!

– এটা ছন্দার গাড়ি?

– হ্যাঁ মশাই, আর এই গাড়িতেই আমি ফিরেছি, দেখলে তো?

– কে এই ছন্দা?

– আচ্ছা বিপদ তো? কি আরম্ভ করেছ তুমি? ছন্দা আমার কলেজের বন্ধু। বলেছি তো তোমায়।

– এ গাড়ির মালিক কে জানো?

– মানে?

– এ গাড়ি রাধাকৃষ্ণ ইন্টারন্যাশনাল কন্সট্রাকশন কোম্পানির গাড়ি। এটা কোম্পানির ক্লায়েন্টদের রিক্রিয়েশনের জন্য ব্যবহার হয়। এ গাড়ি আমি চিনি।

– সে কি?

– হ্যাঁ ম্যাডাম।

– এ রকম দেখতে কি আর কোনও গাড়ি থাকতে পারে না?

– না পারে না। গাড়ির নম্বরটা খেয়াল করেছ?

– গাড়ির নম্বর?

– হ্যাঁ, ১২৩৪। এ ধরণের নম্বর এমনিতে পাওয়া যায় না। কাঠখড় পোড়াতে হয়। এ নম্বর আমার মুখস্থ। আচ্ছা এখন বলো তো, ছন্দার হাজ়ব্যান্ডের নাম কি?

– দিব্যেন্দু, পুরো নাম জানিনা।

– ও মাই গড!

মাথায় হাত দিয়ে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে দীপ্ত।

– কি হল?

– শোনো তোমায় পুরো ব্যাপারটা বলছি। ভেরি কনফিডেনশিয়াল, কিন্তু তোমার এখন জানা দরকার। কিন্তু প্রথমে বলো, ছন্দা কি জানে, তুমি কে? মানে ও কি জানে তুমি আমার স্ত্রী?

– না, ও তো তোমার কথা কিছু জিজ্ঞেসই করেনি।

– আমার একটু সন্দেহ হচ্ছে। এতদিন পর হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা। বাড়িতে নেমন্তন্ন?

– তুমি কিন্তু ভীষন আবোল তাবোল বকছ!

– ওকে। বলছি। মন দিয়ে শোনো। রাধাকৃষ্ণ ইন্টারন্যাশনাল কন্সট্রাকশন কোম্পানির মালিক দুই ভাই। বড় শুভেন্দু শেখর এবং ছোট দিব্যেন্দু শেখর। ছোট ভাই চেয়ারম্যান, কোম্পানি ঐ চালায়। বাবা নবেন্দু শেখর আগে চেয়ারম্যান ছিলেন। মারা গেছেন। কোম্পানির প্রতিষ্ঠা নবেন্দু শেখরের হাতেই। ভালই চলছিল যতদিন বুড়ো বাবা বেঁচে ছিলেন। দিব্যেন্দু কর্ণধার হতেই বাঁকা রাস্তা ধরল। সব ডিটেলস বলতে গেলে প্রচুর সময় লাগবে, তাই সংক্ষেপে বলছি, কয়েকটা খুব বড় সরকারি কাজ ওদের দেওয়া হয়েছিল। বেশির ভাগই হাইওয়ে এবং ব্রীজ। বড় মুনাফার আশায় দিব্যেন্দু কারচুপি শুরু করল যেমন বাজে মাল দেওয়া, হিসেবে গরমিল দেখানো। প্রথম দিকে ধরা পড়েনি। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের অফিসাররাও তো ইনভলভড। সেই সময়টা প্রচুর টাকা কামিয়েছে কোম্পানি। কিন্তু লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। ইদানিং কয়েকটা মেজর ইস্যুতে ফেঁসে গেছে। ব্রীজ একটা কোলাপস করেছে আদিবাসী অঞ্চলে, বেশ কিছু লোক মারা গেছে। হাইওয়ের যে অংশটা ওরা করেছিল, সেটা তিন জায়গায় ধসে গেছে। পার্লামেন্টে প্রচুর হৈচৈ হয়েছে এ নিয়ে। কাগজে দেখে থাকবে। গত মাসে ইনভেস্টিগেশন কমিটি বসানো হয়েছে। এর মধ্যেই রিপোর্ট বেরোবে। আর যেটা তোমার জানা দরকার সেটা হল যে আমি এই কমিটির চেয়ারম্যান।

– বল কি?

– তাই তো বলছি। ওদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। সমস্ত সাক্ষীসাবুদ ওদের বিরুদ্ধে। বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম।

– কি হবে?

– প্রথমে তো ওদের ব্ল্যাক লিস্টেড করা হবে। আর কোনও কাজকর্ম ওরা পাবেনা। তাতে ওদের এই ব্যবসা উঠে যাবে। দ্বিতীয়তঃ ক্ষতিপুরণের সিদ্ধান্ত যদি হয়, তবে বিষয় সম্পত্তি ক্রোক হতে পারে। আর ফাইনালি, ক্রিমিনাল নেগলিজেন্সের জন্য জেলও হতে পারে।

– এ মা। বেচারা ছন্দা!

– সত্যি কি বেচারা? ভেবে দেখ তো। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যে তুমি কে সেটা জেনেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তোমাকে বাড়ি নিয়ে গেছে। তোমার ধ্রুতে আমাকে অ্যাপ্রোচ করার ইচ্ছে হয় তো।

– অত সোজা নয়। তুমি আমাকে পুরো ব্যাপারটা বলে ভাল করেছ। আমি আর ওদেরকে কাছে ঘেঁসতে দেব না।

– ঐ গাড়িতে যদি তোমাকে কেউ দেখে থাকে, তবে কিন্তু আমি একটা অস্বস্তির মধ্যে পড়ব। শত্রুর অভাব কিন্তু নেই আমার। এ ধরনের বেশ কিছু কেস হ্যান্ডেল করেছি আমি আর প্রচুর বন্ধু খুইয়েছি।

– আমার কিন্তু মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা কাকতালীয়।

– কেন কি করে?

– দেখো, সেদিন ছন্দা এখানে বেশিক্ষণ বসল না। মনে হচ্ছিল এখান থেকে যেতে পারলে বাঁচে। যদি কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে আসত, তবে বসত এবং তোমার সঙ্গে আলাপ করে যেত। সত্যি কথা বলতে কি ও একবারের জন্যও তোমার বা মিন্টির কথা জিজ্ঞেস করল না। ওদের বাড়িতেও না।

– তবে তোমাকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেল কেন?

– ওর বৈভব দেখাতে। সারাক্ষণ তো নিজেদের ব্যবসা আর ধন সম্পত্তির গল্পই করল। বাড়ি দেখালো ঘুরে ঘুরে। রাজকীয় কায়দায় খাওয়ালো...

– সেটা অসম্ভব নয়। তবে সন্দেহ একটা থেকেই যায়।

– আর দিব্যেন্দু, ছন্দার বর তো আমাকে পাত্তাই দিল না। যদি আমার পরিচয় জানত, তবে একটু খাতির করত আশা করি।

– দিব্যেন্দুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে না কি?

– হ্যাঁ কি সব কাগজ পত্র নিতে এসেছিল। আমার সঙ্গে তো ভাল ভাবে কথাই বলল না। আমার খুব খারাপ লেগেছে। তাই বলছি, যদি ও জানত আমি কে, তবে অত অভদ্র ব্যবহার করত না।

– গুড পয়েন্ট। কোথায় দেখা হল?

– আমরা তখন খেতে বসেছি। হঠাৎ হন্তদন্তঃ হয়ে ঢুকল, ঢুকেই বেশ কড়া মেজাজে ছন্দাকে বলল আলমারির চাবি দিতে। ছন্দা আলাপ করিয়ে দিল আমার সঙ্গে, ভাল করে আমার দিকে তাকালো না পর্যন্ত। আমার খুব খারাপ লেগেছে ছন্দার বরের ব্যবহার। তবে খুব টেন্সড মনে হচ্ছিল। পরে ছন্দা বলল যে কি একটা কেসের ব্যাপারে উকিলের সঙ্গে মিটিং চলছে। আমার তো এখন মনে হচ্ছে তোমার এই কেসটা নিয়েই হয়তো।
– হতে পারে, জানিনা। কিন্তু সাবধান। এর পরে যদি যোগাযোগ করে বলে দিও ব্যস্ত আছ।
– ঠিক আছে তুমি চিন্তা কর না। বসো, আমি চা নিয়ে আসছি। একটু সময় দিতে হবে কিন্তু, আমার ফিরতে এত দেরি হবে বুঝতে পারিনি।

ব্রততী বেরিয়ে যায়, রান্নাঘরে ঢোকে। ছন্দাটার জন্যে খারাপই লাগছে। বেচারার তাসের ঘর ভেঙে পড়তে আর দেরি নেই। আবার অনুকম্পাও হচ্ছে এই ভেবে যে এত বর আর বরের ব্যবসার কথা বললি সারা দুপুর ধরে, কিন্তু তোর বরের ভবিষ্যৎ তো এখন আমার বরের হাতে।

চায়ের জল বসায় ব্রততী। একটু আলু বের করে ধুয়ে, ছাড়িয়ে কেটে রাখে এক পাশে। দেরাজ খুলে ময়দা বের করে। আজ একটু লুচি তরকারি করে দেবে চায়ের সঙ্গে। অনেক দিন বিকেলের জলখাবারে লুচি হয়নি। আজ একদিন হলে কিচ্ছু হবে না। এত লুচি খেতে ভালবাসে দীপ্ত।

ছবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অদিতি কবির খেয়া

এ বছরের শুরুতে শাহবাগে যখন রাজাকার বিরোধী আন্দোলন শুরু হল, তখন অনেকের নজরের কেন্দ্রে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হয় ১৯২১ সালে ঢাকার নবাব পরিবারের উদ্যোগে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে সংবর্ধিত হয়েছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এখানে শিক্ষক ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, যিনি আমাদের জাতীয় কবি। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত প্রতিটি প্রগতিশীল আন্দোলনে এখানকার ছাত্রদের ভূমিকা বিরাট। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী শহিদ হয়েছেন। আসুন আমি আপনাদের এই ক্যাম্পাসের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্থান।

গাছপালার ছায়ায় অদূরে দেখা যাচ্ছে একটি ভাস্কর্য, নাম - অপরাজেয় বাংলা। ৬ ফুট বেদির ওপর ১২ ফুট ভাস্কর্যটিতে আছেন দু'জন পুরুষ ও একজন নারী। একজন লুঙ্গি পরা - মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনতার প্রতীক, ট্রাউজার্স পরা যুবকটি ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা এবং চিকিৎসার বক্স কাঁধে চিরন্তন সেবিকা নারী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্রের সাথে ভাস্কর্যটি মিলেমিশে আছে। পিছনে যে ভবনটি দেখছেন, ওটা কলাভবনের অংশ বিশেষ।

এটি চারুকলা ইন্সটিট্যুটের সামনের অংশ। এই ইন্সটিট্যুট সবসময়ই সব শাসকদের কোপানলে পড়ে, কেননা লেখার চেয়ে ছবি অনেক বেশি শক্তিশালী। একুশে ফেব্রুয়ারির আগের রাতে এই ইন্সটিট্যুটের ছাত্রছাত্রীরা সমস্ত ক্যাম্পাসে সারা রাত্রি জেগে আল্পনা আঁকেন। পয়লা বৈশাখ যে শোভাযাত্রা বের হয়, সেটার উদ্যোক্তাও তাঁরাই। এখানকার ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে ইন্সটিট্যুটের উল্টো দিকে 'ছবির হাট' শুরু হয়েছিল।

যাঁদের ফেসবুকে ঢাকার বন্ধুবান্ধব আছে, তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন কেউ কেউ ছবির হাটে যাবার কথা লিখেছেন। ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি একদল নবীন শিল্পী নিজেদের ছবি নিজেরাই বিক্রি করার প্রয়াসে কোন এক শুক্রবার 'ছবির হাট'-এর সূচনা করেন। এখন এখানে শুধু ছবিই বিক্রি হয় না, দিনের শেষে অনেকে এখানে এসে আড্ডা দেন। ছবিতে 'ছবির হাট'-এর ভেতরটা দেখা যাচ্ছে।

বিদ্রোহী কবি লিখেছিলেন- "মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই / যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।।" লাইন দু'টিকে স্মরণ করে তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে কবর দেওয়া হয়েছে। চাইলে যে কেউ কবির কবরে ফুল দিতে পারেন।

টিএসসির সামনে যে উঁচু ভাস্কর্যটি দেখতে পাচ্ছে, সেটার নাম রাজু ভাস্কর্য। ১৯৯২ সালের ১৩ মার্চ সন্ত্রাসের প্রতিবাদের মিছিলে তাঁকে লক্ষ্য করে ছোড়া গুলিতে নিহত হন মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের মঈন হোসেন রাজু। তাঁর স্মরণে এই ভাস্কর্য প্রতিবাদের প্রতীক।

এটি গুরুদোয়ারা নানকশাহী। শুনেছি সম্রাট জাহাঙ্গিরের আমলে ষষ্ঠ শিখ গুরু হরগোবিন্দ সিং শিখ পুরোহিত আলমাসাতকে বাংলায় পাঠায়, তারই চেষ্টায় এখানে গুরুদোয়ারাটি হয়েছে। বাংলাদেশে এটা ছাড়াও আরও ২/১টি গুরুদোয়ারা আছে।

এটা শাহবাগের ছবি। অবাক হলেন? ভাবছেন কোথায় সেই প্রতিবাদী মানুষগুলো? এটা আসলে শাহবাগের একটি শান্ত মুহূর্তের ছবি। শাহবাগের জায়গাটি ছিল ঢাকার নবাব পরিবারের। যে বড় ভবনটি দেখছেন সেটি প্রাক্তন পিজি হাসপাতাল, যা এক সময় পরিচিত ছিল হোটেল শাহবাগ নামে।

ইফতারির ঝোঁকে হালিমের কিসসা

তনুশ্রী মুস্তাফি

অলহামিদুল্লাহ... অলহামিদুল্লাহ !!! গোটা ফ্রেজার টাউনের এমুড়ো থেকে ওমুড়ো তিন চার চক্কর পাক লাগিয়ে ফেলেছি সারা সন্ধ্যে ধরে গোটা কুড়ি-বাইশ নোলা সকসকে খাই খাই করে চলা খাদ্যরসিক তথা পাগল, ভয়ানক পরিশ্রমবিমুখ আমার কর্তা মায় পাঁচ বছরের ছেলেটাকে সাথে নিয়ে। অন্য সময় এ ধৈর্যের কণামাত্র দেখালেও বোধহয় একটা অলিম্পিক মেডেলও জোগাড় হয়ে যেত, কিন্তু কপাল! মনটা চিরকাল নালে-ঝোলেই রয়ে গেল, গাল ভর্তি নবাবি সুখাদ্য আর ঠোঁটে ভগবানের নাম নিয়েই আপাতত সন্তুষ্টি।

মানুষ আজব জাতি, একদিকে ত্যাগও মানে আবার ভোগটাকেও ঠিক ছেড়ে উঠতে পারে না। হিন্দুদের ব্রত-উপবাস হোক বা ক্রিশ্চানদের লেন্ট কি মুসলিমদের এই রমজান মাস, একদিকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদি দেহজ বাসনাকে কি অপরিসীম শাসন আর আরেকদিকে উৎসব ... প্রাণের, মনের, প্রাচুর্যের। যে সারাদিন থুতুটুকুও না গিলে রোজা রাখছে, সূর্য ডোবার পর পরিবার-বন্ধুকে নিয়ে ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে-ই আবার মেতে উঠছে খাদ্যবিলাসে, সুদূর দক্ষিণ ভারতে ইফতারির মেলায় হাঁটতে হাঁটতে বাহবা দিতে ইচ্ছে করে হায়দ্রাবাদের সেই নবাবকে যিনি প্রথম আরব ও পারসিয় রীতিনীতিকে মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখে শুরু করেছিলেন হালিম চর্চা। কিন্তু হালিমের গল্প পরে, আগে ছোট্ট বর্ণনা দক্ষিণ ভারতীয় ইফতারির।

ফ্রেজার টাউনে ঢুকতেই প্রথমে বামদিকে পরে আলবার্ট বেকারি। বেঙ্গালুরুর সব চাইতে পুরনো বেকারিগুলোর মধ্যে অন্যতম, বয়স হলো বোধহয় কম-বেশি একশ বছর।

ইফতারির সময় তো বটেই, বছরের অন্য সময়ও নাকি আগে থেকে অর্ডার না দেওয়া থাকলে অর্ধেক জিনিস পাওয়াই যায় না। সৌভাগ্যক্রমে আমরা এসেছি একপাল ভোজপাগলের সাথে, দলপতি দুটি মেয়ে যারা এই 'ইফতারি ওয়াক'- এর জন্য সরেজমিন তদন্ত আর প্রস্তুতি চালিয়েছে আগের এক সপ্তাহ ধরে। তাই বেকারিতে আগের দিন সন্ধ্যেবেলাতেই অর্ডার হয়ে গেছে আমাদের জন্য... কিমা নান, সামবুসকা, ভেজা পাফ আর খোয়া নান।

কিমা নান হচ্ছে মুচমুচে পরতওয়ালা পরোটা যার ভেতরে আছে কষে কষা পাঁঠার মাংসের কিমা। সামবুসকা আরবীয় হলেও আসলে আমাদের চেনা শিঙাড়াই, শুধু ভেতরে আছে মুরগি অথবা পাঁঠার মাংসের কিমার পুর। ভেজা পাফ হচ্ছে ছাগল বা ভেড়ার মগজ পাফ পেস্ট্রি দিয়ে মুড়ে বেক করা.... মগজ শুনে ওয়াক তুলে সরে গেলে আপনারই ক্ষতি, একটু সাহস করতে পারলে বুঝবেন কি খেলেন, গরম পেস্ট্রির পরত ভেঙে কুড়মুড়ে কামড় বসলে জিভের উপরটা ঢেকে যায় গরম গলে যাওয়া জেলিতে। আচ্ছা নাক সিঁটকোচ্ছেন কেন বলুন তো মশাই? রুই মাছের মাথা সাপটে ধরে ঘিলু খান না? কিংবা গলদা চিংড়ির? তাহলে ছাগল বেচারি কি দোষ করল শুনি? হুঁ হুঁ যত্তসব দ্বিচারিতা. যাক গিয়ে, শেষ পাতে হচ্ছে খোয়া নান।

কলকাতায় মুঘলাই দোকানে একটা মিষ্টি পরোটা পাওয়া যায় খেয়েছেন কখনও? ব্যাপারটা খানিকটা সেই রকমই কিন্তু আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে, নানটাকে মেখে নিয়ে দুভাগে লেচি করে বেলে নেয়, মাঝখানে দেয় এক থাবা খোয়া। এবারে লেচির চারদিক মুড়ে উনুনে সেঁকে নিলে ওই মাঝখানের খোয়াটা গলে জমাটি ক্রিম হয়ে যায়, আহ্ মুখে দিলে মনে হয় যেন ঘন ক্ষীরে লুচি ডুবিয়ে খাচ্ছি।

এর পর হাঁটতে হাঁটতে এম এম রোড। চৌমাথার যেদিকে তাকাই ফুটপাথ জুড়ে শুধু খাবারের দোকান। এক একটা জায়গায় তাঁবু খাটানো হয়েছে, ভেতরে অন্তত শ'পাঁচেক লোক, বললে বিশ্বাস হবে কিনা জানিনা কিন্তু সত্যি মনে হচ্ছিল ঘন কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি এক অতিকায় শ্মশানে,

ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে সবকিছু অনেকটা যেন সিনেমার স্বপ্নদৃশ্যের শুটিং মনে হচ্ছিল। চারিদিকে শুধু আগুন জ্বলছে আর ঝলসানো হচ্ছে মাংস। পা ফেলা যায় না এমন ভিড়, কিন্তু কোনো ধাক্কাধাক্কি বা অসভ্যতা নেই।

প্রথমেই খেলাম এক কাপ করে গরম গরম হারিরা...এটা হল গিয়ে ওই মানে বাদামের শরবত। আমন্ড, পেস্তা, কাজু, চারমগজ, দুধ, নারকেলের দুধ আর এলাচ গুঁড়ো ভালো করে পিষে মিশিয়ে গরম ঘিয়ে ফোড়ন দিয়ে তৈরি হয় হারিরা। স্বাদ কিছু বলবার নেই মশাই, মনে হয় স্বর্গের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। তবে বাপু বড্ড মিষ্টি, হারিরা খেয়ে খিদেতে বেশ করে শান দিয়ে নেমে

পড়া গেল ভুরিভোজে। প্রথমে নীর ধোসা আর অফাল। নীর ধোসা হচ্ছে অনেকটা আমাদের চালের রুটি আর অফাল হচ্ছে নাড়িভুঁড়ি-জিভ ইত্যাদি তুলনায় কম লোকপ্রিয় মাংসের ছাঁট।

তবে ট্যাং ট্যাং করে চাটু ঠুকতে ঠুকতে পাঠান ভাই যা কষেছিল না মাংসটা, খাওয়া ওখানেই জমে ক্ষীর। এখানকার রীতি মেনে তুখোড় ঝাল আর একটু টক দিয়ে কষে কষা মাংস আর দুধসাদা নরম ভাপানো কোনরকম স্বাদহীন (Bland) ধোসা.... নবাবজাদাকে এখান থেকেই লম্বা কুর্নিশ জানালাম এই হায়দ্রাবাদি ঘরানা তৈরির জন্য।

এরপর এল কাবাবেরা একে একে পাতে পাতে।

টিক্কা কাবাব, টুন্ডা কাবাব, বটি কাবাব, রেশমী কাবাব, শিক কাবাব, উটের মাংসের কাবাব, হরিয়ালি কাবাব, পাথর কে কাবাব (জরানো মাংস সেঁকে নেওয়া হয় প্রচন্ড গরম পাথরে), গরুর মাংসের কাবাব, আস্ত আস্ত ভেড়া, তিতির আর মুরগি ঝলসানো।

উঁহু আইঢাই করলে চলবে না, এ তো সবে শুরু যাকে বলে স্টার্টার। এরপর আছেন দুই মহারাজা – বিরিয়ানি আর হালিম। এ কিন্তু আমাদের কলকাতা বিরিয়ানির মতো অত পরিশীলিত স্বাদু নয়, রীতিমতো তেঁতুল আর লঙ্কা দেওয়া ছোট কালোজিরে চাল দিয়ে বানানো অম্বর বিরিয়ানি। এতটাই ঝাল যে কান দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যায়, উস্‌আস করতে করতে চুমুক দিতে হয় সাথে দেওয়া পাতলা জলের মতো ঠান্ডা রায়তাতে। কিন্তু নাহ, এ আমার কলকাত্তাই জিভকে খুব বেশি মুগ্ধ করতে পারেনি, বরং সেটা পেরেছে হালিম, একটু বেশি মাত্রাতেই পেরেছে। মোটমাট তিন রকম হালিম পাওয়া যায় – গরুর মাংসের, মুরগির মাংসের আর মেওয়া দিয়ে মিষ্টি হালিম। তৃতীয়টি তুলনায় দুর্লভ। এককথায় বোঝাতে গেলে হালিম হচ্ছে মাংসের ডাল কিম্বা ডালের মাংস কিম্বা

ডালে-মাংসে এক অপূর্ব মিলন। মাংসের ছেঁড়া টুকরো, বিভিন্ন ডাল আর ভাঙা গম অন্তত বারো ঘন্টা ধরে দমে রান্না করে তৈরি হয় হালিম, ওস্তাদের মতে এ রান্না নাকি বাড়িতে সম্ভবই না (বলা বাহুল্য আমি মোটেই এ কথায় পাত্তা দিইনি, আপনাদেরও না দেওয়াই ভালো)। গরুর মাংসের হালিম একদম কুচকুচে কালো দেখতে আর মুরগিরটা একদম সাদা। জিজ্ঞেস করলাম এটা সাদা কেন? ছেলেটি অপার বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল কেননা মুরগির মাংস সাদা হয়। কিছু বলার নেই, অকাট্য যুক্তি। যাইহোক পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম কিছু কিছু দোকানে মুরগির হালিমে দুধ দেওয়া হয় অল্প, সাথে দেওয়া হয় লেবু, আদা, বিরিস্তা (ভাজা পেঁয়াজ), ধনেপাতা আর কাঁচা লঙ্কা, যেটা যতটা আপনার পছন্দ। স্বাদ মোটেই ঝাঁকি দিয়ে যাওয়া ঝাল বা নোনতা বা টক নয়, একটা অদ্ভুত পেলব মাংসের নির্যাস আর হালকা মশলার গন্ধ.... আপনার চারপাশ ভুলিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ভুলতে ভুলতেও ভোলা চলবে না কিন্তু মিষ্টির কথা, পাবেন শাহী টুকরা(পাঁউরুটি ভেজে ক্ষীরে ডোবানো), খুবানী কা মিঠা (খেজুরের হালুয়া), ডাবল কা মিঠা, শির কোর্মা, ক্যারামেল পুডিং, ফিরনি আর চিজকেক। এ বছরই নতুন এসেছে মিনিমেল্ট আইসক্রিম।

আমি খুব একটা ভক্ত নই আইসক্রিমের কিন্তু এক চামচ মুখে দিয়েই আমার আর আমার ছেলের লড়াই বেঁধে গেলো আইসক্রিমের অধিকার নিয়ে। জিনিসটা দেখতে অনেকটা বোঁদের মতো। একটা কাপে ঠাসাঠাসি করে দেওয়া, প্রতিটি রঙের বোঁদের স্বাদ আলাদা। বাড়িতে এসে নেট ঘেঁটে যা জানলাম সেটা হচ্ছে খুব ঘন ঘন দুধে আইসক্রিম বানিয়ে সেটাকে বিন্দু বিন্দু করে ফেলে তরল নাইট্রোজেন দিয়ে জমিয়ে ফেলা হয়, এইভাবে তৈরী হয় মিনিমেল্ট। ভারতে একদমই নতুন স্বাদে অতুলনীয়। স্বাদের থেকেও বেশি বোধহয় টেক্সচারে। এ ছাড়াও খাওয়া যেতে পারে খেজুর।

আশেপাশে প্রচুর দোকান যেখানে খেজুর পাওয়া যাচ্ছে অন্তত তিরিশ রকমের, প্যাকেটবন্দি করলেই হল।

সব শেষে বাড়ি ফেরার পথে সুলেমানি চা. লেবু আর পুদিনা পাতা দিয়ে বানানো ভেষজ চা। শরীরে উত্তাপ আর মনে শান্তি নিয়ে আসে। সন্ধ্যাশেষের আড্ডা সেরে ক্লান্ত পা এবার বাড়ির দিকে, কাল রোববার, আজকের ছাঁদাবাঁধা খাবার খেতে খেতে খুঁজে বের করব হালিমের ইতিহাস আর রেসিপি।

বেঙ্গালুরুতে হালিম নিয়ে আসে পিস্তা হাউস, হায়দরাবাদ থেকে। এরা এতটাই বিখ্যাত যে এদের দাবি রমজানের মাসে হালিম এরা গ্রামে বা কিলোতে নয়, টন টন বিক্রি করে। শুধু আশেপাশে নয়, এদের হালিম রপ্তানি হয় বিদেশেও। ছোট্ট ঘুপচি দোকান, কিন্তু চলে অদ্ভুত মসৃণতায়। তবে এদের বিরোধীও প্রচুর যারা বলে পিস্তা হাউস হালিমের স্বাদ এবং টেক্সচার দুটোই পাল্টে দিয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে সেটা পিস্তা হাউসও অস্বীকার করে না বরং বুক বাজিয়ে বলে। যখন হায়দরাবাদের মদিনা হোটেল প্রথম বাজারে সবার জন্য হালিম বেচতে শুরু করে তখন ব্যাপারটা কিন্তু আজকের মতো এত ঘি-মশলার প্রাচুর্য ছিল না। নাহ উল্টোদিকে হাঁটছি, গল্পটা একদম শুরু থেকেই শুরু করা যাক।

আল-কুয়েতি বংশের সুলতান সাইফ নওয়াজ জং প্রথম তার ইফতারি ভোজে হালিম পরিবেশন করেন আরবি সুখাদ্য হিসাবে। মূলত আরবি এবং পার্সিয়ান লোকেরা যারা ভাগ্যসন্ধানে এসে জুটেছিল হায়দরাবাদে এবং পরে এদেশেই বিয়ে থা করে মিশে গিয়েছিল, তাদের হাত ধরেই আসে হালিম। আশ্চর্য হলেও হালিম একমাত্র খাবার যাতে তেলেঙ্গানা কোনভাবেই তার নিজস্বতা (অর্থাৎ কিনা তেঁতুল ও লঙ্কা) মিশিয়ে দেয়নি (ভাগ্যিস!)। তখনও অবধি এটা ছিল সমাজের উচ্চমার্গের ভোজের খাবার, পরের দিকে শহরের ইরানি হোটেলগুলো বেচতে শুরু করে হারিসা। যা মেজাজে অনেকটা হালিমের কাছাকাছি হলেও ভারে অনেকটা হালকা আর রান্নাও অনেক সোজা। রসুন, মৌরি, পেঁয়াজ, গোলমরিচ, লবঙ্গ, এলাচ, বড় এলাচ, শাহী জিরা, হলুদ আর মাংস একসাথে সিদ্ধ করে নরম করে নিতে হবে, এবারে ঠান্ডা করে মাংসের হাড় বেছে একেবারে ছিঁড়ে সুতোর মতো ফালি ফালি করে নিতে হবে সুতোর মতো। তারপর এতে খানিকটা আটা মিশিয়ে পিষে বেটে অন্তত একঘন্টা ঢিমে আঁচে রান্না করলেই ব্যস তৈরি। হালিমের মতো তরিবত নেই, স্বাদেও একটু কমা, আবার পেটের পক্ষে তুলনায় কম কষ্টকর। হজমটা তো ও বেচারাকেই করতে হবে। যাক এত বকবক শোনার ধৈর্য কি আর আছে? তার চাইতে বরং হালিমের রেসিপিটাই দিয়ে

ফেলি জিনিস লাগবে অনেক, তবে ঘাবড়াবেন না, রান্না বলতে যে হাতা-খুন্তি নাড়ানাড়ি, পেষা, বাটা, সেঁকা, ছুরি নিয়ে কাটাকুটি বোঝায় সেসব খুব একটা নেই এখানে। নির্ভয়ে নেমে পড়ুন মাঠে, থুড়ি রান্নাঘরে।

উপকরণ:

হাড়ছাড়া মাংস – ১ কেজি

ডালিয়া – ৩ কাপ

আদা-রসুন বাটা – ৪ বড় চামচ

কাঁচা লঙ্কা – ৩

সদ্য কুরোনো নারকেল – ৫ বড় চামচ

বিউলির ডাল – ১ কাপ

অড়হর ডাল – ১ কাপ

বাসমতি চাল – ১ কাপ

লাল লঙ্কা গুঁড়ো – ১ বড় চামচ

হলুদ(খরচা সামলাতে পারলে জাফরানই, বেশি না ১ গ্রাম মাত্তর) – ১/৪ বড় চামচ

গোলমরিচ – ১/২ বড় চামচ

চিরঞ্জি – ১ বড় চামচ

শাহিজিরা – ১ বড় চামচ

কাবাব্ চিনি – ১ বড় চামচ

দারুচিনি – ১ টি

লবঙ্গ – ২-৩ টি

এলাচ – ২-৩ টি

ঘি – আধ কাপ

কুচোনো ধনে পাতা – এক কাপ

পুদিনা পাতা – ১/৪ কাপ

নুন – স্বাদ বুঝে

সাজানোর জন্য:

জাফরান – কয়েকটি সুতো

বিরিস্তা (সোনালী বাদামি করে ভাজা পেয়াজকুচি) – ১ কাপ

ভাজা কাজু – আধ কাপ

পেয়াজ ভাজার তেল – ৫ চামচ

ঝিরঝিরে করে কাটা লেবু – ১

ধনেপাতা কুচি – ১ কাপ

প্রণালী:

১. প্রথমে দালিয়া ধুয়ে ভিজিয়ে রাখুন।

২. এবারে মাংসটা প্রেসার কুকারে সিদ্ধ করে নিন। মাংসের সাথে দেবেন অর্ধেক আদা-রসুন বাটা, ১/২ চামচ নুন, লাল লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ আর এক কাপ জল. প্রথমে ১০ মিনিট খুব জোর আঁচে রেখে তারপর আঁচ কমিয়ে ২০ মিনিট সিদ্ধ করুন. এর পর নামিয়ে ঠান্ডা করে মাংস ছিঁড়ে নিন সুতোর মতো ফালি করে। যদি ২০ মিনিটে মাংস সিদ্ধ না হয় তাহলে আরও খানিকক্ষণ সিদ্ধ করবেন যতক্ষণ না একদম নরম হয়ে যাচ্ছে।

৩. এবারে কুকার থেকে মাংসের মিশ্রণটা নামিয়ে নিয়ে মিশ্রণে ডাল, চাল আর দালিয়া দিন। তাতে বাকি অর্ধেক আদা-রসুন বাটা, হলুদ, কাঁচা লঙ্কা, ১/২ বড় চামচ গোলমরিচ, আর ৮-১০ কাপ জল দিয়ে সিদ্ধ করে নিন। সিদ্ধ হলে বেটে নিন মিক্সিতে

৪. এবারে বড় ডেকচিতে ঘি গরম করে ওতে গোটা গরম মশলা আর মাংসের মিশ্রণটা ঢেলে দিন। সাথে দেবেন ১/২ কাপ ধনেপাতা আর নারকেল কোরা। ২-৩ মিনিট নেড়েচেড়ে ভাজুন।

৫. এবারে ৩ কাপ জল দিয়ে ফুটতে দিন ফুটে উঠলে দালিয়ার মিশ্রণটা ঢেলে দিন। এবারে কাঠের হাতা দিয়ে নাড়তে থাকুন যাতে তলায় ধরে না যায়। যদি মনে হয় মিশ্রণ বেশি ঘন হয়ে যাচ্ছে তাহলে কয়েক চামচ করে ঘি মেশান.. শেষে জাফরান দিয়ে নুনটা একবার চেখে নিন আর দরকার আছে কিনা। এবারে অন্তত ১০ ঘন্টা এটা ঢিমে আঁচে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। আমাদের মতো গ্যাসের ক্রমে বেড়ে চলা দামে জর্জরিত বাঙালির পক্ষে প্রেসার কুকারে আধ ঘন্টা সিদ্ধ করাই যথেষ্ট।

৬. সব শেষে বড় পাত্রে ঢেলে রাখুন। পাশে ছোট বাটিতে সাজানোর উপকরণগুলি রাখুন। যখন পরিবেশন করবেন তখন যে যার রুচিমত সাজানোর উপকরণগুলি নিজের পাতে নিয়ে নেবেন।

এবার পুজোয় হবে নাকি নবাবি ভোজ?

চাঁদের পথ-নির্দেশিকা

অঞ্জন ঘোষ

কাঁকিলুয়া থেকে পোয়া পশ্চাৎ কোণে
কাকাতুতো মাসি রোজ কাঁচকলা বোনে ।
তারই থেকে গজে পাঁচ-সাত মাথা গেলে
চানাচুর গাছ নাকের সামনে ফেলে ।
পিলে আঁৎকালে দেখা পাবে কাঁচা মামা
গায়ে দিয়ে রাঙা ভাঙা দুই খানা জামা ।
কিলবিল করে নাচে হাতে বই খুলে
দুম দাম তোলে হাই তাই ঘাসে ঝুলে ।
টপকিয়ে তাকে হামাগুড়ি দিয়ে যদি
পার হ'তে পারো চাল কুমড়োর নদী ।
বারো খানা কিলে কাঁকরোল দিলে চুলে
সব গান যদি একদম যাও ভুলে -
এঁচোড় গাছেই দেখতে পাবেই খই
সেখানে থাকবে চাঁদে ছুটবার মই ।
যদি দেখ তার চিহ্ন কোথাও নেই
দেড়শ গোনার পালা শেষ হবে যেই-
পিছনদিকেতে ঠিক দশ হাঁটু হেঁটে ,
পথ যদি দেখ একদম গেছে ঘেঁটে ।
বুঝবে এবার ঘরেতে ফেরার পালা
চাঁদে পৌঁছাতে কত খানি চাঁদু জ্বালা।

চলছে পুজোর অবকাশ

অনুভব বক্সি

মাথার ভিতর কথার চাষ- গল্পবুড়ো করছে বাস,

দিচ্ছে নতুন গল্প শোনার সাদর ডাক,

আয় না একটু বোস না ঐ, নতুন নতুন গল্প কই;

কাজের কাজটা একটু না'হয় তোলাই থাক।

এক যে ছিল ভীষণ বাঘ- তার যে ছিল বিষম রাগ;

করতো না সে কাউকে দয়া একটুও;

একটা ঘুড়ি উড়ছিল, চাঁদের বুড়ি গাইছিল,

একটা ছিল কোন সে কালের পাতকুয়ো।

আর কি শুনতে চাইছে মন এখন তবে পদ্য শোন;

ডানাও'লা ছোট্ট পরীর গানগুলো।

বইছে নদী মনজুড়ে পায়রা ঘুরছে রোদ্দুরে;

ঠিক জানি না যাচ্ছি এখন কোন চুলো!

একটা কথা বলছি শোন, ওঠ না ছেড়ে ঘরের কোণ-

চল না একটু আসবি ঘুরে দূরের দেশ।

শিউলি ঝরা পথের ধার, দেখবি নাকি ঐ পাহাড়?

থাকবি সাথে, রাখবি নাকো দুখের রেশ।

দেখছি আলো যে'ই তাকাই, আসছে পুজো ভাবছি তাই-

হাওয়ার তালে এখন কেন দুলছে কাশ;

আসল কথা হচ্ছে এই- মাতছে সবাই শুনছে যে'ই-

চলছে এখন পুজোর নতুন অবকাশ।

নন্দ-জ্যোতিষ সংবাদ

ডাক হরকরা

('হাত গণনা' ছড়াটিতে সুকুমার রায় বলেননি হস্তরেখাবিদটি নন্দ গোঁসাইকে ঠিক কী বলেছিলেন। জ্যোতিষিটি নন্দকে কী কী বলতে পারেন, তার একটা সম্ভাবনা নিয়ে এই ছড়াটি)

ওহে নন্দ দেখছি একি রিষ্টে ভরা রেখা
এমন হাতে বাকি জীবন থাকা আর না থাকা!
এতটা কাল কাটিয়ে দিলে কোন পুণ্য ফলে
এবার তুমি বুঝবে ঠ্যালা ঠেকাবে কোন ছলে?
মঙ্গলটা যেমন দেখি তিনটে ফাঁড়া আছে
প্রথমবারে ভাঙবে হাঁটু চড়তে গেলে গাছে,
দ্বিতীয়বার তেমনটা না ডুবতে পারো জলে
জলের ধারে না যদি যাও দড়ি দেবেই গলে।
এবার ধর ছিঁড়লে দড়ি ভাঙবে তবু পা-টা
তৃতীয়বারে পা-হাঁটু নয় পুড়তে পারে গা-টা
সেসব তুমি এড়াতে পারো আমি বিধান দিলে
তবুও যেন ভাঙবে মাথা আমরই ছোঁড়া ঢিলে।
এবার বলি রাহুর কথা, আছে খারাপ ঘরে -
তার উপরে রবির ছায়া রয়েছে ঘাড়ে চড়ে
আহা নন্দ ভয় পেওনা তোমার এমন সাজে ?
হার্টের ব্যমো হাই সুগার এমন কি সে বাজে
আরো খারাপ গুরু তোমার রয়েছে নিচে পড়ে

লিভার ভায়া বেশ ভুগবে পড়বে কালা জ্বরে।

শুক্রগ্রহ শত্রুঘরে কেতু তোমার বাম

হঠাৎ করে ঘুমের ঘোরে ছাড়বে ধরাধাম ।

আহা নন্দ কাঁদছ কেন বলার আছে আরো

বুধগ্রহটি বাচাল বড় লগ্নে পোয়া বারো ।

পটাং করে মাথার স্নায়ু কখন যাবে ছিঁড়ে,

নেপচুনটা হতচ্ছাড়া চাঁদের ঘরে ভিড়ে ,

তবে নন্দ ভয় পেও না শনির দশা এলে

বিনা কষ্টে নিশ্চিন্তে উপরে যেও চলে।

শনির দশা একেই বলে ছাড়েনা ভাই মোটে

শান্তি পাবে যেদিন তুমি পৌঁছে যাবে ঘাটে।

অহনার অজানা যাত্রা

তানবীরা তালুকদার

ঘাড় ত্যাড়া অর্নের বিয়ে নিয়ে বাড়িতে সবাই জেরবার। বাড়ির ছোট ছেলে, অসম্ভব আদুরে আর জেদি। বাড়ির লোক কখনো তার সাথে পেরে ওঠে না, কারণ অর্ন জেদ করে ঠিকই কিন্তু সেগুলো সব ভ্যালিড পয়েন্টে তাই, তার কখনো হার হয় না। আর এভাবে সব ব্যাপারে জয়ী হতে হতে অর্ন হয়ে গেছে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী। পারবে না, হবে না এই ধরনের কোন চিন্তাই আজকাল আর তার মাথায় আসে না। লেগে থাকলে, চেষ্টা করলে সব হয় এই তার বিশ্বাস। নিজে যা সিদ্ধান্ত নেবে তার থেকে তাকে টলানো অনেকটা অসম্ভবের কাছাকাছি। অনেকদিন ধরেই নানা জায়গায় অর্নের মা-বোন-ভাগনি-ভাবি তার জন্যে মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছেন, পাত্র হিসেবে অর্নের বাজারদরও ভালো। সে বেশ সুর্দশন, লম্বা, ফর্সা, নাক মুখ চোখে অনেকটাই কাটা কাটা। মায়ের রূপ পেয়েছে অর্ন। গড়পড়তা বাঙালি ছেলের থেকে দেখতে ভালো বলে মনে মনে তার বেশ অহংকার আছে। পারিবারিক অবস্থাও বেশ গোছানো। দুই ভাই এক বোন। বড় ভাই আর্মিতে আছেন আর বোনের বিয়ে হয়ে গেছে সেই কোন কালে। মেয়ের বাবাদের জন্যে একদম আদর্শ পরিবার, ঝামেলাবিহীন। সুখী মধ্যবিত্ত পরিবার অনেকটা জীবনবিমার বিজ্ঞাপনের মতো। ঢাকা শহরের এক মধ্যবিত্ত এলাকায় নিরিবিলিতে তাদের বাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি আর মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি, সব মিলিয়ে বেশ চলে যায় টাইপ পাত্র এখন অর্ন বাজারে। কিন্তু সব মেয়ে দেখাই শেষ পর্যন্ত বিফলে গড়ায়, ছেলের জেদের কাছে।

বেশ কিছুদিন ধরেই অর্ন লেগে রয়েছে তার চাকরির ব্যাপার নিয়ে, দেশের বাইরে যাবে বলে। তাদের বিদেশি ক্লায়েন্ট যখন বাংলাদেশে এল তখন অর্নের ওপরেই তার ডিপার্টমেন্ট ভার দিয়েছিল ক্লায়েন্ট ডিলের। ক্লায়েন্টের সাথে আট দশদিন একটানা থাকতে থাকতে অর্নের সাথে তার বেশ ভাব হয়ে যায়। অর্নের ব্যবহারে ও করিৎকর্মা তৎপরতায় যাকে বলে সে মুগ্ধ। অর্নকে

জিজ্ঞেস করলো, বাইরে শিফট করতে চায় কি না, প্রথমে অর্ন ঠিক বুঝতে না পারলেও, পরে তো হাতে সে স্বর্গ পেলো। তারপর থেকেই সেই কোম্পানিতে একটা জবের কথা হচ্ছে। আজ এটা, কাল সেটা করে হয়েও হচ্ছে না, সময় নিচ্ছে। আজ ফোন ইন্টারভিউ তো কাল ভিডিও ইন্টারভিউ। এই দোটানার মধ্যে অর্ন এখন বিয়ে করতে চাইছে না। আজকাল কেরিয়ার দেখতে দেখতে ছেলেরা কুড়ি শেষ করে ত্রিশের ঘরে পৌঁছে যায় যা আবার অর্নের মায়ের চোখে বড্ড দেরি। তিনি মেয়ে পছন্দ করেন আর ছেলেকে জানান। মাঝে মাঝে তার থেকে কিছু অর্নের চোখে পড়লে কিংবা মায়ের পীড়াপীড়িতে সে রাজিও হয় মেয়ের সাথে কথা বলতে, কিন্তু মানসিকভাবে সে তার মন থেকে সায় পায় না, নিজেকে না গুছিয়ে বিয়ের মত কঠিন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বার জন্যে।

রাতে বাড়ি ফিরে অর্ন খেয়ে দেয়ে নিজের ঘরের লাগোয়া বারান্দায় বসে একটু রিল্যাক্স হয়ে সিগারেটে টান দিয়ে নিজেকে নিয়ে ভাবতে বসেছে, তখন মা এলেন ঘরে। শান্তিমতো মায়ের জন্যে সে সিগারেটটুকুও উপভোগ করতে পারল না। একথা সেকথার পর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শুরু করলেন বিয়ের কথা।

- মেয়ের বাবা ফোন করেছিল, জানতে চায় তুই কবে যাবি মেয়ে দেখতে?

- কোন মেয়ের বাবা, আমি কোথায় যাব?

- ওমা বিয়ে করবি তুই, তো মেয়ের সাথে একবার কথা বলবি না? ঐ যে রামপুরা টিভি ষ্টেশনের কাছে বাসা যাদের?

- কার বাসা রামপুরা টিভি ষ্টেশনের কাছে?

- আরে ঐ যে ভদ্রলোক কন্ট্রাকটারি করে, তিন মেয়ে যার, ছোটমেয়ের বিয়ে দিতে চান, অর্নাস পড়ছে, তোর আপু সেদিন আড়ং এ দেখে পছন্দ করল না?

- ওহ, আম্মা তুমি তো জানো বাংলাদেশের অবস্থা। চাকরি করে নিজেরই চলে না আর বউকে খাওয়াবো কি? আমি হাতে কিছু না জমিয়ে এসব ভেজালে এখন নিজেকে জড়াতে পারব না।

- ভেজাল আবার কি? বিয়ে মানে কি ভেজাল? আর আমরা নেই তোর সাথে?

- যেভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, তাতে এই বেতন নিয়ে আমি কোন বিয়ের ভরসা পাই না আম্মা। তুমি তো জানো আমি আমার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং কম্প্রোমাইজ করতে পারব না। আজ এটা নাই, কাল ওটা দাও, আমার কানের কাছে ফ্যাচাং ফ্যাচাং চলতেই থাকবে, এসব আমি নিতে পারব না।

- আর্শ্চয তোকে কম্প্রোমাইজ কে করতে বলেছে? মেয়েরা অ্যাডজাস্ট করে না? সে বলে না বিয়ে করে থাকবি তুই? আর আমরা নেই তোর পাশে?

- তুমি তো জানো আম্মা, আমি নিজের মতো থাকতে ভালবাসি। টাকা পয়সার ব্যাপারে কারো ওপর ডিপেন্ড করতে আমার ভালো লাগে না। আমি স্বাবলম্বী আছি আর সারাজীবন তাই থাকতে চাই, আমার রোজগার দিয়ে। মানুষকে পারলে দেব, কিন্তু নেব না কখনো।

- আরে, আমরা কি বাইরের মানুষ, আমরা তোর বাবা মা!!!

- সবসময় টাকা পয়সার খটাখটি হলে বাবা মায়েরও বাইরের মানুষ হতে বেশি সময় লাগবে না দেখো।

- তুই সব ব্যাপারে বেশি বুঝে ফেলিস, বুঝলি।

এরপর গজগজ করতে করতে মা চলে যান। কথাবার্তা ক'দিনের জন্যে সেখানেই থেমে যায়। আবার আর একজন সবদিক থেকে আর্কষণীয়া পাত্রীর সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত, সব থম মেরে থাকে। দিন তার নিয়মমতো গড়াতে থাকে। এসব গড়িমসির মধ্যেই নেদারল্যান্ডসে অর্নের চাকরিটা হয়ে গেল। মা এবং পরিবারের সবাই খুবই আনন্দিত হলেন অর্নের মনের আশা পূর্ণ হল বলে। জীবনে উন্নতি করার, ওপরে ওঠার শখ ছেলের বহুদিনের। সাথে মা বেশ দুঃখ পেলেন, ছেলে না বিয়ে করে এ বয়সে বিভূঁইয়ে গিয়ে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাবে বলে। বাড়িতে কোনদিন যে কুটোটি নেড়ে দেখেনি, সে কি করে সেখানে একা হাতে সব সামলাবে? মায়ের সবচেয়ে আদরের ছোট ছেলে। বড় ছেলে হওয়ার এগারো বছর পর, অনেক মানত, অনেক তাবিজের ফল এ ছেলে। মায়ের কান্নাকাটিতে অতঃপর অর্ন মা'কে প্রমিজ করলো, চাকরিতে জয়েন করে একটু গুছিয়ে নিয়েই সে চলে আসবে দেশে। মায়ের পছন্দমতো বিয়ে করে বউ নিয়ে যাবে। তারপর এক স্বর্নালী দিনে স্যুটকেস হাতে সবার দোয়া আর শুভেচ্ছা নিয়ে নতুন ভবিষ্যতের আশায় তেপান্তর পারি দিলো সে।

অর্ন বিদেশ চলে যাওয়ার পর, মেয়ে দেখার ব্যাপারটা অন্যদিকে ঘুরে গেল। এখন যে সে পাত্রী হলে চলবে না, মোটামুটি বড় ঘরের, সুন্দরী পাত্রী চাই। বিদেশ থেকে প্রায়ই ছেলের সাথে আলাপ হয়, পাত্রীর ছবিসহ বায়োডাটা আসা যাওয়া করতে লাগলো। নিজেদের এত ডিমান্ডের মধ্যে অর্ন আর একটা পয়েন্ট যোগ করল, বিশ্বাসযোগ্য কেউ হতে হবে, কারণ অনেকেই বিদেশে আসার লোভে বিয়ে করে তারপর এসে দেখা যায় অনেক ধরনের ঝামেলা বা কেলেংকারি করে সটকে পরে। তাই খুব ফাস্ট কোন মেয়ে না হওয়াই ভালো, আবার বেশি ল্যান্দুও যেন না হয়। পড়াশোনায় ভালো কেউ হতে হবে, কারণ ডাচ ভাষা ঠিকমতো রপ্ত করতে না পারলে কোন ধরনের চাকরি বাকরি পাবে না কেউ এখানে। ততোদিনে বেশ বুঝতে পারছিল অর্ন ইউরোপের

লিভিং স্ট্যান্ডার্ড ভালোভাবে মেনটেইন করতে গেলে, একজনের আয় দিয়ে সেভাবে চলবে না। অর্নের পরিবার আরো বেশি দুর্ভাবনায় পড়ে গেল। কোন মেয়ের পেটের মধ্যে ঢুকে দেখবে তারমধ্যে কি আছে? আজকাল পত্রিকা খুললেই এত রকমের সংবাদ। তারপর এত ধরনের ক্রাইটেরিয়া মিলিয়ে মেয়ে পাওয়া?! অসম্ভব ব্যাপার। একদিন অর্নের ছোটমামি এলেন বেড়াতে। চা খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে বিয়ের কথাই আলোচনা হচ্ছিল। মামি সব শুনে বললেন – "পরিচিতের মাঝে খুঁজেন তাহলে অন্তত কিছুটা নিশ্চিত হতে পারবেন"। এ কথাটি অর্নের পরিবারের সবার বেশ মনে ধরল তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের মধ্যে খোঁজ করতে লাগলেন, খুব পরিচিতজনদের অনুরোধ করতে লাগলেন, তারা খুব ভালো চেনেন এমন পরিবারের মেয়ে খুঁজে দিতে।

এদিকে সেদিকে দেখে যাচাই বাছাই করে তাঁরা কিছু মেয়ে সিলেক্ট করলেন পরিচিতজনদের কাছ থেকে। মেয়ের মেধা যাচাই হলো তার রেজাল্ট আর সাবজেক্ট দিয়ে। নতুন জয়েন করে, বাড়ি গুছিয়ে, নিজেকে গুছিয়ে প্রায় দশ মাস পরে অর্ন দেশে এল বিয়ে করবে বলে। দেশে আসার পর অর্নকে পাত্রীদের লিস্ট আর ছবি দেওয়া হল। কাকে কেন লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার কিছু বিবরণও দেওয়া হল। অর্ন তারপরেও মা-বাবা, বোন ভাগ্নির মতামত জানতে চাইল। তারা লিস্টের মেয়েদের সম্পর্কে কিছু বিবরণ দিল, কাকে কেন তারা সিলেক্ট করেছেন। অর্ন তাদের কথা শুনতে শুনতে হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে বায়োডাটার সাথে দেওয়া ছবিগুলো দেখছিল। বেশি সময় নেই হাতে মাত্র চার সপ্তাহের ছুটি, বিয়ে ছাড়াও আরো অন্য কাজ আছে। শুধু মেয়ে দেখে বেড়ালেই তো তার চলবে না। লিস্ট অনেক শর্ট করতে হবে কিন্তু কিভাবে? ভেবে ভেবে অর্ন মেয়েদের চেহারা ছবির দিকে দিয়ে যাবে না ভাবল, যদিও সুন্দরী একটি বউয়ের স্বপ্ন অন্যান্য আর দশটা বাঙালি ছেলের মতো সেও বুকের গভীরে সবর্দা লালন করেছে। তারপর ভবিষ্যতের কথা ভেবে পড়াশোনাটাকেই গুরুত্ব দেবে ঠিক করলো। এমন সাবজেক্ট থেকে মেয়ে নির্বাচন করবে যাতে নেদারল্যান্ডসে গিয়ে

অল্প পড়াশোনাতেই চাকরি পেয়ে যায়। বিজ্ঞানের ছাত্রী সেদিক থেকে দ্য বেস্ট। লিস্ট থেকে নাম্বার দিয়ে গোল গোল করে এক দুই তিন চার পাঁচ লিখে মা আর ভাবিকে দিয়ে বলল, এখান থেকে মেয়ে দেখা অ্যারেঞ্জ করতে। মায়ের ইচ্ছে প্রথমে গার্মেন্টস মালিকের মেয়েকে দেখতে যাবেন। দুই নম্বরে আছে এক মন্ত্রীর ভাতিজি, তিন নম্বরে মায়ের বান্ধবীর মেয়ে যে রূপসী ও সর্বগুণে গুণান্বিতা। চার নম্বরে আছে ফার্মাসিষ্ট আর পাঁচ নম্বরে ফিনান্স।

এই মেয়ে দেখার ব্যাপারটি নিয়ে অর্ন বেশ অস্বস্তিতে ছিল, তার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মনে অসংখ্য দ্বিধা ছিল। দেখা গেল পরে ব্যাপারটি আসলে অনেক সময় মজাদারও হয়ে থাকে। আজকাল ব্যাপারটি শুধু কনে দেখায় সীমাবদ্ধ না থেকে অনেক সময় পাত্র দেখাও হয়ে যায় সমানতালে। কনের বাবা মা আত্মীয়স্বজনও পাত্রের নানারকম খোঁজ খবর নিয়ে থাকেন, কনেরা নিজেরাও তাদের নিজেদের কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে অর্নের কথা জানতে চাইল।

মায়ের বান্ধবীর মেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো, অর্ন কত মাইনে পায়? তা দিয়ে সেখানে স্বচ্ছলভাবে ভালোভাবে চলে যাওয়া সম্ভব কি না?

কতদিন গিয়েছে সে সেখানে, কতদিনের জব কন্ট্রাক্ট? ওখানে স্থায়ীভাবে থাকবে কিনা কিংবা থাকার কোন সুযোগ আছে কিনা? না থাকতে পারলে কি দেশে চলে আসবে? এসে কি করবে? পুরনো জবে জয়েন করবে? বিজনেস করার প্ল্যান আছে কিনা?

আজকালকার মেয়েরা এতো সচেতেন তাদের ভবিষ্যত নিয়ে, অর্ন ইম্প্রেসড। সে কিছু জিজ্ঞেস করল না, মেয়ের কথারই জবাব দিয়ে গেল।

ফিনান্সতো জিজ্ঞাসাই করে বসল, সুন্দরী বিদেশিনী ছেড়ে অর্ন কেন দেশে এসেছে মেয়ে খুঁজতে, তাও যদি অ্যাফেয়ার থাকতো এক কথা, নইলে দেশে মেয়ে খোঁজার দরকারটা কি? আর কারণটাই বা কি? সেখানে নিয়ে ঘরের কাজ করানোর আর নিজে আরাম পাওয়ার জন্যে?

অর্ন কিছুটা থ' খেয়ে গেল এই আক্রমণাত্মক যুক্তিতে। সে আর সাহস করে বলতে পারল না খামখা সে-ই বা বিদেশিনী বিয়ে করতে যাবে কোন যুক্তিতে?

এই এদিক সেদিক মেয়ে দেখে বেড়ানোর ফাঁকে খুব ক্যাজুয়াল কিন্তু আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গীতে বসে থাকা অহনার ছবির দিকে হঠাৎই অর্নের দৃষ্টিটা আটকে গেল একদিন। লং লিষ্টে ছিলো অহনার এন্ট্রি। অর্ন ছবিটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে জানল, অহনাদের পরিবারকে তাদের পরিচিত সার্কেলের অনেকেই বেশ ভালো ভাবে চেনে। ছোট মামির তো অহনার খালার বাড়িতে দিনরাত আসা যাওয়া আর মাঝে মাঝেই অহনাদের বাড়িতেও যান। ধরতে গেলে অহনা মামির চোখের সামনেই বড় হয়েছে। অর্ন কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করল, কিন্তু অহনাদের বাড়িতে বিয়ের কথা বলার পর অহনার বাবা আগের দিনের মতো মেয়ে দেখানো পন্থায় ভেটো দিলেন। এক বিকেলে তারা এমনি মেয়ের বাড়ি বেড়াতে গেলেন পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে, তখন তাদের সাথে কিন্তু অসম্ভব ভালো ব্যবহার আর আপ্যায়ন করলেন তিনি। মেয়ে সিলেক্টের জন্যে তারা যে যে ক্রাইটেরিয়া নির্বাচন করেছিলেন, অহনা তার সবকিছুই ফুলফিল করে এক গ্র্যাজুয়েশন ছাড়া। সে মাত্র অনার্স সেকেন্ড ইয়ার ফাইনাল দিল। বিদেশে তো পড়াশোনার অনেক সুযোগ, মেয়ে মেধাবী, তার রেজাল্ট বরাবরই ভাল, সুতরাং এটা বড় বাধা হতে পারে না। মেয়ে যত না পছন্দ করেছেন তারা, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি তারা মেয়ের বাবাকে পছন্দ করে ফেলেছেন তাঁর অমায়িকতার জন্যে।

সেদিন এমনি ঘুরে বেড়িয়ে এলেও অর্ন একদিন অহনার সাথে একান্তে আলাপ করার ইচ্ছার কথা তার ভাবিকে জানাল। তার কিছুদিনের মধ্যেই অহনার সাথে অহনার খালার বাসার কোণের একটি ঘরে কথা বলার সুযোগ করে দিলেন অহনার খালাতো ভাইয়ের বউ।

অর্ন জিজ্ঞেস করলো প্রথমেই পড়াশোনার কথা।

অহনা বিন্দাস জবাব দিলো, নোট মুখস্ত করতে করতে সে ক্লান্ত, আজকে পরীক্ষা কালকে টিউটোরিয়াল, পরশু মিডটার্ম। এসব থেকে রক্ষা পেতে বিয়ে করতে চায়, পড়াশোনা তার ভাল লাগছে না একটুও।

“পড়াশোনা না করলে আর কি করবেন” - জিজ্ঞেস করলো অর্ন।

“মানে?” - অহনার অবাক প্রশ্ন ফিরে অর্নকে।

“মানে সময় কাটাবেন কি করে? এনি জব অর হোয়াট? কিংবা সংসারের কাজ রান্না বান্না?”

“কাজ টাজ করতে আমার ভাল লাগে না” - সাদা সাপটা উত্তর অহনার। “রাঁধতে পারি না, কিছুই না, আর রান্নাবান্না ততো ইন্টারেষ্টিং কিছুও আমার মনে হয় না”।

“তো সারাদিন কাটবে কি করে? কিছুতো একটা করতে হবে?”

“সেটাতো কোন সমস্যা নয়। ঘুরতে ভাল লাগে, শপিং করতে ভাল লাগে, মুভি দেখতে ভাল লাগে, পড়ার বই ছাড়া আর সব বই পড়তে ভাল লাগে, গান শোনা ইত্যাদি, সময় কাটানো কোন সমস্যা? সময়তো বরং পাওয়াই যায় না”।

“শপিং করে, বেড়িয়ে, মুভি দেখা এই করেই সময় কাটানোর কথা ভাবছেন?” - অবাক বিস্মিত প্রশ্ন অর্নের।

ঘাড় হেলিয়ে তাতে সম্মতি অহনার, সে তাই ভাবছে।

অর্ন ভাবছিল অ্যাফেয়ার আছে নাকি কোথাও বা সেই ধরনের কিছু জিজ্ঞেস করবে কি করবে না। সাত পাঁচ ভেবে আর এই ডানপিটে মেয়ে ফস করে কি উত্তর দিয়ে বসে ভেবেও সে আর ওইদিকে গেল না। কার বই পড়তে ভাল লাগে, কোন ধরনের মুভি পছন্দ সে আলোচনায় চলে গেল। অহনার সাথে কথা বলে অর্ন খানিকটা দ্বিধায় পড়ে গেল, এই মেয়ে কি আদতে বিয়ে করতে চায়, সংসার করার ইচ্ছে আছে, নাকি বাবা মায়ের প্রেশারে বিয়ে করছে? তাকে অর্ন যা জিজ্ঞেস করছে ঘাড় হেলিয়ে অবলীলায় উত্তর দিচ্ছে, কিন্তু সেই উত্তর তার বিয়ে হওয়ার পক্ষে কাজ করার কোন কারণই নেই। অর্নকে ইম্প্রেস করার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এমন ভাব 'আমার যা বলার বলে দিলাম, এখন পোষালে বিয়ে কর নইলে নাই।' বিয়ের জন্যে একটি ছেলের সাথে আলাপ করতে এসেছে কিন্তু তেমন সাজগোজও নেই যেন বিকেলে কোচিং-এ পড়তে এসেছে টাইপ ভাব। তারপরও পড়ন্ত বিকেলের হলুদ কমলা আলো জানালা গলিয়ে পর্দা গলিয়ে ঈষৎ ঘাড় বাঁকা এই মেয়েটার মুখ চিবুক ছুঁয়ে আছে, সহজ সরল মুখ তার ওপরে ডাগর দুটি চোখে আর্শ্চয এক মায়া মাখানো আছে, সত্যে আর সারল্যে ভরা। তরুণ অর্নের পক্ষে সেই দৃষ্টির মায়া উপেক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠল। যে খুবই বাস্তববাদী ছেলে কিন্তু বার বার তার মনে হল ভনিতা না করা এই মেয়েটি কি যেন রেখে গেল তার কাছে। বয়স কম, বাস্তবজ্ঞানহীন মেয়ে কি বলেছে আর কি বলেনি একান্তে তার সাথে, সেটাকে এতো সিরিয়াসলি নেওয়ার কোন মানে নেই। বাস্তববাদী অর্ন এই প্রথম জ্ঞানতঃ হৃদয়ের কাছে হার মেনে নিল।

পরিবারের সবাই মিলে পাত্রীর যে ফাইনাল সিলেকশন লিষ্ট তৈরি হলো তার তিন নম্বরে অহনা থাকলেও থাকতে পারে। কারণ অন্য পাত্রীরা বাকি সব পয়েন্টে অহনার থেকে অনেক এগিয়ে আছে। পাকা কথা কাকে দেবে সেই আলোচনার এক পর্যায়ে অর্ন অনেকটা না ভেবে নিজের অজান্তে মুখ ফসকে বলে ফেলল,

- চল, ওদের বাড়িতেই না হয় যাই।

মা কি ভাবলেন, কে জানে। কিংবা বিয়ে নিয়ে অর্ন এত নখরা করেছে যে তিনি রিস্ক নিতে হয়ত চাইলেন না, বললেন "ঠিক আছে তোর যেমন ইচ্ছে"।

*_*_*_*_*

অহনা খুবই আমোদপ্রিয় হুল্লোড় স্বভাবের মেয়ে। অনেকের মতে একটু বেশি আহ্লাদিও সে, বাবার বড় মেয়ে বলে আদরের মাত্রাটা একটু বেশি হয়তো কাজ করেছে। ব্যবসায়ী পরিবারে যা হয়, একটু কড়া আবার একটু শৈথিল্যের মধ্যে বড় হয়েছে সে। যখন যৌথ পরিবারে থাকত তখন তার অবাধ স্বাধীনতা ছিল, মা খুঁজে পাবেন তবে তো ধোলাই দেবেন। কিন্তু এখন একক পরিবারে মায়ের হাতের মুঠোয় তার জীবন। যদিও আবৃত্তির ক্লাশ, ইউনিভার্সিটি, বান্ধবী, গল্পের বই, সিনেমা সব মিলে তার জীবন খুব একটা খারাপ কাটছিল না। সারাদিন তার খিলখিল হাসিতে বন্ধু বান্ধবী মহলের সাথে পরিবারের সবাই অনেকটা অতিষ্ঠ ছিল। ভীষণ সিরিয়াস কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে হয়তো, এরমাঝেই অহনা তারমধ্যে একটা বিষয়টা নিয়ে এমন একটা স্টুপিড মার্কা জোক করে বসবে যে রেগে গিয়েও অন্যেরা তখন হেসে ফেলবে। কিন্তু এমন জ্বালা অহনার, বকা খেয়ে মুখ কালো করে ঘুরবে তাহলেও অন্যেরা রেগে যাবেন। ওর কালো মুখটা আবার কেউ মানতে পারে না। সংসারের বড় হওয়ার সুবাদে সবকিছুতে তার মাতব্বরি করার স্বভাব প্রবল। দিনরাত ছোটবোনদের মাথার ওপর ছড়ি তো ঘোরায়ই সে মাঝে মাঝে আশেপাশের বাসার পিচ্চিপাচ্চাগুলোও বাদ পড়ে না তার ছড়ি থেকে। এরজন্যে মায়ের বকুনিও সে অনেক খায়। তবে মায়ের বকুনির ধার ধরলে তো আর তার চলবে না। কি জন্যে মা তাকে না বকেন?

সেদিন দুপুরে কারেন্ট নেই কি গরম কি গরম। এক ফোঁটা হাওয়া নেই কোথাও। রোদের তাপে যেন পুড়ছে সারা পৃথিবী। বিছানায় শুয়ে গল্পের বই পড়বে অসম্ভব, পিঠ পুড়ে যাচ্ছে যেন।

কিন্তু দুপুরটা এতো লম্বা মনে হয়, কোথাও একটা কাকও ডাকে না। অকারণেই মন খারাপ হতে থাকে তার। নাম না জানা কি একটা তীব্র কষ্ট বুকের ভেতর তাকে ছিন্নভিন্ন করতে থাকে।

এই গরমের দুপুরে না ঘুমিয়ে সে লম্বা টানা বারান্দার এমাথা ওমাথা হাঁটছে আর তার প্রিয় কবিতাগুলোকে তার মনের ছন্দে ঢেলে আবৃত্তি করার চেষ্টা করছে কখনো অমিয় চক্রবর্তী এর কাছে

অতন্দ্রিলা, ঘুমোওনি জানি
তাই চুপি চুপি গাঢ় রাত্রে শুয়ে বলি, শোনো,
সৌরতারা-ছাওয়া এই বিছানায়
সূক্ষ্মজাল রাত্রির মশারি

আবার নির্মলেন্দু গুনের সাথে

আমি হয়তো মানুষ নই, মানুষগুলো অন্যরকম,
হাঁটতে পারে, বসতে পারে,
এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যায়, মানুষগুলো অন্যরকম,
সাপে কাটলে দৌড়ে পালায়

নইলে শামীম আজাদ এর মাঝে মিশে গিয়ে

সর্বসাধ্য মনে হলেও
সকল কথা জানতে নেই
সন্ধ্যাবেলার চিহ্নমালার
সমীকরণ করতে নেই কখনো

মা দুপুরের ঘুম শেষ করে উঠে বকতে লাগলেন "তোর রেস্ট হয় কখন? লুকিয়ে লুকিয়ে সারারাত জেগে গল্পের বই পড়বি। দিনে কবিতা নইলে গান আর মুভি, সকালে ইউনিভার্সিটি, এই করে শরীর টিকবে?" ব্যস শুরু হয়ে গেলো বকা, দুপুরে না ঘুমানোও কি করে মায়ের বকুনির একটা বিষয় হতে পারে ভেবে পায় না সে।

এটা খাবে না সেটা খাবে নার বায়নাক্কা তো চলতেই থাকবে। মায়ের দৃষ্টিতে মেয়েদের এমন করলে চলে? নিয়ম নীতির বালাই নেই, হুড়োহুড়ি সারাক্ষণ, চলাফেরায় কোন লক্ষীমন্ত ভাব নেই। কি হবে এ মেয়ের কে জানে? কথাবার্তার ছিরির কথা আর নাই বললেন।

সেদিন সকালে অহনাকে বললেন – "যা তোর দাদিকে গিয়ে বলে আয় ছোটচাচার বাসায় এ সপ্তাহে নিয়ে যেতে পারবো না"।

ফস করে সে বলে উঠলো – "বলতে হলে তুমি বলো, আমি বলতে পারবো না"।

মা রেগে জিজ্ঞেস করলেন – "কেন পারবি না, পাখা গজিয়েছে তোর?"

অম্লান বদনে অহনার উত্তর – "এটা বললে দাদি রেগে যাবে, তাহলে আমার ওপর দাদির বদদোয়া লাগবে। সামনে আমার পরীক্ষা। তোমার তো আর পরীক্ষার ঝামেলা নেই তাই বলার হলে তুমিই বলো। বদদোয়ায় তোমার তো আর কিছু সমস্যা হচ্ছে না"।

ঠাস করে একটা চড় কষাবেন কিনা ভেবে ভেবে মা নিজেকে সামলালেন।

একটু স্পষ্ট বলা স্বভাবের অহনা বন্ধুদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় যারা তার আসলেই বন্ধু। সবার কাছে না। কিছু পছন্দ না হলে, না পেঁচিয়ে ঘুরিয়ে যা বলার বলে দেয় সে। অনেকে এটা পছন্দ করে পেছনে না বলে সামনে বলা আবার অনেকে এই কারণে ওকে সহ্য করতে পারে না। এ কারণে অনেক ঝামেলায়ও তাকে পড়তে হয় বিভিন্ন সময়। নোংরামি তার স্বভাবে নেই, তাই যা

সত্য, সে ভালো হোক কিংবা মন্দ, তাকে গ্রহণ করতে সে সদা প্রস্তুত থাকে। কিন্তু যাকে সে বন্ধু ভাবে তার জন্যে সে প্রাণ অবধি দিতে প্রস্তুত থাকে। প্রয়োজনে বন্ধুদের নোট দেওয়া, বই পড়তে দেওয়া, গানের ক্যাসেট, সিনেমার সাপ্লাইসহ বিভিন্ন দরকারে ইনফর্মেশন দেওয়া সব ব্যাপারে সে অগ্রগামী। দিনমান তাদের সাথে হইচইয়ে কেটে যায়, কখনো পাবলিক লাইব্রেরি তো কখনো টিএসসির ক্যাফেটেরিয়া কিংবা নবীনবরণের কনসার্টগুলোতে। একটু ডানপিটে স্বভাবের কারণে দেখা যেত যে মেয়েদের থেকে ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। এটা কেউ কেউ বাঁকা চোখেও দেখত। কিন্তু কি আর করা। সে যা সে তাই। এত সারাক্ষণ লুকোচুরি করতে তার ভালো লাগে না। পাবলিক লাইব্রেরিতে ভালো সিনেমা দেখাবে, মেয়ে বান্ধবীরা যদি না যায়, লক্ষ্মী মেয়েরা সিনেমা দেখে না ভাব দেখায় তাহলে কি সেজন্যে সে না দেখে বসে থাকবে? কনসার্টে গেলে অনেক ধাক্কাধাক্কি হয়, অন্য ছেলেরা কমেন্ট করে, তাই বলে কি সে গান শোনা মিস করবে? সেদিন এক ভূগোল ডিপার্টমেন্টের এক মেয়ের ওপর বখাটেরা অ্যাসিড ছুঁড়ে মারলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই ঠিক করলো মানববন্ধন আর প্রতিবাদ মিছিল হবে। স্বাভাবিকভাবে সবার বাড়ি থেকে মানা করেছে কোন গন্ডগোলের জড়াবি না। সোজা ক্লাশ শেষ করবি, বাড়ি ফিরে আসবি। ক্লাশ শেষে সে চৈতিকে জিজ্ঞেস করলো

“যাবি না টিএসসি?”

চৈতি কাঁচুমাঁচু - “না রে, টিউটোরিয়াল সামনে, এখন নোট রেডি হয়নি, লাইব্রেরি না গেলেই নয়”।

অহনা খুবই বিরক্ত হয়ে যায়, তার গলার স্বরে সেই বিরক্তি চাপাও থাকে না।

“রোজ তো আড্ডা দিস, চা- শিঙাড়া খাস, আজকেই লাইব্রেরি যাওয়া এত জরুরি হয়ে গেলো?”

জোর করে চেপে ধরলে তখন বের হবে আসল কথা। "না রে মা না করে দিয়েছেন পই পই করে, কেউ দেখে ফেলে মা'কে বলে দিলে আর আস্ত রাখবে না।"

"তাই বলে তুই বন্ধুর পাশে দাঁড়াবি না? আজ যদি সে না হয়ে আমি হতাম তাহলেও কি তুই এই বলতি?"

নিরুপায় চৈতি তখন বলবে – "কি যে বাজে বকিস না তুই সারাক্ষণ। আমি চললাম, তোর জ্ঞানের বাণী অন্যদিন শুনব।"

অহনা প্রতিবাদে শামিল না হয়ে লাইব্রেরি গিয়ে পড়াশুনা করবে? বিবেকের কাছে ছোট হওয়ার মানুষই সে না। হয়তো প্রচলিত অর্থে লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে সে নয় কিন্তু সে তো আর নিজেকে পরিবর্তন করতে পারবে না। তার মনের ভিতর সারাক্ষণ সহপাঠির জন্যে মমতা বিরাজ করলে, সে না গিয়ে কি করে পারে?

বাড়িতে অহনা বড় মেয়ে। দাদির খুব ইচ্ছে ধুমধাম করে বড় নাতনির বিয়ে দিবেন।

অহনার বাবাকে তিনি ক্রমাগত ব্ল্যাক মেইলিং এর ওপর রাখেন – "আমার হাতে আমি অহনার বিয়ে দিতে চাই। আমি নাত জামাইয়ের মুখ দেখে যেতে চাই।"

বাবা বলেন – "আম্মা পড়াশোনাটাওতো আজকাল জরুরী মেয়েদের। দিনকাল কতো পরিবর্তন হয়েছে সেটা দেখবেন না?"

"পড়াশোনা বিয়ের পরেও করা যায়, কেন আমাদের ছোটবৌমা বিয়ের পর বিএ এমএ করছে না? তুই ছেলে দেখ।"

ব্যবসায়ী পরিবারের কারণেই হোক আর দাদির কারণেই হোক, ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর থেকে মাঝেসাঝে দেখা যেতো মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে খুব দূর-দূরান্ত সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনের আগমন ঘটছে বাড়িতে। তাদের মতলব টের পেতো অহনা যখন অকারণেই তারা তার চুল কতটুকু লম্বা, কিংবা সে বসে থাকলেই বা সে নিজে কতটা লম্বা এগুলো বোঝার চেষ্টা করত। এসব নিয়ে সে নিজে আর তার ভাইবোন সবাই বিমল আনন্দ উপভোগ করত। মিষ্টি কোন দোকান থেকে আনা হলো, কত কেজি আর কি সাইজ আর কি কোয়ালিটির এই নিয়ে ডাইনিং-এ বিরাট আলোচনা হত। যারা এসেছিলেন তারা কোন দোকানের জুতো পড়েছেন, শাড়ি জামা পরেছেন, সেগুলো কেমন, তার থেকে পাত্রপক্ষ কতটুকু কিপ্টে কিংবা নাক উঁচু, এখানে বিয়ের পর অহনাকে কিপ্টেগুলো কিংবা উন্নাসিকগুলো কতটুকু কষ্ট দিতে পারে তার নানা কাল্পনিক চিত্র অঙ্কন করে তারা রসাত্মক হাসাহাসি করে সেখানেই বিয়ের দফারফা করে ফেলতো। একদিন সকালে অহনা আবৃত্তির ক্লাশে যাবে, রেডি হয়ে বাবার কাছে রিকশা ভাড়া চাইতে গেছে, বাবার ঘরের বিছানার ওপরে দেখলো লাল শার্ট পরা গাছের ডালে কাত হয়ে হেলান দেওয়া এক নায়কের ছবি সাথে বায়োডাটা। কৌতুহলী অহনা লুকিয়ে বায়োডাটা হাতে নিতে যাবে অমনি বাবা বাথরুম থেকে বের হলেন। তাড়াতাড়ি রিকশা ভাড়া নিয়ে অহনা ঘর থেকে পালিয়ে বাঁচল। বেরিয়ে যেই না ডাইনিং স্পেসে পা দিয়েছে, দেখল ডাইনিং টেবিলের ওপর দুটো মিষ্টির বাক্স, সেখানে থেকে ছোটবোন মিষ্টি খাচ্ছে।

সামনে এগিয়ে বোনকে জিজ্ঞেস করল – "এই সকাল সকাল মিষ্টি কোথা থেকে?"

বোন জবাব দিল – "যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা এই মিষ্টি নিয়ে এসেছিলেন।"

অহনা প্রায় চিৎকার করে উঠল – "এই টিকটিকির সাইজের মিষ্টি নিয়ে তাঁরা এসেছিলেন? যা আব্বুকে বলে আয়, এক্ষুনি এই ছেলে বাদ। কিপ্টের কিপ্টে, এই সাইজের মিষ্টি নিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিতে আসে, সাহস কত?"

পাড়ায় কিংবা আত্মীয়স্বজনের কারও বিয়ে হলে তার পর পর কিংবা এমনিতেও কারেন্ট না থাকা সন্ধ্যেগুলো কাটত সব ভাইবোনরা মিলে তার বিয়ের প্ল্যানিং করে। কিভাবে গেট সাজান হবে, আলোকসজ্জা কোথায় কতটুকু হবে, খাবারের মেনু কি? গায়ে হলুদে কি সবাই জামদানি পড়বে নাকি চুন্দরী? মেহেন্দি কোন পার্লারে ভাল লাগায়? কোন কমিউনিটি সেন্টারটাতে পুরো এসি করা আছে? কাদের ডেকরেশান সুন্দর ইত্যাদি ইত্যাদি। কোন কোন গানের সাথে নাচ হবে, কে কে নাচবে? পাত্রপক্ষের জন্যে প্যারোডিও থাকবে। গানের ব্যান্ড তো আনতেই হবে নইলে হলুদ সন্ধ্যাটাই মাটি। অনেকদিন ধরে এই আলাপ আলোচনা করার ফসল এটাই দাঁড়াল যে, ক'দিন পর দেখা যায়, অনেক তর্কের পর এর আগের বার যা ফাইনাল করা হয়েছিল সেটা পুরনো হয়ে যায়।

সেদিন নওশীনের বোনের বিয়েতে চুন্দরী শাড়ি দেখে সবাই আলোচনা করলো চুন্দরী পরা হবে গায়ে হলুদে। স্মার্ট দেখায়, চুন্দরীর প্রত্যেকটি রঙই সুন্দর। পুরো অনুষ্ঠানটি বেশ কালারফুল দেখা যাবে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা কালারের চুন্দরী পড়লে।

মেজো চাচার মেয়ে কনা আপা বললো, গায়ে হলুদে ট্র্যাডিশনাল শাড়িই বেশি ভাল লাগে। বিভিন্ন রঙের জামদানি কি আর খারাপ? জামদানির রঙগুলোওতো সুন্দর।

এ নিয়ে খানিক আলোচনা খানিক তর্ক কিন্তু ক'দিন পর দেখা গেলো চুন্দরী আর জামদানি দুটোই আউট অফ ফ্যাশন, জর্জেটের ওপর মেটালের কাজ ইন করে গেছে। আর ব্যান্ড হিসেবে ডিফরেন্ট টাচ নাকি প্রমিথিউস এই নিয়ে মতান্তর থাকলেও কদিন পর ওয়ারফেইজ বেশি জনপ্রিয়তা পেয়ে গেছে, ওদের গানগুলো আরও সুন্দর। ভাইয়ার আবার গায়ে হলুদের মেনুতে তেহারীর বদলে

মোরগ পোলাও বেশি পছন্দ। ধরতে গেলে এক "পাত্র" বাদ দিয়ে বিয়ের অন্যান্য আয়োজন বাচ্চা লেভেলে মোটামুটি সবই ঠিকঠাক করা ছিল।

এই স্বপ্ন আলোচনা ভালবাসা খুনসুটির মাঝে যখন দিন গড়াচ্ছিল তখন অর্নদের বাড়ি থেকে বিয়ের প্রস্তাব এলো। এবং বেশ তাগাদার সাথেই, কারণ পাত্রের ছুটি ফুরিয়ে এসেছিলো প্রায় এই মেয়ে বাছাবাছি করতে করতেই। অবস্থা অনেকটা সে পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে বিয়ে না করেই অর্নকে আবার কর্মস্থলে ফিরে যেতে হবে। বেশ পরিচিতদের মধ্যে থেকে পাত্র পেয়ে অহনার পরিবার খুব খুশি ছিল, যদিও বিদেশে বিয়ে করা নিয়ে অহনার প্রথমে খুবই আপত্তি ছিল কারণ পড়াশোনা করতে ভালো না লাগলেও টিএসসির ক্যাফেটেরিয়ায় কিংবা মাঠে, পাবলিক লাইব্রেরির সিড়িতে, কলাভবনের মাঠে বসে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে অহনার কোনই আপত্তি ছিল না। ভাবত শুধু আড্ডা দিয়ে আর হই হুল্লোড় করেই যদি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যেত। এখন বিয়ে হয়ে হঠাৎ করে সব ত্যাগ করতে অহনার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। সকালে ডাসের কলিজা সিঙ্গারা কিংবা দুপুরে টিএসসির এক পিস মাংস দেওয়া তেহারী মিস হয়ে যাবে, কেমন করে তা সম্ভব? পরে শুরু হলো আত্মীয়স্বজনের বোঝানো সোঝানো আর বন্ধু বান্ধবের বিদেশ নামক বস্তুটা নিয়ে লোভনীয় অনেক গল্প -

- ছেলে কোথায় থাকে বললি? নেদারল্যান্ডসে?
- ওয়াও, ভ্যান গগের দেশে? টিউলিপ কি সুন্দর ফোটে ওখানে দেখেছিস না সিলসিলা ছবিতে?
- অমিতাভ আর রেখার দেখা এক খোয়াব তো ইয়ে সিলসিলে হুয়ে গানটার শ্যুটিংতো ওখানে হয়েছে, জানিস না?

- নিকাহ সিনেমার সমুদ্রের শ্যুটিংও তো ওখানে করা।
- ওরা সমুদ্রের ভেতরে বাঁধ দিয়ে নিজের দেশকে রক্ষা করেছে জানিস সেই ইতিহাস? ওদের সোশ্যাল সিকিউরিটি সিস্টেম জানিস? রাজি হয়ে যা, রাজি হয়ে যা। পিএসভির ফুটবল দেখতে পাবি তো লাইভ।

এসব শুনতে শুনতে অহনা অগত্যা রাজি হলো বিদেশি বিয়েতে।

এছাড়া অহনার সিক্সথ সেন্স এমনিতেও জানত যে বেশী ট্যাঁ ফো করে কোন লাভ হবে - না, বিয়ে তাকে বিদেশেই করতে হবে, পরিবারের মুরুব্বিরা কিছু অলিখিত কায়দা তৈরী করে ফেলেছেন। পরিবারের ছেলেরা বাপ আর দাদার ব্যবসা বাণিজ্য সামলাবে – আর মেয়েদের বিদেশ পাঠিয়ে দিয়ে তাদের ভবিষ্যত নিশ্চিত রাখা হবে। এতে ডবল লাভ মেয়ে বিদেশে থাকে শুনতেও সামাজিকভাবে ভালো শোনায়, সাথে মেয়েরা ভালো থাকলে বাবার সম্পত্তির পাওনাও আর দাবি করতে আসবে না। ঘরের মালকড়ি ঘরেই থেকে যাবে। যদি না জামাই ব্যাটা অনেক ছোটলোক হয়, তবে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এম এস -, পি এইচ ডি করা ছেলেদের মনে যাই থাকুক, বিদেশ ফেরতা হয়ে শ্বশুর বাড়ির সম্পত্তি নিয়ে দলাদলি করতে যাওয়াও তো তাদের পক্ষে আর সম্ভব না। সুতরাং বিদেশি পাত্রে পাত্রী পক্ষের ডবল গ্যারান্টি, মেয়েও ভালো থাকবে, সাথে বাবা - চাচারাও।

এরপর ধরতে গেলে বেশ হুড়মুড় করেই অহনার বিয়েটা হয়ে গেলো অর্নর সাথে। বৃষ্টিভেজা এক সন্ধ্যায় মেহেন্দি রাঙানো হাত নিয়ে ঝলমল করা আলোয় সাজানো বাড়িতে বউ সাজলো অহনা। তাড়াহুড়োর মধ্যে যতটা সম্ভব সেই আন্দাজের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়েই ঘটে গেল অহনার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যদিও তার বিয়ে নিয়ে নানারকম প্ল্যানিং করা ছিল কিন্তু কাজের সময় দেখা গেলো মাত্র পাঁচ দিনের নোটিসের বিয়েতে অনেক ঠিক করা জিনিসই বাদ পড়ে গেল সময়ের অভাবে। ছোটরা তাদের পরিকল্পনায় বাধা পাওয়ায় প্রথমে বেশ বিমর্ষ হলেও সব

আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়ে যাওয়ার পর তারা সবাই খুশি। অন্য সবার সাথে অহনা নিজেও খুশি তার বিয়েতে, তবে তার খুশির উৎস অন্য জায়গায়। আর পড়াশোনা করতে হবে না এই ভেবে সে আনন্দিত। রোজ রোজ টিউটোরিয়াল, ভাইভা, লাইব্রেরি, পরীক্ষা, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নোট মুখস্থ করার হাত থেকে অবশেষে পরিত্রাণ পাওয়া গেল।

অহনার মাথা ভর্তি অনেক আইডিয়া কাজ করত, পাকা আইডিয়া আর দুষ্টু বুদ্ধির জন্য অহনা অনেকটা পরিচিত মহলে বিখ্যাত ছিল। বিয়ে করার জন্য সেজেগুজে বসে তারপর শুরু করে একটানা কান্নাকাটি, মেয়েলি এ ব্যাপারটাতে অহনার বেশ আপত্তি ছিল। কেন বাবা আগে জানতে না বিয়ে করতে যাচ্ছ? এখনতো আর কেউ বালিকা বধূ নয় কিংবা ছ'মাস ন'মাসে বাবার বাড়ি বেড়াতে আসার হাঙ্গামাও নেই নৌকো করে। ইচ্ছে হলেই বাপের বাড়ি। তাহলে এতো আহ্লাদের কান্নাকাটিটা কীসের শুনি?

অন্যরা অহনাকে আগেই শাসিয়ে রেখেছিল – "দেখব তোর বিয়ের সময় কি করিস। মানুষকে বলা তো অনেক সোজা, পড়ুক নিজের ঘাড়ে, দেখব তো তখন। সব বেরিয়ে যাবে।"

আজ সেই মহা দিন। সাধারনতঃ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন এর সাইন দেখার জন্য এতো পিচকি পাচকী ঘরে আসে না। মুরুব্বিরাই থাকেন ঘরে কিন্তু অহনা যে সবার লেজে পা রেখে আছে। তাই যখন কাজি সাহেব তার খাতাপত্র মেলে ধরে বসলেন অহনার সামনে, মাথা নিচু করে রেখেও অহনা বুঝতে পারছিল জোড়া জোড়া চোখ তাকে পাহারা দিচ্ছে আর হাসছে, বাছাধন এখন কেমন, দেখি? অহনাও শক্ত হয়েছিল, এত জনের কাছে তো আর সে হেরে যেতে পারে না, না কিছুতেই না। কাজি সাহেব তার গৎবাঁধা কবিতা শেষ করা মাত্রই অহনা ভাবলো বলে ফেলব নাকি এখুনি? আবার ভাবলো আম্মি যদি বকা দেয়, ভাবতে ভাবতেই কাজি সাহেব বললেন - "আবার, বলেন মা বলেন, কবুল বলেন।"

অহনা ভাবার আগেই কখন যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো "কবুল"। বেশ স্পষ্ট আর জোরে।

সবাই পরিষ্কার শুনতে পেল বলে কেউ হাসার সুযোগ পেল না। সে মুহূর্তে বিজয়িনীর অনুভূতি নিয়ে বসে থাকা অহনা তখনও অনুধাবন করেনি এখানে শুধু তাকে চ্যালেঞ্জ করা প্রতিপক্ষের লোকেরাই ছিল না, বরপক্ষও ছিল! একটু পরেই তার ছোট এক কাজিন দৌড়ে এসে জানিয়ে গেল এঘরে, বরের এক খালাতো ভাই যে নাকি অনেকদিন আমেরিকা প্রবাসী অন্য কারও সাথে গল্প করছিল।

- বাংলাদেশের মেয়েদের প্রেক্ষাপট তো অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

- কি রকম?

- এই যে সরকারের প্রধান বলেন বা অপজিশন লিডার, দু'জনেই মহিলা, দেশের মানুষ এদেরকে প্রতিবারই ভোট দিচ্ছেন।

- তা দিয়ে তো আর আপনি সামগ্রিক সব মেয়েদের অবস্থা বিচার করতে পারেন না, সাধারণ মেয়েরা তো আগের অবস্থায় আছে।

- মনে হয় না, রাস্তায় জিন্স টপস পরা মেয়ে দেখছি, বেশ চটপট কথার উত্তর দেয় মেয়েরা, এই যে আমাদের নতুন বউকেই দেখেন, একবার বলা মাত্র কত লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার সে কবুল বলে দিল কান্নাকাটি ছাড়া। আগের দিন হলে তো কান্নার হুল্লোড় লেগে যেত, কবুল কথাটাই অনেক সময় শোনা যেত না।

কাজিনের কথা শুনে তেমন ভাবান্তর হল না অহনার, কিছু বুঝল কি না তাও বোঝা গেল না। সে যা বোঝে তার বেশি তাকে বোঝানোও যায় না। কিছুটা একগুঁয়ে জেদি আছে। সবকিছু সাদা দৃষ্টিতে দেখা অবুঝ কিংবা নাইফ অহনা এই বুঝবুদ্ধি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলল।

পুরস্কার

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

উৎসবের বিরাট আয়োজন। সমুদ্রের ধারে। বিশাল এক প্রাসাদোপম বাড়িতে নামকরা অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির সমাগম। পুরস্কার পাচ্ছেন ভূতপূর্ব এক নৌ-সেনানায়ক। মরণোত্তর। এই প্রাসাদটি ছাড়াও একটা বিরাট অঙ্কের বিধবাভাতা পাবেন তাঁর সদ্যবিধবা পত্নী।

বিশ্বমহাযুদ্ধের এই সেনানায়কের বীরত্ব অপরিসীম। তাঁর নাম দেশে বিদেশে সুপরিচিত। কোথায়, কবে, কোন জাহাজ ডুবিয়েছিলেন, তার বিশদ বিবরণ আজও অমর হয়ে রয়ে গেছে দেশের নানান শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে। শিক্ষার্থীদের অবশ্যপাঠ্য।

এখন আর যুদ্ধ নেই। শান্তিপর্ব। আবারও নতুন করে কৃতিত্ব অর্জন করলেন ইনি। অন্য আরেকটা জাহাজেরই দৌলতে। মালবাহী জাহাজ। কারণ মহাজনেরা সবাই এবার বেশ চিন্তায় পড়েছেন। তাঁরাই মেরামত করালেন এক যুদ্ধবাতিল জাহাজ। সেই জাহাজের সমস্ত ভার ন্যস্ত হল এই অবসরপ্রাপ্ত সেনানায়কের ওপর। অযথা প্রশ্ন করা ধাতে নেই যাদের, যারা ক-অক্ষর গোমাংস, যাদের মনে কোনরকম ক্ষোভ বা বিদ্বেষ নেই, মুখ বুজে যারা শুধু হুকুম তামিল করে যায়, মাইনে নেয় টিপসই দিয়ে, আর অযথা চঙমঙ করে এদিক ওদিক তাকায় না উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে, বলতে গেলে সন্দেহবাতিক কথাটা যাদের জানা নেই, বেছে বেছে এমনই সব লোকেদের নিয়োগ করা হল তাঁরই একান্ত তদারকিতে। এক'শ জন খালাসি।

এবারে যে এত ফসল ফলবে, তা কেউ স্বপ্নেও আশা করেননি। অন্য কত দেশের ফসল পঙ্গপালে খেল। কোথাও ফসল তছনছ হল বন্যায়। কোথাও আবার খরার দাপটে ঝলসে গেল মাঠের ফসল। আর এ দেশের এই মহাজনেরা সমস্যায় পড়লেন বাড়তি ফসলের জ্বালায়। গতবারের ফসলই

ফড়েরা এখনও বাজারে ছাড়েনি। এবারের উদ্বৃত্ত ফসল বাজারে বিকোতে দিলে দাম পড়ে যাবে। দফা রফা হবে ব্যবসার।

মহাজনদের এই গুপ্তসিদ্ধান্তের কথা সেনানায়ক ছাড়া কাকপক্ষীও জানল না। কয়েক হাজার বস্তাবোঝাই ফসলের কি হবে, কোথায় পাচার করা হবে। রাতের অন্ধকারে মাল তোলা হল জাহাজে। আর রাত থাকতে থাকতেই জাহাজ ছেড়ে গেল সমুদ্রাভিমুখে।

সেনানায়কের ওপর কঠিন দায়িত্ব। ভোর হবার আগেই মোহনায় কি ভাবে পৌঁছানো যায়, তাই নিয়ে তাঁর যত মাথাব্যথা। দিনকাল ভাল নয়। ফসল পাচারের খবরটা ফাঁস হয়ে গেলে হাজারো ফ্যাসাদ। কে জানে কোন রাজনৈতিক দল কেমন বিরোধিতা করে বসবে। আটকে দেবে সমস্ত প্রচেষ্টা। নিজেদের ফসল, তবুও যেন তা নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করার অধিকার নেই। লুকিয়ে চুরিয়ে পাচার করাটা তাই বুদ্ধিমানের কাজ। জনসাধারণের হাতে এ ফসল তুলে দেওয়া হবে না বলেই না এত কারচুপির তোড়জোড়।

ভোর হয় হয়। জাহাজটা প্রায় মোহনার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। দূরে পাড়ের আলোর একফালি সরু রেখা ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সেনানায়ক কেবিন থেকে বেরিয়ে জাহাজের ডেকের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। ফুরফুরে হাওয়া মাথার স্বল্প চুলগুলো এলোমেলো করে দিচ্ছে। আঙুলে ধরা চুরুটটা ধরিয়ে মৌজ করে দু'একটা টান দিলেন। কপালে হাত ঠেকিয়ে ভাল করে ঠাহর করার চেষ্টা করলেন, জাহাজটা তীর থেকে কতটা দূরে চলে এসেছে।

খালাসিদের কাউকে কোন কিছুই জানানো হয়নি আগেভাগে। কি গন্তব্যস্থল, কি ধরণের কাজ। কিছুই না। এবার জানাবেন সবাইকে সেনানায়ক। জাহাজ মাঝসমুদ্রে পড়ার আগে।

আদেশ করলেন সবাইকে জাহাজের ডাইনিং রুমে জড়ো হতে। আগে সবাই মিলে একসাথে খাওয়াদাওয়া করুক। তারপর কাজের কথা। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। হাতে এখনও বেশ কিছু সময় আছে।

খাওয়াদাওয়ার বহরটা ভালোই বলতে হয়। ভেয়ানের জন্যেও বেছে বেছে কয়েকজনকে জাহাজে নিয়েছিলেন সেনানায়ক। শুকনো পেটে এত খাটুনির কাজ করা সহজ নয়। আবার রান্নার মান খারাপ হলেও বিপদ। বলা তো যায় না, কে, কখন, কিভাবে বেঁকে বসবে। না, খাওয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করলে চলে না। আর এ বিষয়ে নিন্দে করার মতো কোন ফাঁক থাকার সুযোগই দিতে চাননি সেনানায়ক। তোফা রান্না, অঢেল খাবার। যে যত পারে খাবে, কোন বাধা নেই।

সেনানায়ক এবার কথা বলতে শুরু করলেন, "আপনাদের যে কাজের জন্যে বাছা হয়েছে, তা স্বল্পমেয়াদি হলেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের ভেতর কে যেন আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন পাসপোর্ট আর ভিসার ব্যাপারে। আমি জানিয়েছিলাম, পাসপোর্ট সঙ্গে নেবেন নিন, কিন্তু ভিসাফিসার কোন প্রয়োজন হবে না। তার কারণটা খুবই সোজা। আমরা আমাদের দেশের এলাকা ছেড়ে যাচ্ছি না। সমুদ্রের দু'শ মাইল সীমানার গণ্ডি না পেরলে, অন্য কোন দেশের চৌহদ্দির মধ্যে না ঢুকলে, ভিসা লাগবে না। মাঝসমুদ্রে জাহাজ ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার কোন সুযোগই হবে না।

খালাসিদের মধ্যে কে একজন সাহস করে সামনে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, "এ আবার কেমন কাজের ছিরি? বন্দর থেকে সমুদ্রে পড়তে না পড়তেই আবার বন্দরে ফেরত আসা। কোনো দেশে পৌঁছব না, কিছুই দেখব না, ফুর্তিফার্তা করবো না..."

"কে বলেছে, আপনারা ফুর্তি করতে পারবেন না? সঙ্গে পেটি পেটি মদ এনেছি। যত খুশি পারেন টানবেন" - বললেন সেনানায়ক।

- মাল তো ঘরে বসেও টানা যেত। ফালতু জাহাজে চড়িয়ে কেন, তা আমাদের মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না। তাছাড়া মালের সঙ্গে টাল না থাকলে জমেই বা কি করে?

- আপনারা মেয়েমানুষের কথা বলছেন? দু একদিন না হয় সংযম করলেন। আমিও তো আমার স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে এসেছি। আপনাদের সঙ্গে আমিও তো এই ক দিন...

খালাসিরা নিজেদের মধ্যে কিসব বলাবলি করে। কে, কি বলছে, গোলমালের চোটে কারুর কথাই স্পষ্ট করে বোধগম্য হয়না।

- আপনারা একটু শান্ত হন। আসল কথাটাই আপনাদের এখনও জানানো হয়নি।

- আবার কি কথা? - পেছন একজন থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে ।

- জাহাজের খোলে শুধু মদের পেটিই নেই, অন্য মালও আছে। সেই মালগুলো আপনারা জাহাজে তোলেননি বলেই জানতে পারেন নি। অথচ সেই মালের জন্যেই আপনাদের এই জাহাজের কাজ দেওয়া হয়েছে। সে মালগুলো কি, জানেন? হাজার হাজার বস্তাবোঝাই মাল।

- বস্তাবোঝাই মাল তো আমাদের বাবার কি? কোনো দেশেই জাহাজ যখন যাবে না, তখন জেনেই বা লাভ কি, কি মাল, কার মাল?

খালাসিরা আবার গুঞ্জন তোলে। এবার সেনানায়ক একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে মেগাফোন মুখে ঘোষণা করলেন, "শুনুন, সবাই মন দিয়ে। এভাবে একসঙ্গে চেঁচামেচি করলে সুস্থভাবে কিছুই আলোচনা করা যাবে না। এখন আপনারা একটু আধটু মালটাল টানুন...দিনের বেলা আপনাদের আজ পুরো বিশ্রাম। কাজ শুরু হবে সন্ধ্যের পর। তখন সবাইকেই হাত লাগাতে হবে, জাহাজের

খোল থেকে মালবোঝাই বস্তাগুলো একে একে তুলে এনে ডেকের ওপর সারি সারি সাজাতে হবে।"

কথার মাঝে কে একজন টিপ্পনি কাটে, "ডেকের ওপর মাল, একেই বলে ডেকোরেশন।"

- একদিনে হয়ত সব বস্তা তোলা সম্ভব হয়ে উঠবে না। কোন ক্ষতি নেই। একেবারে ঘড়ি ধরে আপনাদের কাজ হাসিল করতে কেউ বলছে না। এখন যান, সবাই মিলে ফুর্তি করুন গিয়ে।

একজন খালাসি হাত তুলে ইঙ্গিতে জানায়, সে কিছু বলতে চায়।

সেনানায়কের চোখে পড়তেই তিনি ইশারায় আদেশ দেন তার বক্তব্য পেশ করতে।

- স্যার, একটা কথা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না।

- কি কথা ?

- এই, মানে, বস্তা যদি খোল থেকে ডেকেই তুলতে হবে, তাহলে খোলে ভরা হল কেন?

প্রশ্ন শুনে হো হো করে হেসে ওঠে অন্য খালাসিরা। একে একে সবাই নানা রকম মন্তব্য ছুঁড়ে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে প্রশ্নকারীকে।

- কি গেঁড়ের মতো কথা বলচিস? আরে বাবা, বৃষ্টিবাদলা হলে কি হবে? মালগুলো সব ভিজে যাবে না ?

- খাসা বলেছিস মাইরি। দেখ বাপু, আমাদের কাজকারবার শুধু মাল নিয়ে। হয় টানো, নয় বও, তোর ওইসব ছেঁদো প্রশ্ন শিকেয় তুলে রাখ।

- ঠিক বলেছিস, অন্য কিছু ভাবলেই পয়মাল।

- এর আগে যারা অন্য কোনো জাহাজে কাজ করেছিলি, কোথাও কি এমন সুযোগসুবিধে কখনও পেয়েছিলি নাকি? কাজ শুরু করার আগেই খাওয়াদাওয়া আর ফুর্তি...

সেনানায়ক আবার মেগাফোনের মাধ্যমে জানিয়ে দেন, "আপাতত আপনাদের অবসর। সন্ধ্যে নামার সঙ্গে সঙ্গে আমি সাইরেন বাজিয়ে জানিয়ে দেব। তখন সবাই একে একে জাহাজের খোলে চলে যাবেন আর এক এক করে বস্তাগুলো হাতে হাতে পৌঁছে দেবেন ডেকের ওপর। কেমন? আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, কাল খুব একটা ভাল যাবে না। মাঝসমুদ্রে ঝড় উঠতে পারে। তাই কাজটা তার আগেই সেরে ফেলতে না পারলে বেশ বেকায়দায় পড়তে হবে। জাহাজ টলতে শুরু করলে সব বেগড়বাই হয়ে যাবে। কারো সমুদ্রপীড়া থাকলে তো কথাই নেই..."

খালাসিদের মধ্যে একজন ছিল, কেমন একটু ভাবুক ভাবুক চেহারার। অন্যরা যখন মদের ঘোরে মত্ত, তখন সে একফাঁকে লুকিয়ে জাহাজের খোলে গিয়ে হাজির হল। কৌতূহল তাকে এতক্ষণ ধরে কুরে কুরে খাচ্ছিল। মালগুলো কি, তা না জানা অবধি তার পেটের ভাত যেন হজম হতেই চাইছিল না। সবার অগোচরে এমন কাজ করছে বলে, নিজেকে তার কেমন যেন চোর চোর বলেও মনে হচ্ছিল। যদিও তার সন্দেহবাতিক আর জিজ্ঞাসু মন বার বার তাকে সচেতন করে দেয়, এটা তো চুরির কিছু নয়। তবু তার মনে জাগে সংশয় আর অজানা এক ভয়। যাই থাক বস্তায়, সে ভাল করেই জানে, আজ সন্ধ্যেবেলা অন্য সবার সঙ্গে তাকেও হাত লাগাতে হবে, এক এক করে বস্তাবোঝাই মালগুলো জাহাজের খোল থেকে ডেকে তুলতে হবে। সেনানায়কের তেমনই আদেশ। কিন্তু বস্তায় কি আছে সরাসরি জানিয়ে দিলে, এমন চোরের মত লুকিয়ে জানতে চাইবার ইচ্ছে জাগত না মনে। কিসের এই গোপনীয়তা। লোহার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামবার সময় ঢিপঢিপ করে তার বুক। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে থাকে। জাহাজের খোলে নেমেও শুনতে পায় অন্যান্য খালাসিদের মদমাতাল হৈ হল্লা। হঠাৎ তার মনে কেমন যেন খটকা লাগে। এই জাহাজে করে

লোক পাচার করা হচ্ছে না তো, বেআইনিভাবে? আমাদের বলা হয়েছে শুধু বস্তার কথা। কিন্তু তাতে কি আছে, বলে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যেত। সত্যি যদি বস্তায় কোন মানুষ বন্দি থাকে। তাহলে? বেশ ভয় ভয় করতে থাকে তার। কোনও বস্তার কাছে যাবার আগে তাই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, কেউ আছেন নাকি এখানে? থাকেন তো বলুন, আমি আপনাদের ক্ষতি করতে আসিনি। তার নিজেরই স্বর অনুরণিত হয়ে ফিরে আসে বার বার। তারপর আবার আগের মতোই নিস্তব্ধতা বিরাজ করে অন্ধকার ঘিরে। প্রথম বস্তাটায় হাত দিয়ে বাইরে থেকে টিপে টিপে বোঝার চেষ্টা করলো, কি মাল দিয়ে বোঝাই। ঠিকমতো ঠাহর না হতে, আরো কাছে গিয়ে শুঁকে দেখল। সোঁদা সোঁদা গন্ধেও বোঝা গেলো না সঠিক, কি আছে বস্তায়। কোন ফসলটসল হলেও হতে পারে। মাসকলাই বা গমজাতীয় কিছু। না কি, অন্য কোন মাদক দ্রব্য? তাই কি এত সতর্কতা? ধরা পড়ে যাবার ভয়ে রাতের অন্ধকারে তাই কি বন্দর ছেড়ে চলে আসা? মাঝসমুদ্র থেকে আবার বন্দরে ফিরে আসা মানেই মাঝসমুদ্রেই কোথাও হয়তো মাল পাচার হবে। হয়তো অন্য কোন নৌকোটৌকো এসে নিয়ে যাবে মাঝপথ থেকে। ভাবুক খালাসি হাবিজাবি ভাবতে ভাবতে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে যতটা সাবধান হওয়া যায়, ততটা সতর্ক হয়ে জাহাজের খোল থেকে বেরিয়ে অন্যদের কাছে ফিরে যায়।

সারারাত ধরে খালাসিরা বিনা বিরতিতে কাজ করে। ভোর নাগাদ সবাই এতই ক্লান্ত যে, দেহটাকে কোনরকমে টেনে বিছানার দিকে নিয়ে যেতেও যেন অক্ষম। সেনানায়কও রাতজেগে কাজের তদারক করেছেন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। উত্তেজনায় চুরুট খাবার কথাও একদম মনে হয়নি তাঁর। ঠিক করলেন কেবিনে গিয়ে প্রাতরাশ সেরে একটু জিরেন ঘুম দেবেন। তারপর এসে বাকি কাজের নির্দেশ দিতে হবে। কয়েকজন খালাসি ডেকের ওপরেই বস্তার গাদায় গা এলিয়ে দিয়েছে। সমুদ্রের ফুরফুর হাওয়ায় কখন যেন একসময় তাদের সবাইকে নিদুলি লাগার মতো ঘুমে আচ্ছন্ন করে দেয়।

একমাত্র ভাবুক ভাবুক খালাসির চোখে ঘুম আসতে চায় না। ডেকের বস্তাগুলো নিয়ে এর পর কি করা হবে, তা সঠিক না জানা অবধি তার ঘুম হবে না। একবার ভাবল সেনানায়কের কেবিনে গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু একা যাওয়ার সাহস না হওয়াতে, উৎসুক হয়ে চুপ করে বসে রইল অন্য কোনো খালাসির ঘুম ভাঙার অপেক্ষায়। কিন্তু অন্য খালাসিদের জেগে ওঠার কোন তাগিদই নেই। অধৈর্য হয়ে তাই সে ঠেলে ঠুলে দু একজনকে ওঠাবার চেষ্টা করে। তারা বিরক্ত হয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলে, "মাল খাবার দরকার হয়, একা যা, আমায় বিরক্ত করিস না। বস্তার কি অবস্থা হবে তা জেনে আমার কি লাভ? নিদেন হ দেখি।"

সেনানায়কের কেবিনের দরজাটা আধবোজা ছিল। তেরছাভাবে ভোরের রোদ এসে পড়ছে। সেই রোদের ফালি চুরুটের ধোঁয়ায় আরও স্পষ্ট হচ্ছে। সেনানায়ক দেখলেন হঠাৎ সেই রোদের ফালি উধাও হয়ে গেল। দরজার বাইরে কিসের ছায়া। মানুষের ছায়া। সেনানায়ক হেঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "কে ওখানে, কি চাই?"

দরজাটা হাট হয়ে খুলে যেতেই সেনানায়ক দেখলেন কয়েকজন খালাসি এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর কেবিনের সামনে। খালাসিরা সেনানায়ককে এ অবস্থায় দেখবে তা আশা করেনি। তারা জানত সেনানায়ক কখনও উর্দি ছাড়া দর্শন দেন না। খালি গা, শুধু একটা জাঙিয়া পরা সেনানায়ককে দেখে তারা নিজেদের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে গিয়ে অবাক হল। কোথায় যে কতটা ফারাক তাও ঠিকমত বুঝে পেল না। সবাই কাপড়ে বাবু, না থাকলে সাধারণের দলে পড়ে কাবু।

সেনানায়ক কেবিনে যখন থাকেন, কেউ এসে তাঁকে অযথা বিরক্ত করুক, তা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তাই তিনি রুক্ষস্বরে জানিয়ে দেন, "বলিনি আপনাদের, ডেক ছেড়ে জাহাজের আর কোথাও যাবেন না অকাজে? কি চাই আপনাদের আমার কাছে?"

ভাবুক খালাসি সাহসে ভর করে বলে ফেলল, "একটা প্রশ্ন। বস্তাগুলো নিয়ে এবার আমরা কি করব?"

রেগে গেলেও সেনানায়ক ঠাণ্ডা মাথায় উত্তর দেন – "কি আবার করবেন, জাহাজ থেকে ফেলে দেবেন।"

- ফেলে দেব? জলে?

- জলে না তো কি? আমার মাথায়?

- কেন?

- কেন আবার কি? হুকুম বলে।

খালাসিরা মুখ্যু হলেও লোকের মুখে শুনেছিল, তাদের দেশের কাছাকাছি আরো অনেক ছোট ছোট দ্বীপ আছে। সেখানে সবই মন্দা। বছরের অনেকদিনই তাদের খাবার জোটে না। তাই তারা সেনানায়কের এই সিদ্ধান্তের কোন মানেই খুঁজে পায় না। জানতে চায়, বস্তাবোঝাই ফসল জলে না ফেলে সেই সব দ্বীপের মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে না কেন? ওরা খেয়ে পরে বাঁচলে কার কি ক্ষতি?

এ প্রস্তাবে সেনানায়ক ভীষণ চোটে গেলেন। বললেন, "ফসল কি আপনাদের নিজের সম্পত্তি যে, যা খুশি তাই করবেন, তা নিয়ে। যান, আপনারা যে যার জায়গায় ফিরে যান। জামাকাপড় পরে আমি একটু বাদে আসছি জাহাজের ডেকে। তারপর ফেলে দেওয়া হবে বস্তাগুলো সমুদ্রের জলে। আর তাতে যারা বাধা দেবে, তাদের নৌ-আইনের আওতায় ফেলে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে ফিরে

গিয়ে। এমন কি ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাদের সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হয়ে যেতে পারে।"

সেনানায়কের মুখে এই কথা শুনে চারজন ষণ্ডামার্কা খালাসি অবাক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলল। তারা জাঙিয়া পরা সেনানায়ককে জাপটে ধরে চ্যাংদোলা করে বয়ে নিয়ে চলল জাহাজের নাবিকের ঘরে। উর্দি পরে রাশভারী সেনানায়ক সাজবার সুযোগও পর্যন্ত দিল না। একটা খুঁটিতে আষ্টেপৃষ্টে শক্ত জাহাজের দড়ি দিয়ে বেঁধে সেনানায়ককে বললে, "নাবিককে আদেশ করুন, জাহাজটাকে কাছাকাছি কোন দ্বীপে নিয়ে গিয়ে ভিড়তে। বেগড়বাই করলে বা জাহাজকে দ্বীপ ছাড়া অন্য কোথাও নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে, বস্তার বদলে আপনাকেই ছুঁড়ে ফেলে দেব আমরা সমুদ্রের জলে। বস্তাগুলো আমরা কোন দ্বীপে পৌঁছলেই খালাস করে দেব। ফালতু জলে ফেলে দেব বললেই হল? এত ফসল? অভুক্ত লোকগুলো খেয়ে বাঁচবে।"

খুঁটিবাঁধা অবস্থায় সেনানায়ক একনাগাড়ে বকে চলেছেন, "বিদ্রোহ? আমার জাহাজে বিদ্রোহ? তা আমি কোনদিন বরদাস্ত করিনি, এখনও করবও না। আপনাদের সবাইয়ের সাজা পাওয়ার সব ব্যবস্থাই আমি করব। কি সব ছেলেমানুষি কাজ করছেন আপনারা? সুখে থাকতে আপনাদের সব ভূতে কিলোচ্ছে।"

ইতিমধ্যে অন্য খালাসিরাও জেগে গেছে। পালা করে সব মদের পেটিগুলো জাহাজের খোল থেকে নিয়ে এসে পেল্লায় নেশায় মেতেছে। সেনানায়কের বন্দি দশা দেখেও কেউ এগিয়ে আসছে না তাঁকে সাহায্য করতে। একজন আবার একটা ছিপিখোলা বোতল হাতে করে এগিয়ে আসে সেনানায়কের কাছে। তাঁর মুখের কাছে বোতলটা তুলে ধরে বলে, "কি? তেষ্টায় ছাতি ফাটছে? নিন, দিন না একটা চুমুক।"

তারপর একসময় খালাসিরা নিজেদের এই সাফল্যের আতিশয্যে ভুলেই যায় সেনানায়কের কথা। সবাই চলে যায় ডাইনিং রুমে। আজ শুধু ফুর্তি আর ফুর্তি। অঢেল খাওয়া আর অফুরন্ত মাল টানা।

বন্দি অবস্থায় সেনানায়ক নির্দেশ দিচ্ছেন নাবিককে কিভাবে কোন দিকে জাহাজ চালাতে হবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সমুদ্রের এই দিকটা তাঁর নখদর্পণে। উত্তাল সমুদ্র। হঠাৎ মনে হল জাহাজটা কিসে যেন ধাক্কা খেল। হুমড়ি খেয়ে কেউ কেউ ডাইনিং রুমে টাল সামলাতে না পেরে মেঝের ওপর পড়ে গেল। তারা ভাবল, অশান্ত সমুদ্রে জাহাজ টলমল করছে, তাই এমন হচ্ছে। আবার কেউ কেউ ভাবল নেশার মাত্রা চড়ে গেছে বলেই বোধহয় এমন বেসামাল ভাব।

জাহাজটা যে গুপ্তপাহাড়ে আঘাত খেয়ে আস্তে আস্তে ডুবতে শুরু করেছে, তা প্রথম প্রথম কেউ টের পেল না। যখন পেল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

পরের দিন নানা দেশের সংবাদপত্রে এই জাহাজডুবির খবর ছাপা হল। সেনানায়কের প্রশস্তিতে মুখর হল চারিদিক। তাঁর ছবিতে ছবিতে মালা দেবার হিড়িক পড়ে গেল। শোকসভারও খামতি হল না কোথাও। সদ্যবিধবা সেনানায়কের পত্নীর কাছে আসতে লাগলো সান্ত্বনাবার্তা। আবার বিয়ের প্রস্তাবও। সরকারের তরফ থেকেও যা কর্তব্য তাই করা হল।

জাহাজের অন্য খালাসিদের নিয়েও একটুখানি সংবাদ বেরিয়েছিল। নামধাম ছিল না কারও, শুধু জানানো হয়েছিল সংখ্যাটা। এক'শ জন।

[অনুপ্রেরণা - বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জার্মানির অভিব্যক্তিবাদী সাহিত্য আন্দোলনের সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্যকার গেয়র্গ কাইজার- এর (২৫ শে নভেম্বর ১৮৭৮ – ৪ ঠা জুন ১৯৪৫) একটি এক পাতার গল্প "Weizen ins Meer (গমের সমুদ্রযাত্রা)"]

আলসে চোখ (AMBLYOPIA)

রঙ্গন বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন আমার ছোটো মাসির বাড়ি নেমতন্ন ছিল। নয়নমাসি চিরকাল লোকজনকে খাওয়াতে ভালবাসেন, আর এর জন্যে যে কোনও হিজিবিজি উপলক্ষ খুঁজে বেড়ান। কোনো নাম না জানা ব্রতকথা তো আছেই, এ ছাড়া রান্নাঘরে নতুন চিমনি লাগানো হলে বা যখন ওদের আমহার্স্ট স্ট্রিটের এর পুরনো বাড়ির বাথরুমে টাইলস বসানো হল সেবারও মাসি সবাইকে খাইয়েছেন। এবারের উপলক্ষ ছিল মাসির 'ছানি অপেরাশান' এর সাকসেস। ছোটো মাসি তাঁর ডান চোখে প্রায় দেখতে পান না বললেই চলে। বা চোখে ভালই দেখতেন, ইদানিং ছানি পড়ার দরুন রান্নাতে দু'একবার নুন এর বদলে সোডা দিয়ে ফেলেছেন, আর সুন্দর সুন্দর ঢাকাই শাড়ি উল্টো করে পরে বিয়ে বাড়ি গেছেন।

"মাসি তুমি উল্টো শাড়ি পড়েছ।"

"দেখছস তর মেসর কান্ডটা, আমারে কইব তো - আর আমাগো দিদি সারা কৈলকাতায় ত্রিফলা লাগাইব, অথচ ঠিক সন্ধ্যায় রোজ লোডশেডিং।" কিছুতেই স্বীকার করবেন না যে চোখের দৃষ্টি কমে যাচ্ছে, ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছেন। মনে মনে ভালই জানতেন যে এই ভাবে চলবে না। কিন্তু সর্বদা মনে ভয় –"যদি অপারেশন করতে কমপ্লিকেশন হয় – "তাইলে তো দুই চোখই যাইব, হের থেইখ্যা যা আছে থাকুক।" অনেক কাউন্সেলিং করার পরে ছানি অপারেশনে রাজি হলেন।

অপারেশনের পরে এখন এত বেশি ভালো দেখছেন যে এতে অনিমাদির হয়েছে সব থেকে মুশকিল। অনিমাদি ভালো করে ঘর না মুছলে মাসি ঠিক ধরে ফেলছেন আর বলছেন - "অনিমা, মা আমার - চেয়ারটা সরাইয়া একটু ন্যাতা বুলাইয়া দে তো মা।" মাসির ডান চোখে আম্বল্যপিয়া – লেজি আই। মাসি স্কুল ফাইনালের সময় আবিষ্কার করেন উনি ডান চোখে দেখতে পান না।

মাসির যখন তিন বছর বয়স আমার দাদু মারা যান আর সংসারের সমস্ত ভার আমার অকৃতদার মামার মাথায় ওপরে এসে পড়ে। অনেক পরীক্ষানিরীক্ষার পরে জানা গেল মাসির নাকি আম্বল্যপিয়া - আর এর কোনো প্রতিকার নেই। ভাগ্যের পরিহাস – আমার দিদিমা সখ করে মাসির নাম রেখেছিলেন নয়নতারা। এদিকে নয়নমাসি নাকি এক চোখে কোনদিনই দেখতে পেতেন না। দিদা মানত করলেন, জলপরা খাওয়ালেন, মাসির হাতে কিছু শেকড়বাকর বেঁধে দেওয়া হল। কিন্তু ডান চোখ ঝাপসা রয়েই গেল। এদিকে মাসি গ্রাজুয়েশন করে একটা স্কুলে চাকরি নিলেন। এক বিয়েবাড়িতে মাসির শাশুড়ি মাসিকে দেখে পছন্দ করলেন। দুই বাড়িতে কথাবার্তা চলল এবং পাত্রপক্ষ'র কাছে মাসির আম্বল্যপিয়া গোপন করা হল। মাসি - বাড়ির কারও কাছ থেকে মেসোমশাইয়ের অফিসের ঠিকানা জোগাড় করে টেলিফোন ডিরেক্টরি ঘেঁটে ফোন করলেন। বেচারা মেসোমশাই কোথায় দুটো মিষ্টি মধুর কথা শুনবেন, তা না - মাসি ফোন করছেন জানাতে - আমার না ডান চোখে আম্বল্যপিয়া আছে। মেসো অম্বল এর নাম শুনেছেন কিন্তু চোখে অম্বল? কি কান্ড!!!! মাসি বলেন – "না না অম্বল না – আম্বল্যপিয়া"। অম্বলপিয়া শুনে মেসো একটু ভরসা পেলেন – "কি পিয়া?" মাসি কটমট করে একবার ফোনের দিকে তাকিয়ে বানান করে বললেন - "এ এম বি এল ওয়াই ও পি আই এ, আম্বল্যপিয়া, শুনুন - আমি ডান চোখে খুব কম দেখি - এটা আমাদের পরিবার আপনাদের জানায় নি। কিন্তু একটা সম্পর্ক মিথ্যাচার দিয়ে শুরু হোক সেটা আমি চাই না - তাই আপনাকে জানালাম। আপনি এবং আপনার পরিবার যদি আমার এই আম্বল্যপিয়া জানার পরে আমাকে গ্রহণ করেন তবেই আমি এই বিয়েতে রাজি।" মাসির শাশুড়ি পরের দিন এসে উপস্থিত – "শোন মা, তোমার এক চোখে অম্বল আছে না বাত আছে সেই জেনে আমার কাজ নেই। তোমার পরিবারকে আমাদের পছন্দ হয়েছে আর তোমাকে দেখা মাত্রই আমি অন্তর বউ হিসেবে কল্পনা করেছি - তাই এই হার দিয়ে আশীর্বাদ করে গেলুম। আজকে জানতে পারলাম যে তোমার এক চোখে দিষ্টি কম। তা হোক না - বিয়ের পরেও তো ভগবান না করুক

কত কিছু হতে পারে, তা বলে কি সম্পক্ক শেষ কত্তে হবে? আমি তোমার ভায়ের সাথে কথা কয়ে শিগগির তোমাকে আমার ঘরের নক্কি করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কচ্চি।"

আম্বল্যপিয়া শতকরা প্রায় ১-৫% লোকজনের মধ্যে হয়। এটি এমন একটি চোখের অসুবিধা যেখানে কোনো গঠনমূলক অসুবিধা না থাকা সত্বেও একটি কিংবা দুটি চোখেই দৃষ্টি ক্ষীণ থাকে। আমাদের দুই চোখ নিজেরা মূলত স্বাধীন ভাবে কাজ করে। প্রত্যেক চোখের কাজ আমাদের চারপাশের পরিবেশ থেকে ইমেজ জড়ো করা। প্রত্যেক চোখের সাথে একটি করে তার যুক্ত থাকে - যাকে বলে অপটিক নার্ভ। এই নার্ভ আমাদের মস্তিস্কের ভিজ্যুয়াল সেন্টারে এ জড়ো করা ইমেজ পাঠায় প্রসেস করার জন্যে। আমাদের মস্তিস্ক দুটি চোখের জড়ো করা ইমেজ এক সাথে প্রসেস করে - আর তাই আমরা দেখতে পাই।

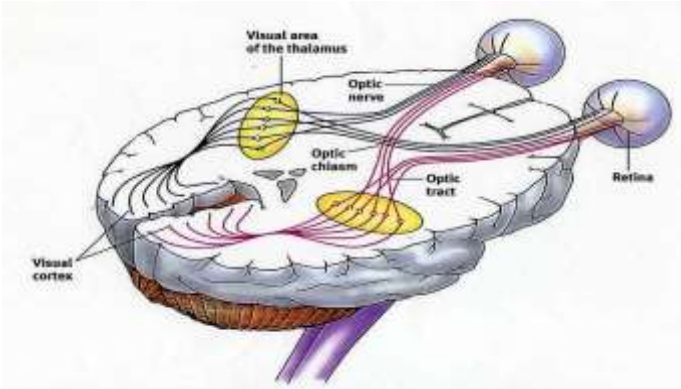

একটি শিশু জন্মানোর পরে তার এই চোখের ভিজ্যুয়াল ডেভেলপমেন্ট চলতে থাকে প্রায় সাত বছর অবধি। এবং কোনও কারণে যদি একটি চোখের দৃষ্টি অনেকটা ক্ষীণ থাকে অন্য চোখের তুলনায় - তা হলে আমাদের মস্তিষ্ক ক্ষীণ চোখের ইমেজ প্রসেস করতে পারে না। ব্রেন বলে – "অনেক হয়েছে - বাপু, তুই থাম। আমাকে অন্য চোখ অনেক ভাল ইমেজ পাঠাচ্ছে। তুই কি সব ঝাপসা ছবি পাঠাচ্ছিস? যা তোকে খেলাতে নেব না, তুই দুধ ভাত থাক। আমি ভাল ইমেজটাই

প্রসেস করি।” আর এই করতে করতে বাচ্চাটির ক্ষীণ চোখের ভিজ্যুয়াল ডেভেলপমেন্ট হয় না আর তখন এই শিশুটি কে আম্বল্যপিক (AMBLYOPIC) বলা হয়।

আম্বল্যপিয়া-র কারণ গুলি হল –

১) স্ট্রাবিসমিক - যদি একটি শিশুর দুটি চোখের মণির অ্যালাইনমেন্ট এক জায়গায় না থাকে। বা সোজা বাংলায় বলতে গেলে যদি একটি চোখ ট্যাড়া থাকে তাহলে ট্যাড়া চোখটিতে আম্বল্যপিয়া হতে পারে। শিশু অবস্থায় ট্যাড়া চোখ খুব শীঘ্রই চিকিৎসা বা তার ট্যাড়া হওয়ার কারণ খোঁজা অতি আবশ্যক। আবার অনেকেই ছোটবেলায় ট্যাড়া থাকেন চোখের পাওয়ার বেশি থাকার দরুন। এদের চশমা পড়লে কিন্তু ট্যাড়া ভাব কেটে যায়, আর অনেকসময় এই সব শিশুদের ট্যাড়া চোখটি আম্বল্যপিক হয়। ঠিক সময় মতন চিকিৎসা করলে মানে চশমা পরলে এদের ট্যাড়া ভাবটা কেটে যায় আর আম্বল্যপিয়ার চিকিৎসাও হয়। তাই একটি শিশু যদি ট্যাড়া হয়ে যায় মাঝে মাঝে তাহলে অতি অবশ্যই চোখের ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন। নিচের ছবিটি দেখুন। শিশুটি চশমা না পরলে একদম ট্যাড়া। অথচ চশমা পরলেই চোখ দু'টি সোজা হয়ে যাচ্ছে। সময় মতন এই বাচ্চাটি চশমা না পরলে এই শিশুটি ট্যাড়াও থেকে যেত আর ট্যাড়া চোখটি আম্বল্যপিক থেকে যেত।

অনেকেই কম বেশি ট্যাড়া থাকে, তারা কিন্তু সবাই আম্বল্যপিক নন। যেমন ধরুন ফিল্মষ্টার রিতেশ দেশমুখ - আমার ধারণা উনি আম্বল্যপিক নন। আবার বয়সকালে নানা কারণে লোকে ট্যাড়া হয়ে যেতে পারেন - এঁরা কিন্তু আম্বল্যপিক নন।

২) অ্যানিসোমেট্রোপিক - যদি একটি শিশুর চোখের পাওয়ার অন্য চোখের তুলনায় অনেকটাই বেশি বা কম থাকে তাহলে আমাদের মস্তিষ্ক সেই চোখের থেকে ইমেজগুলি প্রসেস করতে শুরু করে যেটার ইমেজগুলি মূলত একটু পরিষ্কার। জন্মের সাত বছরের মধ্যে এর প্রতিকার করলে নর্মাল ভিজ্যুয়াল ডেভেলপমেন্ট হয় -- তা না হলে আম্বল্যপিয়া হতে পারে। আমার মাসির আম্বল্যপিয়ার কারণ এইটি। ওনার ডান চোখের পাওয়ার +৬ ডিঅপট্রে আর বাঁ চোখের পাওয়ার +২ ডিঅপট্রে. দুটি চোখের মধ্যে প্রায় +৪ ডিঅপট্রে-র তফাত। আম্বল্যপিয়া না হয়ে যায় কোথায়। মাসির তিন বছর বয়সে আমার দাদু মারা যান। দেশভাগের পরে সর্বস্বান্ত হয়ে চলে আসা কলকাতায় আত্মীয়দের করুণায় বড় হতে থাকে নয়নতারা। তার একটি নয়ন যে ঝাপসা, সে খেয়াল কে-ই বা করেছে? তখন দিন আনতে পান্তা ফুরোয়, কে-ই বা ছোটো মেয়ের ‘চোখে ঝাপসা

দেখার আবদারে' কান দিয়েছে? কারই বা সময় বা পয়সা ছিল নয়নতারাকে চোখের ডাক্তার দেখানোর?

৩) স্টিমুলাস ডেপ্রিভেশন - ছানি মূলত বয়স্কদের হয়, কিন্তু অনেক সময় একটি শিশুর ভ্রূণ অবস্থায় বেড়ে ওঠার সময় কোনো গঠনমূলক গোলমালে শিশুদের ও ছানি হতে পারে। এখানে একটি শিশু, যে নিজে কিছু বলতে পারে না, দিনে দিনে প্রতিনিয়ত তার ভিজ্যুয়াল ডেভেলপমেন্ট পিছিয়ে পড়ে। আর এর ফলে আম্বল্যপিয়া হতে পারে। এই কারণে প্রত্যেক শিশুর জন্মানোর পরবর্তী কালে চোখের পরীক্ষা অত্যাবশ্যক। ইংল্যান্ডে প্রতি শিশুর জন্মের পরে শিশু রোগ বিশেষজ্ঞরা বা ট্রেইন্ড নার্সরা এই পরীক্ষা করে থাকেন। আমাদের দেশে বহু শিশু এই কারণে অন্ধ। অথচ ছানি অপারেশন একটি অতীব সহজ প্রসিডিওর. কিন্তু এইসব শিশুদের জন্মের খুব শিগগিরি এর ডায়াগনসিস করা প্রয়োজন।

আমার কাকিমাকে এই লেখাটা পড়তে দিয়েছিলাম। কাকিমা সম্প্রতি ঠাকুমা হয়েছেন। অর্ধেক পড়েই আমাকে ফোন – "বাবা রঙ্গু, বুচ্কুন এর আম্বল্যপিয়া নেই তো রে? বেঙ্গালুরুতে কাকে দেখাব তুই শিগগির বল, কালকেই বাবুকে বলব বুচ্কুনকে চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে।" "কাকিমা শান্ত হও, ওকে তো পেডিয়াট্রিশিয়ান জন্মানোর পরে দেখেছে ওরাই ওর ছানি আছে কি নেই নিশ্চয়ই দেখেছেন। তিন-চার বছর বয়সে একবার কাউকে দিয়ে একটু চোখের দৃষ্টি পরীক্ষা করিয়ে নিও তাহলেই হবে। দেখো, ওর গ্রোথ ঠিকঠাক হছে কি না। ও কখনো সখনো ট্যাড়া হয়ে যাচ্ছে কিনা। এইসব হলে তখন না হয় এক জন চোখের ডাক্তারের কাছে যেও। তুমি ভাল করে লেখাটা পড় - জন্মের সাত বছরের মধ্যে চিকিৎসা করলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আম্বল্যপিয়া'র বিহিত হয়।"

কাকিমা আবার চিন্তিত – "কি চিকিৎসা করবে রে? অপারেশন করবে নাকি? আহা এই ছোট বাচ্চা তাদের চোখে অপারেশন?"

- না কাকিমা, আম্বল্যাপিয়া অনেক সময়তেই আনকারেক্টেড রিফ্রাক্টিভ এরর-এর জন্যেও হয়।

- কি সব ডাক্তারি ভাষা আউরাস? আমি ওসব বুঝি নাকি? বাংলা কইরা ক.....

- সরি সরি, মানে ইসে, ইয়ে, ওই অনেক সময়েই ঝাপসা দৃষ্টির কারণে আম্বল্যাপিয়া হয়। তাই চশমা দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

কাকিমা আঁতকে উঠলেন - "কি কস? ঐটুকুন শিশুরে চশমা? এই বয়সে চশমা পড়লে বুড়া হইলে কি কর্বো?" উত্তেজিত হলেই কাকিমা বাঙাল ভাষাতে চলে যান।

"আহা কাকিমা, শিশু ঝাপসা দেখছে বলেই তো চশমা। এতে শিশুরা প্রথম প্রথম আপত্তি করে, কিন্তু যখন দেখে যে এতে ওরা ভালো দেখতে পাছে তখন ওরা চশমা পরতে ভালবাসে। আর এই বয়সে চশমা পরলে বুড়ো বয়সে চোখ বেশি খারাপ হবে এ কথা তোমাকে কে বলেছে? আমি বরং বলব যে এই বয়সে চশমা পরছে বলেই ভিজ্যুয়াল ডেভেলপমেন্ট পুরো হচ্ছে, যেটা এমনিতে হত না।"

কাকিমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন – "আচ্ছা এই জন্যেই কি এখন দেখি অনেক ছোট ছোট বাচ্চাদের চোখে চশমা? আমি ভাবতাম এত পড়ার চাপ আর সারাদিন টিভি, কম্পিউটার, প্লে-স্টেশন, এর জন্যে বোধহয় এখন বাচ্চারা বেশি চশমা পরে।"

"ঠিকই ধরেছ, এখন আম্বল্যাপিয়া অনেক বেশি ডায়গনাইসড হচ্ছে আর তাই চিকিৎসকেরাও এর বিহিত করছেন। ধর, চশমা দিয়েও যদি শিশুটির চোখের দৃষ্টির উন্নতি না হয় জানো তাহলে কি করে?"

কাকিমা কাঁচুমাচু স্বরে বললেন – "আমি কি করে জানব? আমি ডাক্তার না তুই ডাক্তার? নিশ্চয়ই অপারেশন?"

"আরে না না, তুমি খালি অপারেশনেই আটকে আছ। অক্লিউশান (OCCLUSION) করা হয়, মানে ভাল চোখটাকে ঠুলি দিয়ে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এতে কি হয়, যেই চোখের দৃষ্টি কম সেই চোখকে দিয়ে জোর করে কাজ করানো হয়। এই যে আলসে চোখ (লেজি আই), বাছা ওঠো তো, অনেক হয়েছে। তুমি একটু চেষ্টা কর। ব্রেন বেচারি আর কি করে?

ভাল চোখে তো ঠুলি পরানো। তাই ক্ষীণ চোখের দৃষ্টি দিয়েই কাজ চালাতে হয় আর ক্ষীণ চোখের ভিজ্যুয়াল ডেভেলপমেন্ট চলতে থাকে। এটা না করলে ডেভেলপমেন্ট চলত না। আলসে চোখ আলসেই থেকে যেত। আর আমার নয়ন মাসির মতন একদিন ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করত যে এক চোখে দৃষ্টি কম, কিন্তু তখন কিছু করার থাকবে না।"

"বাহ বেশ ভাল বললি তো, বুঝলাম! কিন্তু এই বাচ্চাগুলোকে চোখে ঠুলি পরিয়ে রাখবি, তাও আবার সেই চোখে যেটা দিয়ে কিনা সে ভাল দেখতে পায়। ওরা তোর কথা শুনবে কেন? শিশুরা তো আর বোঝে না আর বললেই ওরা তো সেটা শুনবে না।"

“একদম ঠিক বলেছ কাকিমা, এটা একটা জেনুইন প্রবলেম আম্বল্যপিয়া ট্রিটমেন্টের। বাবা মা কে যথেষ্ট মোটিভেটেড হতে হয় আর বাচ্চাকে না বকেঝকে এটা করতে বললে বাচ্চারা অনেক সময় শোনে। এখন অনেকেই অক্লিউশান থেরাপির বদলে পেনালাইজেশন টেকনিক ব্যবহার করে।”

“বাবা রে কিসব বিদঘুটে নাম। মনে রাখিস কি করে? তুই তো এগার-র পরে নামতাই মুখস্ত রাখতে পারতি না।”

"হা হা হা হা, তোমার মনে আছে? পেনালাইজেশন অর্থাৎ পেনাল্টি বা শাস্তি দেওয়া। মানে ভাল চোখকে শাস্তি দেওয়া। অ্যাট্রোপিন এর নাম শুনেছ?”

“বাবা, তা আবার শুনব না? মেডিক্যাল কলেজে তোর স্যারকে দেখাতে গেলাম। উনি অ্যাট্রোপিন দিয়ে বসিয়ে রাখলেন। তোর কাকু কে ফোন করব কি--দেখি সব ঝাপসা।”

“ঠিক! ঠিক এই কারণেই আমরা অ্যাট্রোপিন ব্যবহার করি। বাচ্চা চোখে ঠুলি পড়তে আপত্তিও করার ঝামেলা নেই, এদিকে ভাল চোখে ঝাপসা দেখবে (অ্যাট্রোপিন ব্যবহারের জন্যে) আর তাই ক্ষীণ দৃষ্টিওয়ালা চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করবে আর ভিজ্যুয়াল ডেভেলপমেন্ট চলতে থাকবে।”

আমার নয়ন মাসি অনেক ভাগ্য করে এসেছেন । তাই সব জেনেও মাসির শাশুড়ি ওঁকে বাড়ির বউ করে বরণ করে নিয়ে গেছেন। মাসি ভাগ্যবতী যে ওঁর একটি চোখ সম্পূর্ণ সুস্থ আছে এবং সেটি দিয়েই সমস্ত পূজাবার্ষিকী গোগ্রাসে গিলছেন আর সময় পেলেই রং তুলি নিয়ে বসছেন ছবি আঁকতে। অনেকেরই ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন নয়। তাই এক চোখে আম্বল্যপিয়া আর অন্য ভালো চোখটির দৃষ্টি কোনও কারণে চলে গেলে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান অনেকেই। মানুষের অন্ধত্ব একটি খুবই বড় প্রতিবন্ধকতা। আমাদের সৃষ্টিকর্তা জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির ব্যাকআপ দিয়ে রেখেছেন যাতে কোনো কারণে একটি অকেজো হয়ে গেলে, অন্যটি তার পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে।

ব্যাকআপ না থাকলে বড় অসহায় লাগে। সৃষ্টিকর্তা আমাদের যা দিয়ে পাঠিয়েছেন প্রতিকূলতার সময় আমরা যাতে তা ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখতে পারি, তার জন্যে দুই চোখের পুরোপুরি ভিজ্যুয়াল ডেভেলেপমেন্টের বিশেষ প্রয়োজন। আর এই ডেভেলপমেন্ট জন্মের সাত বছরের মধ্যেই হয়ে থাকে। তাই আম্বল্যপিয়া-র চিকিৎসা খুব জরুরি।

ছবি – গুগল ইমেজেস

মার্কিনে প্রথম যখন আমি

সীমা ব্যানার্জ্জী-রায়

১

একদিন জাম্বো জেট এয়ারলাইন্সে হু উ উশ্ করে চলে এলাম সব পেয়েছির দেশে। প্রথম এসেছি মার্কিনে মানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। নিউ ইয়র্কে নেমেই হাতে পেয়ে গেলাম এখানকার পার্মানেন্ট থাকার পরিচয়পত্র মানে আমেরিকান গ্রিন কার্ড।

ভারতের কলকাতা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ঘুরে শেষে এই মার্কিন মুলুকে চিরস্থায়ী বসবাস - বেশ কৌতূহলী হাবভাব। সবাই বলে এখানে প্রথম এসে নাকি খুব একা লাগে -আমার কিন্তু তেমনটি লাগে নি। কারণ একটাই, যা হয়ত সবার থাকে না। আমার পুরো মাত্রায় ছিল।

সবার ছোট, কাজেই দাদা-বৌদি, দিদি-জামাইবাবু আর আত্মীয়স্বজন-দের ভিড়ে বেশ আহ্লাদি আহ্লাদি ভাব। মনেই হচ্ছিল না যে, আমি একটা সম্পূর্ণ নতুন দেশে এসেছি। যেন এক শহর থেকে অন্য শহরে এসেছি বেড়াতে।

প্রথম এলাম আমার বড় দাদার কাছে নিউ হ্যাম্পশায়ার-এ। মা বাবাকে ছোট বেলায় হারিয়েছি, কাজেই দাদা-বৌদি, দিদি-জামাইবাবুরা আমার শ্রদ্ধেয় এবং শ্রদ্ধেয়া। আমি তাঁদের আদরের ও স্নেহের পাত্রী ।

দুই দিন যেতে না যেতেই দাদা-বৌদির বান্ধবীদের সার্কেলে নিমন্ত্রণের পালা শুরু হল। আমার মনে হল, কে কত রকম রান্নার আইটেমস্ খাওয়াতে পারেন তার একটা চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা।

প্রথম গেলাম দাদার বন্ধু এক্স-দার বাড়ি ওঁনার ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে। গিয়ে তাজ্জব বনে গেছি, বাচ্চাদের তো কাউকে দেখছি না, গেল কোথায় খুদেগুলো? একটু টুঁ শব্দও নেই কোথাও।

আমি আবার বাচ্চাদের সাথে মিশতে খুব ভালবাসি কারণ সেই একটাই ছোট থেকে ভাইপো-ভাইঝিদের মনোরম সান্নিধ্য।

একটা চেয়ারে বসে একবার বৌদিদের গ্রুপে আর একবার দাদাদের গ্রুপে দেখছি আর তাঁদের আলোচনা শোনার চেষ্টা করছি।

বৌদিদের গ্রুপে গল্প চলতে লাগল কার ছেলে মেয়ে কত বেশি আমেরিকানাইজড্; তারা কে কে গড গিফ্টেড, কার কত দামি শাড়ি আর গয়না, কে কি ভাবে ঘর বাহির এক সাথে সামলান।

আর দাদাদের গ্রুপে আলোচনা এগোতে লাগল কার কত ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, কলকাতায় বা এদেশে কার কত দামি বাড়ি, গাড়ি, স্টক মার্কেট তাই নিয়ে। সে এক এলাহি কান্ড কারখানা।

আমি তো অবাক হয়ে বেশ গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। আমার ভাইপো বাড়িতে ঢুকেই তর্ তর্ করে ওপরে উঠে গেল কাউকে কিছু না বলে। মনে হলো সব কিছুই একটা ছকে বাঁধা নিয়ম।

আমি বেচারি হংস মাঝে বক যথা।

যাই হোক, খাওয়া দাওয়া তো একপ্রস্থ হলো, সেখানেও মারহাব্বা। অত খাবার দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ।

কি নেই খাবারে? চপ, শিঙারা, শাক, মাছ-মাংস, চাটনি থেকে শুরু করে দই, মিষ্টি, আইসক্রিম। নানা রকম পানীয়ের ব্যবস্থাও একেবারে সুষ্ঠুভাবে।

কিচেন টপ থেকে দু'খানা টেবিল ভর্তি সব চোখ ধাঁধানো খাবার। মনে মনে ভাবলাম, সত্যি এখানকার মহিলারা আর পুরুষেরা দ্রৌপদী ও বিশ্বকর্মা। বলে রাখি, এই এক্স-বৌদি আবার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। ঘর বাড়ি দুই সামলান। দুষ্টু দুই ছেলে মেয়েকেও সামলান একই সাথে।

দেখলাম, বাচ্চাদের জন্য পিস্জা দিয়ে গেল পিস্জাম্যান। সেই পিস্জারাও চলে গেল ওপরে। আজব তো!

মনে দারুন একটা কিউরিওসিটি, দেখি মনটা ওপরে যাবার জন্য ছটফট করতে লাগল, তাকে স্থির থাকতে বললাম। আবারও ভাবছি একবার ওপরে গিয়ে দেখলে কেমন হয়?

কিন্তু প্রথম এসেই এইরকম বেয়াদপি করা আমার শোভা পায় না। অনুসন্ধিৎসু মনকে কঠোরভাবে শাসন করলাম এই বলে, "চুপসে দেখে যাও শুধু, এখন তোমার কেবল দেখার পালা। উলটো পালটা করলে হিতে বিপরীত হতে পারে।"

মন বাবাজি শান্ত হল।

২

সবাইকে বেশ তৃপ্তি করে খেতে দেখলাম, তার মানে খাবার বেশ সুস্বাদু তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। লজ্জা এবং অবাক এই দুইয়ের সংমিশ্রণে খাবার খাওয়া আমার শিকেয় উঠেছিল, তা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই। এইবার বাই বাই করে বাড়ি ফেরার পালা। যে যার বেবিদের হাঁক ডাক শুরু করে দিয়েছে।

উৎসুক মন জিগেস করল 'কেক কাটলো না তো বেবি?'

নিজেই উত্তর করলাম - হয়তো আগেই কাটা হয়ে গেছে। বেয়াদপ মন মিন মিন করে জিজ্ঞেস করেই ফেলল -

-কই! বার্থ ডে বেবি-কে তো দেখছি না- বৌদি?

এইবার মায়ের মিঠে অথচ নাকি সুরে ডাক শুরু হল ......

-রউউউণ, খাআআম দাউউউউউউউন প্লিজ! নি ই চে এসো, দেখ কে এসেছে এ?

এগার বছরের ফুটফুটে ছেলে রণ দৌড়ে দৌড়ে নিচে নেমে এলো। মা পরিচয় করিয়ে দিলেন

-তোমার এ্যান্ট, মানে তোমার বাবার বোন, বাঙলায় পিসি বলে। তুমিও পিসি বলবে

-ও ও খে...এই !

রণ হাতের পাতা দুটো উল্টিয়ে ঘাড় ঝাঁকিয়ে ঠোঁট দুটোকে চিপে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। আমি বললাম সেই ছোট্ট রণ-কে – "তুমি বাংলা বলতে পার?" সে বলল – "আমাকে ইকঠু ইকঠু বুজথে পারে ঈ, কিন্টু বোলথে পা- আ- আ- রে- এ- এ- না- আ- আ।"

মায়ের মুখ গর্বে ভরে উঠতে দেখলাম। এবার আবার মা বললেন

-রঅণ, নিল ঢাউউউউন হ ওও।

বোকা আমি মনে মনে ভাবছি নিল ডাউন হতে বলছেন, কেন রে বাবা?

আড়চোখে একবার আমার দাদা বৌদির দিকে তাকিয়ে আবার বার্থডে বেবির মায়ের দিকে তাকালাম। এবার ওঁনার কথা –

-নিল ঢাউউউউন হও, হয়ে পিসির পা ঠাচ্ করো, করে হ্যান্ড-টা মাথায় দাও ।

আমি বললাম - সে কি? না ননা না! অত করতে হবে না। ওইটুকু ছেলে – ওসবের কি দরকার আছে?

মা বললেন – "না... না আ না! সব শেখানো দরকার, ভবিষ্যতে নয়তো মুশকিলে পড়বে। তখন এই মাকে-ই দোষারোপ করবে।" বলেই বললেন - "কিছুতেই বাংলা বলবে না, জান তো। দেশে

গেলে যা মুশকিলে পড়ি না... কি বলব। এবার এখানকার বাংলা স্কুলে দেব ঠিক করেছি... তাহলে, যদি একটু বাংলা বলে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে।”

ওই রণ একদিন এল আমাদের বাড়ি ওর বাবার সাথে, দেখি আমার ভাইপোর সাথে দিব্যি বাংলায় কথা বলছে। বলে রাখি আমার ভাইপোর এই মার্কিনেই জন্ম কিন্তু পাকা বাঙালি -ভাত, ডাল, পোস্ত তার প্রিয় । আর বাংলা কথা? তা না হয় আর বললাম না।

এবার আসল কথায় আসা যাক, আমি জিজ্ঞেস করলাম

-রণ, তুমি কি সুন্দর বাংলা বলছ তো? কিন্তু সেদিন কেন ওইরকম ভাবে বলছিলে?

রণ যা বলল তার ছোট্ট করে হলো - পিওর বাংলা বললে, মাম এ্যা...ঙ...রি হয়, তাই বাড়িতে কেউ আসলে মাম-এর সামনে ওইরকম ভাবে বলি।

মায়ের সাথে তো বাংলায়-ই ঠক্ করি ইভিন ড্যাডির সাথেও। মা মাঝে মাঝে ইংরাজি বলতে বলে মায়ের সাথে, তবে সব সময় না।

আমি তো অবাক মানে একেবারে হতবাক।

আহা রে ! ক্ষুদে রণ !

মন বলে উঠল - বাংলা মা হারা বাঙালি শিশু।

“মানুষের কোনো কথাটাই সোজা নয়। আমরা ডিক্‌শনারিতে যে কথার এক মানে বেঁধে দিই, মানবজীবনের মধ্যে মানেটা সাতখানা হয়ে যায়,সমুদ্রের কাছে এসে গঙ্গার মতো।”

“থ্রি চিয়ার্স ফর মার্কিনি বাঙালি মা”!!!!!!!

শর্তাধীন প্রেম

মৌ দাশগুপ্তা

আমি খুব ঘনঘন প্রেমে পড়ি।

কৈশোরে চেয়েছিলাম, “আমি হব তোমার জীবনের একমাত্র নারী।”
এ শর্ত আদৌ গ্রাহ্য হল না।
প্রেম খারিজ।

তরুণী আমি বলেছিলাম “আমি হব তোমার জীবনের প্রথম নারী।”
মিথ্যার সাথে সহবাসে রাজি হইনি।
প্রেমে অসফল।

যৌবনে চেয়েছিলাম “আমি হব তোমার জীবনের সর্বশেষ নারী।”
পরিপাটি সহাবস্থানের ফাঁক দিয়েও ভুলের বিষাক্ত সংক্রমণ,
এড়ানো গেল না।
প্রেমে ব্যর্থ।

কবি বললেন, শর্ত মেনে প্রেম হয় না।
প্রেম নিঃশর্তেই ছড়িয়ে যায়।
বাদলা হাওয়ার স্পর্শের মত,
সুখের গভীরে লুকিয়ে থাকা অসুখের মত।

অনেকটা পরাজয় মেনে আজ মধ্যবর্তিনী নিঃশর্ত প্রেমিকার ভূমিকায়,
কারো জীবনের একমাত্র,
প্রথম বা শেষ নারী নই,
আজ আমিও একটার পর একটা মুখোশ পাল্টাই,
আরো একটা... আর ও একটা!!!

বেরঙিন

রঞ্জন সাহু

ঠান্ডা শীতের রাত
কুয়াশায় ভিজছে যখন
ধান কাটা মাঠ...
তুমি আমায় একটু একটু করে
ভুলে যাচ্ছ...
জমে থাকা স্মৃতি সোনা
ক্ষইছে...
হিমের পাথরে ঘষে।
সেই কোন চৈত্রের
মুক্ত ঝরা পাতা দুটি
হারিয়েছে ফুরিয়েছে...
ভরা অঘ্রানের আলপনা সাঁঝে।
বিরহ রাগিনী সুরে কুয়াশা ঝরে
সারা রাত ভিজে যায়
ধান কাটা মাঠ...
ভোরের ম্লান আলো হয়ে ফোটো তুমি
আমি বেরঙিন কুয়াশা.....

ভীষ্ম তুমি একা নও

জয়ন্ত দাস

ভীষ্ম তুমি একা নও -
শরশয্যায় - দেখ আমিও তোমার পাশে মুমূর্ষু সৈনিক এক।
আমার মাথা ঝুলে আছে তোমার মতো -
হে যুদ্ধনিপুণ অর্জুন, হে দুর্যোধন -
আর একটি তীক্ষ্ণ শরশব্দে
আমার মাথা তুলে দাও শয্যা বরাবর।
তৃপ্তির নির্দোষ চোখে এস সমরবিশারদ
আমার সমাজে যারা যারা ক্রুর যুদ্ধবাজ...
আমি ঘুমিয়ে পড়ব এক্ষুনি...
আয় ঘুম আয় ঘুম চোখে ঘুম দে!
আমাকে জাগাতে চেষ্টা কর না সুহৃদজন -
আমার হৃদয় খনন করে দেখতে চেয়ো না আর...
আমি হৃদয় নিয়ে থাকতে চাই
ভীষ্মের নীরব শয্যাপাশে আর একটি শরশব্দে
আমার মাথা তুলে দাও তোমরা শয্যা বরাবর।

আবদার

রুদ্রদীপ মজুমদার

অদৃষ্ট,
তুমি বলার আগেই বুঝে নিয়েছি
যে আমায় দিয়ে খুশি করবে
তোমার কাছে এমন গরম দিলখুশ আর পড়ে নেই ।

তবু সময় থাকলে তোমার পাওনা- গণ্ডার খাতায় একটা
আবদার লিখো আমার ।

আমাকে রাতের শেষ ট্রেনে একটা খালি কামরা দিও,

কামরার আলোর সুইচে তুমি হাত রাখো বা আমি ,
আলো বন্ধ হওয়া চাই ।।

আমার কান এখন একটাই শব্দ চাইছে ,
ঘুমন্ত লোকালয় চেরার শব্দ ।।

পাত পাত কেটে রাখা ঘুম - শান্তি - আরামের স্তূপ ট্রেনের চাকা
থেকে ছিটকে বেরনো অলুক্ষুনে হাওয়ায় এলোমেলো হোক ।।

নির্জন কামরায় বসে দুদণ্ড ঈশ্বর হবো,
পেটাপিটি , লাথালাথির থেকে অনেক আলাদা
জলজ্যান্ত খেলা দেখবো আমি ।।

জন্মদিন

সত্র্যজিত

গতবার জন্মদিনে তুই
কিছুই চাসনি আমার কাছে...
তবুও একটা আকাশ আনতে চেয়েছিলাম...
আকাশ আমার বন্ধু ছিল,
ভেবেছিলাম, এই তো আছে হাতের কাছে
রোজই দেখি সকাল সন্ধ্যে,
বলব যখন, দিব্যি আসবে চলে.
তাই আমি সেদিন রাত্রে
বলতে গেছি আমার আকাশটাকে
“চল এবারে, আর দেরি নয়”
আকাশ বলে “পারব না যা,
রাংতায় মোড়ানো উপহার
হতে পারব না আর,”
দু:খ নিয়ে ফিরে গিয়েছি
আর তারপর,
আমার সেই লুকোনো তারাদের
থেকে এক মুঠো স্বপ্ন নিয়ে
আমি তোর বাড়ির সামনে....
.....“রোখকে রোখকে,
কোথা যাস বেয়াদব,
জানিস না, আজ এ বাড়িতে আকাশ এসেছে

আমাদের দিদিমনির জন্মদিনে....

দূর হয়ে যা অবিলম্বে”

আঙুলের ফাঁক দিয়ে উবে যেতে থাকে

আমার ধার করা স্বপ্নের রাশি..

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি,

নীল আকাশের গায়ে একটুকরো বিবর্ণ মেঘ

অনায়াসে আমার সূর্যকে আড়াল করে দিয়েছে....

দেবদূতের চোখে কলকাতা

সৌরভ কুমার দাস

এতদিন পর, এই বর্ষার প্যাচপ্যাচে গরমে
আবার দেখা সেই পরিচিত দেবদূতের সাথে,
‘ভদ্রলোক’ দেখি এক ভাঙা সাইকেলে করে
একেবারে ভিক্টোরিয়ার সামনে।

কলকাতা শহরের নান্দনিক জায়গায়
সাইকেলের তো কোনও ভূমিকা নেই,
পরে মনে হল
দেবদূতকে তো পুলিশ দেখতে পায়না।

কাছে গিয়ে জানালাম
আমার অস্থিরতার কথা, চাকরি, মাইনে নামে
কতগুলো অসার বস্তুর কথা।
দেখি ভাঙা সাইকেলটা দেখিয়ে
মুচকি হাসছে দেবদূত।

জিজ্ঞেস করলাম আমাদের শহরটা কেমন লাগছে?
সাইকেলে চড়ে চলে যেতে যেতে ও
ঠিক ওরই মতো বেমানান
একটা কবিতা শুনিয়ে দিয়ে গেলো –
“এখানে স্বপ্ন ভেসে আসছে
চিলের ডানায় চড়ে,
ঝুপ করে নামে যৌন ইচ্ছা

চোখের ইশারা ক'রে।
আটটা মাত্র তলার বাড়ি
আকাশ সমান লাগে,
এখানে নষ্ট জীবন দেখে
বাঁচার ইচ্ছে জাগে।
কবিতারা সব এই শহরের
ভীষণ পরাঙ্মুখ,
সুস্থ এখানে ওষুধ চিবায়
অসুস্থ –অসুখ।"

যা দেবী পিকআপযানেষু

প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম দৃশ্য

কৈলাস। দেবাধিদেবের বাসস্থানের গুহামুখ। দ্বাররক্ষী নীচে মর্ত্যের দিকে দূরবীন তাক করে নিবিষ্ট চিত্তে অবলোকন করছে, এদিকে তার শিরস্ত্রাণ যে খসে পড়তে চলেছে তাতে হুঁস নেই। এমন সময়ে চকাসদার প্রবেশ

চকাসদা - (দ্বাররক্ষীকে ঝাঁকুনি দিয়ে) কি মামা, গুগল আর্থে কি দেখছ? উরি কি ঠাণ্ডা রি! (দ্বাররক্ষীর শিরস্ত্রাণ খসে পড়ে)

রক্ষী - (চকাসদাকে লক্ষ না করে শিরস্ত্রান তুলতে তুলতে) কোথায় কি প্যান্ডেল বানাচ্ছে দেখছিলাম।

চকাসদা - প্যান্ডেল বানানো দেখছিলে না বিগবসে চান করা দেখছিলে?

রক্ষী - (চকাসদাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে) অ্যাই তুই কে র‍্যা! অসুরের চ্যালা বুঝি! স্বর্গে হামলা করা শুরু হয়ে গেছে তো?

চকাসদা - (রেগে গিয়ে) আমার থোবড়া দেখে তোমার তাই মনে হচ্ছে! আরে মাটি থেকে মানুষ এসেছি, মাকে নিয়ে যাব। সর তো! মা কোথায়?

রক্ষী - ও তা বলবি তো। (গুহার ভিতরে আঙুল দেখিয়ে) ওই যে মা হেঁসেলে। সোজা চলে যা।

(গুহামুখের পাশে একটি ময়ূর ঝিমোচ্ছে)

চকাসদা - অব্বাওয়া! কাত্তিকদার ময়ূরটা তো কেতরে পড়ে আছে। খেতে টেতে পায় না নাকি! এ তো যেতে যেতে যার-তার বাড়ি কাত্তিক ফেলে দেবে! ম্যারেড-আনম্যারেড মানবে না। এসব বাহন-টাহন এখন চেঞ্জ করা দরকার।

(চকাসদা গুহামুখ দিয়ে প্রবেশ করল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

উমার রন্ধনশালা। ভৃঙ্গি একটা শিং প্যাঁচ দিয়ে খুলে সেটাকে নোড়া বানিয়ে বাটনা বাটছে। নন্দী হাঁড়ির চাল ধুচ্ছে। উমা কড়াইতে খুন্তি নেড়ে রান্না করছেন।

উমা - বলি ও নন্দী আর দু'মুঠো চাল ফেলে দে হাঁড়িতে, ঠাকুর নিতে এল বাড়িতে।

(চকাসদার প্রবেশ)

চকাসদা - (ঘাড়টা নিচু করে ডানহাতের তর্জনিটা নাকে আর বুকে দুবার ঠুকে) মা, তোমায় পিকআপ করতে এসে গেছি।.

উমা - সে তো আমি তৃতীয় নয়নে আগেই দেখে নিয়েছি। কিন্তু ওটা কী করলি বাবা?

চকাসদা - কেন, ঠাকুর নমসকার করলাম।

উমা - নমস্কার করতে অত কষ্ট যখন, নাই বা করলি বাবা। আমি তো এমনিতেই তোদের আশীর্বাদ করছি।

চকাসদা - মা তুমি বুঝছ না। এটা তো সটকাট। পোত্যেক পাড়ার খোপে খাপে চার পাঁচটা করে সনিমন্দির, কালীমন্দির রয়েছে। দাঁড়িয়ে দু'হাত জড়ো করে পোনাম কত্তে কত্তে দিন কেটে রাত কেটে ভোর হয়ে সকালের খবরের কাগজে বাল ঠাকরের মিত্যু সংবাদ চলে আসবে। তাই সটকাটও হল, ইস্টাইলও হল। আমি তো তাও কল্লাম, আদ্দেক লোক তো পোনাম কত্তে গিয়ে আঙুলে জড়িয়ে মোবাইলের হেডফোন খুলে যায় বলে তাও করে না।

উমা - আচ্ছা ঠিক আছে। ঘরে গিয়ে বোস আমি যাচ্ছি।

চকাসদা - না মা, আমার বেসি সময় নেই। পাড়ায় বহুত কাজ আছে।

উমা - তা সময় নেই যখন এতটা পথ এলি কেন বাবা?

চকাসদা - কি করব বলো! আমাদের কমিটির নতুন নিয়ম হয়েছে, পপার সেপটি দিয়ে ঠিক টাইমে পৌঁছবার জন্য লেডিস ঠাকুরদের পিকআপ ফেসিলিটি দেওয়া হবে। সঙ্গে গনেসদা-কাত্তিকদাও যাবে। ভোলেবাবাও যাবেন। কিন্তু দসমীর দিন এদ্দুর ড্রপইন দেওয়া যাবে না। যে যার বাহন-মাহন চড়ে কৈলাস ফিরে যাবে। আমরা সুধু ঝ্যাঁপর ঝ্যাঁপর করতে করতে নেচেকুঁদে ঘাট অবধি সিঅব করে দিয়ে আসব। নাও, চল মা। তোমাদের পিকআপ করার জন্য হেব্বি গাড়ি এনেছি। বরফের ওপর পার্ক করা আছে।

উমা - কি এমন গাড়ি এনেছিস বাপু! নিয়ে তো যাবি ম্যাটাডর ভাড়া করে। হয়ত তার আগেই সেটায় মড়া নিয়ে গেছে।

চকাসদা - না, মাগো না। এবার ঘোড়ার গাড়ির ঝক্কাস ক্যারাভ্যান নিয়ে এসেছি। পেট্রল-ডিজেলের খচ্চা নেই, পলিউসানের কাঁই-কিচ্যান নেই। দোলায় বা গজেমজে যেতে এন্তার দেরি হয়ে যায়। এখন তো আর আগের মতো নেই মা। চতুত্থি থেকে পুজো ফুল সুরু হয়ে যাচ্ছে।

উমা - ও। তা ঘোড়ার গাড়ি অত দূরে ঠান্ডার মধ্যে রেখেছিস কেন? গুহার সামনের উঠোনে নিয়ে আয় না বাছা। এসি চালানো আছে, একটু গরম ভাপটা পাক।

চকাসদা - পাগল! এসির হাওয়া খাবে কি? এ কি সপিং মলে বেড়াতে এসছে! ঘোড়াগুলো গড়ের মাঠে ঘুরঘুর করছিল, বুঝলে তো। তোমাকে নিয়ে যাবার লোভ দেখিয়ে ছ'টাকে ধরেছি। ব্যাটারা

হেবি হারামজাদা। সারা রাস্তা আনন্দে চেল্লামিল্লি করে করে কানের মাথা খেয়েছে। তাই আমি বলে এসছি, কান ধরে ঝাড়া দু'ঘণ্টা বোস থাকবি, একদম দাঁড়াবি না। হে হে, ব্যাটারা ঘোড়ার জাত তো, ওদের বসাটাই পানিসমেন্ট।

তৃতীয় দৃশ্য

উমার বসবার ঘর। তিনি গোছগাছে ব্যস্ত, চকাসদা হাতে হাতে সাহায্য করছে। নেপথ্যে নানা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে

কার্তিক - মা! আমার পিঠ চুলকোবার বাণটা কোথায় গেল?

সরস্বতী - মা! আমার বীণার তার ছিঁড়ে গেছে।

গণেশ - মা! আমার ভাঙা দাঁতটা পাচ্ছি না। টুথপিক না পেলে মর্ত্যে যাব কী করে বলো তো!

মহাদেব - গৃহিনী! মম ভস্মদানীটি দেখিয়াছ? আমার যে গাত্রে লেপন করিবার নিমিত্তে বিশেষ প্রয়োজন।

লক্ষ্মী - মা! তোমার সাপটা গেল কোথায়? সাপকেসে নেই তো!

উমা - (চেঁচিয়ে) দাঁড়া রে বাবা দাঁড়া। এতগুলো কাজ একসঙ্গে সামলানো যায়! আমার তো দশটাই মাত্র হাত, নাকি!

লক্ষ্মীর প্রবেশ। ভিজে চুল গুটিয়ে মাথার উপরে জড়ো করে রাখা।

চকাসদা - এইত্তো কমলাদি এসে গ্যাছে। রূপকুণ্ডে চান করতে গেছিল। দিদি, রেডি তো?

লক্ষ্মী - অ্যাই তোরা এবার বাচ্চাবুড়ো মিলে হোলসেলে দিদি ডাকাটা বন্ধ কর তো। দিদিমা হবার বয়স হল এখনও দিদি বলে ডাকছিস!

চকাসদা - বা রে! মায়ের মেয়েকে দিদি বলব না?

লক্ষ্মী - (চকাসদার পায়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে) দেখে, সাপ!

(চকাসদা মেঝেয় পড়ে থাকা একটা সাপকে খেয়াল করে 'আইব্বাপ' বলে লাফিয়ে ওঠে। লক্ষ্মী ভাবলেশহীন নেত্রে সেটিকে তুলে নিজের চুল খুলে ফেলে সেই সাপ দিয়ে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে—)

লক্ষ্মী - আর একটু হলে তো সাপটাকে মাড়িয়ে ফেলছিলিস। হ্যাঁ রে, মর্ত্যের খবর কি?

চকাসদা - তোমার দয়ায় মত্তের হাল তো বেহাল হয়ে যাচ্ছে কমলাদি।

লক্ষ্মী - কেন রে? আমি আবার কি করলাম? কারও সাতে নেই পাঁচে নেই।

চকাসদা - সাতে পাঁচে সবেতেই আছো কমলাদি। শুধু তুমি পাবলিকের হাতে নেই। আর, ওই যে মত্তের দিকে চুল ঝুলিয়ে ঝাড়ছ, এই জন্যেই তো ওখানে সারাদিন ধরে ঝিরঝির ঝিরঝির বিষ্টি পড়েই চলেছে। চাদ্দিক কাদা প্যাচপ্যাচ। এবার পুজোয় কী হবে কে জানে। মা, গনেসদা কই গো?

উমা - গণুটা খেলতে গেছে রে।

চকাসদা - গনেসদা খেলতে যাচ্ছে কবে থেকে আবার! চিকনা ভুঁড়িটায় হাত বুলিয়ে চকাস করে হামি খেতাম সেটাও আর হবে না। এই বুড়ো বয়সে খেলা ধরল কেন গো? হাঁপ ধরে যাবে যে!

উমা - একদম আমার গণুকে বুড়ো বলবি না। ও আমার ছোট্ট খোকা। তাছাড়া ওর খেলায় কোনও ধুলো নেই। তেতলায় ওর ঘরে বসে ভিডিও গেম খেলছে। ও, গণুর কথায় মনে পড়ল, হ্যাঁরে, এবারে মর্ত্যে গিয়ে আগে গণুকে একটা ভাল দাঁতের ডাক্তার দেখাবি তো।

চকাসদা - কেন গো মা? গনেসদার গজদাঁত খুলে গ্যাছে, নাকি পোকা ধরেছে?

উমা বালাই ষাট! ও কি তোদের মতো ছাইপাঁশ খায় নাকি যে ওসব হবে! আসলে গতবার যখন মর্ত্যে গেলাম তখন খুব গরম পড়েছিল। তার ওপরে চার-পাঁচদিন ধরে প্যান্ডেলের বদ্ধ পরিবেশ একগাদা চড়া আলোর সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা! আমার কেতোটা আর গণুটা খালি গায়ে থাকে তো, ওদের পিঠে ঘামাচি হয়ে গিয়েছিল। কেতোটা তো তবুও ভোঁতা তির দিয়ে চুলকোতে পেরেছিল। গণুর তো শুধু শুঁড় দিয়ে বোলানো ছাড়া আর কিছু করার নেই। তাই এবারে গিয়ে ওর শুঁড়ের ডগায় দুপাটি মানুষের দাঁত লাগিয়ে দিবি। দরকার পড়লে শুঁড় বাগিয়ে চুলকে নিতে পারবে।

(কার্তিকের প্রবেশ)

কার্তিক - মা, আর সহ্য হচ্ছে না। এবার আমি হেয়ার স্ট্রেটেন করাব আর স্পাইক করাব ব্যস। এই বাবরি চুল আর —

চকাসদা - কাত্তিকদা, নমস্কার। আরে তোমার ময়ূরটা তো দেখলাম চোখমুখ উল্টে একেবারে কেলিয়ে গেছে। চাদ্দিন ধরে তোমাকে পিঠে নেবে কী করে?

কার্তিক - (হেসে) আরে ওটা অ্যাকটিং করছে।

চকাসদা - মানে?

কার্তিক - মানে আর কি। পুজোয় তোরা তো যত পারিস ননভেজ খাস। শুধু প্যান্ডেলের মধ্যেই তোদের যত নিরামিষ খাওয়া পেয়ে যায়। আরে আমরা তো চালিয়ে নিই, কিন্তু বেচারা বাহনগুলোর কি অবস্থা হয় ভেবে দেখেছিস? ইঁদুর, পেঁচা, ময়ূর, হাঁস, সিংহ — কে ননভেজ খায় বলতে পারিস? ওদের তো চারটে দিন উপোস দিতে হয়।

চকাসদা - ইয়ে, মানে কাত্তিকদা, এটা ভাবিনি তো।

কার্তিক - তা ভাববি কেন! গত বছর প্যান্ডেলে আমার ময়ূর আমাকে পিঠে নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল। নবমীর দুপুরে আমি বললাম এখন একটু ফাঁকা আছে যা, প্যাণ্ডেলের পিছনে পাঁচ টাকার কেঁচো রাখা আছে, ম্যাগি বানিয়ে খেগে যা। গিয়েই বেচারা প্রাণ নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল। আমি ভাবছি দু'মিনিটও হল না ওর ম্যাগি বানিয়ে খাওয়াও হয়ে গেল!

চকাসদা - কি কেস গো কাত্তিকদা?

কার্তিক - কেস আবার কি! প্যান্ডেলের পিছনে ক'টা ছেলে কি সব হাবিজাবি খাচ্ছিল, ওকে দেখতে পেয়েই 'ময়ূর বিরিয়ানি, ময়ূর তন্দুরি, ময়ূর কাবাব' বলে ওকে ধরতে এল। কোনওরকমে পালিয়ে বেঁচেছে বেচারা। তাই আমি এবারে ওকে বার্ডফ্লুয়ের অ্যাকটিং প্র্যাকটিস করাচ্ছি।

চকাসদা - ইয়্যাহ হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা! অসাম সালা! কাত্তিকদা, আরেকটা আরেকটা। প্লিজ আরেকটা।

কার্তিক - মানে? কি আরেকটা?

চকাসদা - আরেকটা জোক। আরেকটা জোক বল।

কার্তিক - মানে! আমার কথাগুলোকে জোকস মনে হল? আমি গম্ভীর।

চকাসদা - কি, গৌতম? ইয়্যাহ হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা! এটাও একঘর দিলে কাত্তিকদা। কচি করে একদম ন্যানো সাইজের।

কার্তিক - (রেগে) এক তিরে দু'চোখ গেলে দেব বলে দিচ্ছি!

চকাসদা - ইয়ে সরি কাত্তিকদা। কিন্তু এক ঢিলে দু'পাখি মারা জানতাম। এক তিরে দু'চোখ কী'করে গেলে দেবে?

কার্তিক - কেন! প্রথমে তির দিয়ে তোর একটা চোখ গেলব, তারপর তিরটা খুলে নিয়ে অন্য চোখ।

চকাসদা - এটা তো পুরো পিজে। লেকিন জানেসে পহেলে টাইপ। ইয়্যাহ হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা!

কার্তিক - এবার না তোর দু'পাটি দাঁত খুলে নিয়ে গণেশের শুঁড়ের ডগায় —

লক্ষ্মী - আঃ! তোরা থামবি! কী লক্ষ্মী-সরস্বতীর মতো ঝগড়া করছিস!

চকাসদা - কমলাদি, শুনলাম নাকি তুমি আর সরুদি এখন ঝামেলা-কিচ্যান কর না।

লক্ষ্মী - ঝগড়া ভালই হয়। চেঁচামেচি হয় না বলে কেউ জানতে পারে না। এখন আমারা মেসেজ লিখে লিখে ঝগড়া করি তো।

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব - অদ্য আমার ভস্মদানী নিরুদ্দেশ হইয়াছে বলিয়া আমি ভয়ানক তাণ্ডবনৃত্যের আয়োজন করিতেছি।

লক্ষ্মী - তোমার অ্যাশট্রে আবার কে নেবে বাবা? কেউ তো তোমার মতো গাঁজা টানে না।

চকাসদা - ভোলেবাবা, পোনাম। বাবা, একটা কথা ছিল।

মহাদেব – হাঁ কহ বৎস।

চকাসদা - বাবা, এবার আপনি ওই বাঘছালের লুঙ্গিটা ছেড়ে জিন্সটিন্স কিছু একটা পড়লে ভাল হয়। খচ্চা যা লাগে —

মহাদেব - চোপড়াও স্ত্রীভ্রাতা অসুরনন্দন!

চকাসদা - বাবা আমি কিন্তু বুঝেছি আপনি আমাকে কি কি খিস্তি দিলেন। আমাকে আর যাই বলুন অসুরের বাচ্চা বললে কিন্তু আমার ইয়ে জ্বলে যায়। প্লিজ ওটা চেঞ্জ করুন।

মহাদেব - বেশ করিব কহিব! শতবার কহিব। সহস্রবার কহিব। মর্ত্যে যাহা বরাহনন্দন, স্বর্গে তাহাই অসুরনন্দন। আমার ব্যাঘ্রচর্ম মন্দ কি, শ্রবণ করি?

চকাসদা - আপনি আর কি বুঝবেন! বাঘছালের হাফ লুঙি গলিয়ে নেমে যাবেন পিথিবীতে। জানেন না পিথিবীতে বাঘমারা বারণ হয়ে গেছে? পাবলিক ক্যালান তো খাননি। আমরা ঠেকিয়ে রাখি বলে।

মহাদেব - ওরে মূর্খ, এ ব্যাঘ্রচর্ম বহু পুরাতন, অতি জীর্ণ। তুই কি দেখিতে পাস না অন্ধ!

লক্ষ্মী - (ভেঙিয়ে) সেইজন্যই ছাড়ে অতি পচা গন্ধ। এবারে তোমার মর্ত্যে যাওয়া বন্ধ। (রেগে) মা, এবার বাবা গেলে আমি যাব না বলে দিচ্ছি।

উমা - (ইস্তিরি করতে করতে) হ্যাঁ, লক্ষ্মী ঠিকই বলেছে। হ্যাঁ গো, তুমি এবার কৈলাসেই তোমার লাশ নিয়ে বসে থেকো।

মহাদেব - কেন? আমাকে লইয়া কাহার কি সমস্যা? শ্মশানে-মশানে বিচরণ করিয়া বেড়াই।

উমা - ওইটাই তো তোমার রোগ। কবে একটু সংসারী হবে বলো দিকিনি? মর্ত্যে কেউ তো তোমাকে জামাই আদর দেয় না। গত বছর অত মার খেয়েও শিক্ষা হয়নি, এবারে আবার যাবে?

চকাসদা - কে বাবাকে প্যাঁদালো মা?

উমা - ওই তো কি যেন নাম ওদের — খোকন, বিশু।

মহাদেব - উহারা অবোধ, শিশু।

উমা - তুমি থামো। শিশু না হাতি!

মহাদেব - আহা, বিগত বৎসরের কথা, পুরাতন অতি।

উমা - শোন চকাস। তোদের বাবা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল খালি গায়ে, ভুঁড়ি নাচিয়ে।

মহাদেব - ইহাও কহ, যানবাহন বাঁচিয়ে।

উমা - মাথায় জটা, সারা গায়ে ছাই।

মহাদেব - আহা, সর্বকথা বলা চাই?

উমা - তা সে চায়ের দোকানে দাঁড়াল। চা খাবার শখ।

মহাদেব - দোকানে তখন বহু লোক, যা হোক।

উমা - ভালভাবেই বলেছে, একটা চা দাও তো, বিস্কুটও দিও।

মহাদেব - তা সে লোক কহে কিনা, ‘এখন ভিক্ষেটিক্ষে হবে না, রাত্তিরে খেয়ো’!

উমা - বোঝ, ভেবেছে ভিখিরি। ভিক্ষে চাইছে শিব সেজে।

মহাদেব - আর কহিও না। অমর আমি, মরিতেও পারিব না লাজে।

চকাস - তাপ্পর, তাপ্পর?

উমা - তোদের বাবার তো রাগ জানিস, মারল এক থাপ্পড়। ওখানে বসেছিল, খোকন, বিশু, মদন

কার্তিক - কেলিয়ে বিগড়ে দিল বাপের বদন।

মহাদেব - আঃ অনেক তো হইল, এবার তোরা থাম।

উমা - এই সুযোগে পাড়ার মেয়ে, টিনা নাকি নাম। বলে, এই বুড়োটাই চোখ মেরেছে ত্রিনয়ন দিয়ে।

কার্তিক - আরেকটু হলেই তেড়ে আসত পেনসিল হিল নিয়ে।

চকাসদা - ভোলেবাবা, অদ্দিস্য হলেন না? অদ্দিস্য হলেই তো হত।

কার্তিক - চুপ কর। চাইলেই অদৃশ্য হওয়া যায় গাড়লের মতো?

চকাসদা - কেন, অদ্দিস্য না হবার কি যুক্তি?

মহাদেব - মর্ত্যে প্রদর্শন নিষিদ্ধ অলৌকিক শক্তি। পলায়ন করিবার নিমিত্তে খুঁজিতেছিলাম ছুতো।

উমা - ভাগ্যিস নন্দী-ভৃঙ্গি কাছেই ছিল, দিল সবকটাকে শিংয়ের গুঁতো।

লক্ষ্মী - তারপরের দিন আবার আরেক কাণ্ড।

মহাদেব - (রেগে) সেটিও কহিয়া দিলে করিব লণ্ডভণ্ড!

লক্ষ্মী - (প্রসঙ্গ পাল্টে) হ্যাঁ রে চকাস, এবারে তোদের পুজোর থিম কি?

চকাস - এবারে ব্যাপক পুজো হচ্ছে। পুরো প্যান্ডেল নীল-সাদা রঙের। তার সঙ্গে ম্যাচিং করে অসুরের নীল রক্ত। আমাদের কমিটির পেসিডেন্ট বলেছে লাল রক্ত দেওয়া মানা। আর আমরা এবার কোনও ঠাকুরকে খালি পায়ে রাখছি না। সবার পায়ে থাকবে নীল-সাদা হাওয়াই চটি। আর এবারের থিমের নাম হল 'তব স্পর্শে মাটির মা মানুষ'।

লক্ষ্মী - তার মানে?

চকাসদা - মানে মেন ব্যাপার হল টাচেস্কিন।

লক্ষ্মী - টাচস্কিন! ফোনের টাচস্কিন প্যান্ডেলে? কি রকম?

চকাস - প্যান্ডেলে নানারকম মুখোশ-টুখোস, মূর্ত্তি-ফুর্ত্তি সাজানো থাকবে। ব্যাকগেরাউন্ডে আলফাল বহুত কিছু লেখা ফেখা থাকবে। পাবলিক টাচ করলেই সেটা অটোমেটিক গুগুলে ইনফো নিয়ে এসে দেখিয়ে দেবে।

উমা - কী গুলে দেখাবে? ইশ ম্যা গো। ঠাকুরের প্যাণ্ডেলে এবার তোরা ওসব গুলবি?

চকাস - না না, হেহে, গু গুলব না গো মা। গুগুল, গুগুল। ইশপগুল হয়, উনুনের গুল হয়, এটা গুগুল। যা দরকার এখন পাবলিক গুগুল ঘেঁটে জেনে নিচ্ছে।

লক্ষ্মী - আঃ! কি উল্টোপাল্টা বলছিস! কোনও গুল-ফুল নয়। কথাটা হল গুগল। মা, গুগল একটা সার্চ ইঞ্জিন। তোমাকে দেখাব।

উমা - আমাকে আর ওসব দেখিয়ে কাজ নেই। আমার দিব্যচক্ষু বেঁচে থাক।

চকাস - এরকম চাদ্দিকে টাচেস্কিন থাকবে। আর ঠাকুরের গায়ে —

(হন্তদন্ত হয়ে সরস্বতীর প্রবেশ। মুখে ফেসপ্যাক লাগানো।)

সরস্বতী - অ্যাই। আমার স্কিন একদম টাচ করবি না। গ্রেটারদ্যান-কোলন-ব্র্যাকেটওপন।

চকাস - আরে, সরুদি! না না, ঠাকুরের গায়ে টাচেস্কিন থাকবে না, কিন্তু অর্জিনাল চামড়ার মতো লাগানো হবে। মানে বাই চান্স কেউ যদি মাটির পোতিমা ভেবে হাত দিয়েও ফ্যালে, দেখবে অর্জিনাল মানুসের চামড়া। একঘর হবে, দেখ।

মহাদেব - (সরস্বতীর মুখের দিকে আঙুল দেখিয়ে) বটেক! ইহার কারণেই আমি আমার ভস্মদানী খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। আমার সমস্ত ভস্ম মুখমণ্ডলে লেপন করিয়াছিস!

সরস্বতী - বেশ করেছি। তোমার ছাই দিয়ে একদিন আমি ফেসপ্যাক বানিয়েছি। তাতে কি হ্যারি পটার অশুদ্ধ হল শুনি? হাইফেন-আন্ডারস্কোর-হাইফেন।

উমা - ওই কর। বীণাটা নিয়ে একটু বসা, বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখা, হাঁসটাকে একটু গেঁড়ি-গুগলি খেতে দেওয়া, তা নয়। শুধু সারাদিন শুধু ফেসপ্যাক আর ফেসবুক আর গুগুল!

সরস্বতী - বকছ কেন মা? কোলন-সিঙ্গলকোট-ব্র্যাকেটওপন। অ্যাই লক্ষী, দাঁত ক্যালাচ্ছিস কেন রে! এই দ্যাখ, কোলন-পি।

লক্ষ্মী - যা তো! তোকেও কোলন-পি। কোলন-ব্র্যাকেটওপন। বি ওয়াই ই।

(লক্ষ্মীর প্রস্থান)

উমা - বাণী, কি করলি রে? লক্ষ্মীমেয়েটা আমার মুখভার করে চলে গেল?

সরস্বতী - ও তুমি বুঝবে না মা, আমার সঙ্গে ইমো-ইমো খেলায় ও খালি হেরে যায়। বাট আই লেসদ্যান-থ্রি মাই সিস।

(মহিষাসুরের প্রবেশ)

মহিষাসুর - (সরস্বতীর দিকে এগিয়ে) ব্র্যাকেটওপন-ওয়াই-ব্র্যাকেটক্লোজ।

সরস্বতী - কোলন-ডি। লাইক দিলে? থ্যাঙ্কস।

মহিষাসুর - দোর! লাইক দেব কেন! এটার অন্য মানে।

সরস্বতী - ও, বুঝেছি। বাবার কাছে চাও।

মহিষাসুর - (মহাদেবের দিকে এগিয়ে) ব্র্যাকেটওপন-ওয়াই-ব্র্যাকেটক্লোজ।

মহাদেব - উহা আবার কি বস্তু?

সরস্বতী - বাবা, ওটা থাম্বসআপের ইমো। তার মানে অসুর তোমাকে থাম্বসআপ দেখাচ্ছে।

মহাদেব - কেন মহিষাসুর, তোমার কি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কর্তনের সাধ জাগিয়াছে?

মহিষাসুর - দোর শিবুদা! কিছু বোঝ না, ন্যাকা নাকি? ওটা তুড়ি মারার পরের অবস্থা।

মহাদেব - তাহাই কহ। কিন্তু তুড়ি মারিতেছ কেন বৎস?

মহিষাসুর - চাঁদাটা, চাঁদাটা। খালি জটায় চাঁদা গুঁজে ঘুরলেই চলবে? পুজোর চাঁদাটাও তো দিতে হবে বস। গেল হপ্তায় বিল কেটে রেখে গেছি। এখন চুপচাপ মাল ছাড় তো।

মহাদেব - পিপীলিকার পাখা —

চকাসদা - অসুদ্দা, ভাল তো বস? আমায় চিনতে পারছ তো?

মহিষাসুর - তুই কে বে? হামির আওয়াজ মনে হচ্ছে?

চকাসদা - হ্যাঁ গো বস, আমি চকাস।

মহিষাসুর - ব্যাট্টা, কত টাকার চাঁদা কাটলি রে এ বছর?

চকাসদা - এবারে বেসি নিচ্ছি না। পোত্তেক বাড়ি থেকে দস টাকা, বিস টাকা।

মহিষাসুর - কেন রে, ব্যাঙ্ক লুটেছিস নাকি?

চকাসদা - না বস, এসপনসার। হেবি হেবি এসপনসার পেয়েছি মাইরি। ঠাকুরের অস্তর এসপনসার করবে টুলেট রেজার কম্পানি। হাওয়াই চটি এসপনসার করবে ইলোরা হাওয়াই

কম্পানি। চিড়িয়াখানা এস্টাফ করা অর্জিনাল বাহনের বডি সাপ্লাই করবে। ঠাকুরের সাড়ি দেবে এনসিয়েন্ট রমণিমোহন ডিসেন্ড্যান্টস। অসুরের গায়ের নীল রক্ত এসপনসার করবে বেচলে মিনারেল ওয়াটার কম্পানি।

মহিষাসুর - অ্যাই শোন ভাল কথা, তোদের ঠাকুর কে বানায় রে? কোন হরিদাস পাল?

চকাসদা - রণতরী পাল। কেন বস?

মহিষাসুর - গতবার ওই শিল্পীর দোষে তোদের পুরুত পালিয়ে গেছিল না?

চকাসদা - ও, না না, ওটা রণতরী পালের কোনও দোস না। ও তো ভালই ঠাকুর বানায়। ওটা আমাদের পাড়ার গেঁটেদার দোস। আমরা ম্যাটাডর করে ঠাকুর ডেলিভারি আনলাম। আনবার সময় বাম্পারে ঝাঁকুনি খেয়ে গণেশের ওপরের ডান হাতের আঙুলগুলো মটমট করে ভেঙে গেল। ওই হাতের ফাস্ট আঙুলে সুদস্সন চকরো ধরাবার পেল্যান ছিল। তা, গেঁটেদা বলল ও ঠিক আঙুল লাগিয়ে দেবে। তাপ্পর সস্টির দিন গনেসকে অস্তর ধরাতে গিয়ে পুরুতমশাই তো রেগে কাঁই। বলল আর পুজো করবে না। আমরা বললাম কেন কেন? তা বলছে গণেশের তজ্জনী খাড়া না করে মাঝের আঙুল খাড়া করা আছে কেন? ঠাকুর-দেবতা নিয়ে ইয়ার্কি হচ্ছে! বলে চলে গেল।

মহিষাসুর - না, তোদের শিল্পীরও প্রবলেম আছে।

চকাসদা - কি পোবলেম বস? রনতরী পাল তো ভালই ঠাকুর বানায়। পেরাইজ পায় কত।

মহিষাসুর - দোর! ব্যাটা সব ঠাকুরের সুন্দর সুন্দর মুখ বানায়, কিন্তু অসুরের মুখটা ওরকম লাথ খাওয়া কুত্তার মতো ভেদকিয়ে দেয় কেন?

চকাসদা - ইয়ে, অসুর আসলে ইয়েতে মানে বুকে হুল খেয়েছে কিনা, ওই মোমেন্টটাকে ইস্ট্যাচু করে সেটাকেই—

মহিষাসুর - চোপ! তোদের টিপু সুলতানও তো হুল খেয়েছে। সিরাজও তো হুল খেয়েছে। তা, ওরা মুখটা কি ভেদকে রেখেছে? আমি অসুরজাতির শহিদ, হাসতে হাসতে মরেছি রে ব্যাটা।

চকাসদা - আচ্ছা বস, বলে দেব তোমার মুখটাকে একটু ভাসিয়ে মুচকি হাসিয়ে দিতে।

মহিষাসুর - হ্যাঁ, রনতরীকে বলে দিবি চকাস যে, ফের যদি মুখ ব্যাঁকাস, তাহলে (চকাসদার মাথাটা ধরে) মাথা ধরে কাঠামোয় ঠকাস—

চকাসদা - ও মা গো!

(ছোট্ট গণেশের প্রবেশ)

গণেশ - (অসুরের হাত থেকে চকাসদাকে ছাড়িয়ে) এই ছাড়, চকাসদাকে ছাড় তো অসুরকাকু। মা, খেতে দাও।

মহিষাসুর - ম্যা খেতে দ্যাও! এসে গেল মায়ের পেটুক খোকা। লাখ লাখ বছর বয়স হতে চলল এখনও কচি খোকাটি সেজে আছে। দেব নাকি লতপতে কানটা মুলে?

গণেশ - মা, দ্যাখো না, কেমন করছে!

কার্তিক - অ্যাই আমার ভাইকে ছাড় তো!

মহিষাসুর - যা যা ন্যাবাকাত্তিক। নিজের চুলের চাউমিনগুলো সোজা করে তারপর রং দেখাতে আসবি।

কার্তিক - মা দ্যাখো না, আমাকে ন্যাবাকাত্তিক বলল!

মহিষাসুর - (হঠাৎ সরস্বতীর মুখে চোখ পড়তে) মামনি, মুখ কী মেখেছ? আগে তো লক্ষই করিনি। ওরে চকাস, লক্ষ্মীর পেঁচাটাকে ডেকে আন তো, ওর একটা গার্ল ফ্রেন্ড পেয়েছি। থ্রি-কোলন-ব্র্যাকেটওপন।

সরস্বতী - মা দ্যাখো না, আমাকে পেঁচি বলছে! কোলন-স্ল্যাশ।

উমা - ওরে, তুই আবার দেবতাদের পেছনে লাগতে শুরু করেছিস? তোর কি শিক্ষা হবে না রে? (ইস্তিরি উঁচিয়ে) মারব এক গরম থাপ্পড়!

মহাদেব - হাঁ গৃহিণী, হাঁ। পাষণ্ডটিকে কষাইয়া প্রদান করো এক উত্তপ্ত চপেটাঘাত।

কার্তিক - মহালয়া আসছে তো, আবার মায়ের হাতে রাম ক্যালান খাবে বলে এসব করছে। দে ব্যাটার পেছনে সিংহ লেলিয়ে দে।

গণেশ - সিংহদা! লুঃ লুঃ!

(মহিষাসুরের পলায়ন। সকলে হেসে ওঠে।)

চকাসদা - মা, আর কতো লেট করবে?

মহাদেব - দ্বিপ্রহর হইল। তোমরা সকলে স্নানাহার সারিয়া রহনা দাও। আমি কৈলাসে প্রহরায় রহিলাম। দুর্গা, দুর্গা।

মদীয় সমস্যার ব্রজীয় সমাধান

হস্তিমূর্খ

বাড়ি খালি। স্কুলে পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর পুত্রের তাড়নায় তাঁর মাতৃদেবী তাঁকে নিয়ে মামার বাড়ি গেছেন হপ্তা খানেক হল। শুয়ে বসে ভালই দিন কাটছে। হাতে সে রকম কোনও কাজ নেই। কয়েকদিন এত বেলা করে ঘুম থেকে উঠেছি যে হতচ্ছাড়া ঘুমও আর আসছে না। তায় আবার শনিবার, ছুটির দিন। কি করি, কি করি ভাবতে ভাবতে একটা বই নিয়ে পাশবালিশটাকে মাথায় দিয়ে শরীরটাকে এলিয়ে দিলাম। কিছুটা পড়েছি, হঠাৎ মনে হল ঘরে কেউ ঢুকেছে। চোখ তুলে দেখি আমারই বিছানাতে একজন বসে আছে। মাঝবয়সী, দোহারা চেহারা, আশু মুখুজ্জ্যের মতো গোঁফ, মাথার চারধারে চুল মধ্যিখানে টাক, চোখে গোল ফ্রেমের চশমা, সঙ্গে একটা নোয়াপাতি ভুঁড়ি আর পরনে ফতুয়া-লুঙি। নির্ঘাত রান্নার মাসি আবার গেটের তালাটা না দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কতবার বলেছি তালা না আটকাতে পারলে আমাকে ডাকতে। আসুক একবার কালকে। ‘কি ব্যাপার? কে আপনি? কি চাই? বাড়িতে ঢুকেছেন কেন?’ বলে চড়াও হতে গিয়েও থেমে গেলাম। কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে। চিনতে পেরেই লাফিয়ে উঠলাম। তাড়াতাড়ি করে পায়ের ধুলো নিয়ে একটু জিভে ঠেকিয়ে মাথায় দিলাম

- আরে গুরুদেব আপনি?

গোঁফের ফাঁকে মুচকি হাসি সহ উত্তর এল

- আমাকে তুই চিনিস?
- কি যে বলেন স্যর, আপনাকে চেনে না এই রকম বাঙালি এই ধরাধামে কেউ আছে নাকি?
- বল তাহলে আমি কে
- উত্তমকুমার

স্ফূর্তির চোটে গান বেরিয়ে এল – সব হিরোর সেরা বাঙালির তুমি উত্তম

- থাম থাম, হাঁড়িচাচার সর্দি হলেও তোর মত গলার আওয়াজ বের হয় না

ধমক খেয়ে গান থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম

- কিন্তু স্যর, আপনি এই বেশে এলেন কেন?
- আমাকে দেখেছিস আগে কোনও দিন?
- না স্যর, আপনাকে রক্ত মাংসের শরীরে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি, আপনি যখন দেহ রেখেছেন তখন আমি আট বছরের বালক মাত্র, আপনার নাম করলেই মা যাকে ভাল বাংলায় বলে রোষকষায়িত নয়নে, সেই ভাবে তাকাতেন। তবে স্যর আপনার কত ছবি যে বড় হয়ে দেখেছি, গগলস পরে আপনি, ধুতি পাঞ্জাবি পরে আপনি, স্যুটেড বুটেড আপনি, এই তো স্যর, সেদিন আপনার জন্মদিন গেল, আপনাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সবাই ফেসবুকে যার যার দেওয়ালে ছবি দিল, রঙিন ছাতা মাথায় সাদা টি-শার্ট আর হাফ প্যান্ট পরে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। আপনাকে মিথ্যে বলব না, কার যেন দেওয়াল থেকে ঝেড়ে দিয়ে আমিও ছবিটা আমার নিজের দেওয়ালে সেঁটেছিলাম। কত বলব? তারপর স্যর সাগরিকা, হারানো সুর, পথে হল দেরি সুচিত্রার সাথে আপনার এসব বই, উফ স্যর জাস্ট ভাবা যায় না। আমরা তো এও জানি আপনি রান্নাতে কোন কোম্পানির গুঁড়ো মশলা দিতে বলতেন। বছর কয়েক আগে একটা সিনে-ম্যাগে আপনি যে ডাইরিতে শুটিং শিডিউল লিখতেন সেটার বেশ কয়েকটা পাতার ছবি দিয়েছিল। সঙ্গে এক্সপার্ট কমেন্ট – আপনি যখন লিখছিলেন তখন আপনার মানসিক অবস্থা কি রকম ছিল, আপনার বিপি কত ছিল...

হঠাৎ খেয়াল হল উল্টো দিক থেকে কোনও সাড়া শব্দ নেই। তাকালাম। গোঁফের ফাঁকে সেই মুচকি হাসি।

- আচ্ছা এবার বল তো, এখন যে ড্রেসে দেখছিস, সেই ড্রেসে আগে কখনও দেখেছিস?
- দেখেছি তো, না হলে বুঝলাম কি করে আপনি উত্তমকুমার। এটা তো আপনি ব্রজবুলি-তে পরেছিলেন। তবে স্যর ওই যে বেলবটম আর পাঞ্জাবি পরে, মাথায় লম্বা চুল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে গিটার নিয়ে মান্না দে'র গানে আপনি লিপ দিয়েছিলেন বোম বোম বোম বো বোম বোম বো বোমভোলা, কাঁধে নিয়ে লোটা কম্বল নিয়ে চল লছমনঝুলা.....
- থাম, আবার হেঁড়ে গলায় চিৎকার করছিস?
- কি করব স্যর? গান পেলে আমি না গেয়ে থাকতে পারিনা,

কাঁচুমাচু হয়ে বললাম।

- অনেকক্ষণ ধরে তোর বুলবুলানি শুনছি। ব্রজবুলি কি জানিস?
- কেন জানব না? রূপদর্শীর লেখা গল্প

এ পর্যন্ত শুনে উত্তমকুমারের ভ্রূ কুঁচকে হাসিটা উধাও হয়ে গেল দেখে আমার একটু খটকা লাগল। বললেন

- কি বলছিলি আরেকবার বল।
- ঐ বলছিলাম আর কি ব্রজবুলি বইটা রূপদর্শীর লেখা গল্প থেকে...
- কানের গোড়ায় খেলে বুঝবি কার লেখা গল্প!
- কেন স্যর উনিই তো.....

আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলাম। বুঝতে পারলাম কিছু একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলেছি, যদিও কি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। ব্রজবুলি বলে একটা ভাষা আছে জানি, কিন্তু হচ্ছিল তো সিনেমার কথা! তবে কি...

- ওরে গবেট, উত্তমকুমারই যদি তোর সামনে হাজির হবে তো এই সব ধড়াচুড়ো পরে কেন আসবে এই সোজা হিসেবটা তোর মাথায় ঢুকল না? আমিই ব্রজরাজ কারফর্মা, যার জীবনকাহিনি তুই গল্প বলে জানিস, উত্তমকুমার সেজে এসেছি। ভেবেছিলাম চিনতে পারবি। তুই মাথামোটা জানা ছিল কিন্তু এতটা জানতাম না।

সত্যি এটা তো ভেবে দেখেনি। ঝাড় খেয়ে মূর্খতা সাময়িক অপগত হতেই মাথায় ঢুকল যে ভুল একটা নয়, তিনটে। প্রথম ভুল – ব্রজদাকে উত্তমকুমার ভাবা, দ্বিতীয় – ব্রজদার জীবনকাহিনিকে গল্প বলা আর সবচেয়ে বড় ভুল – ব্রজদার সামনে উত্তমকুমারকে গুরুদেব বলা। তাড়াতাড়ি করে ড্যামেজ কন্ট্রোল করার জন্য বলে উঠলাম

- স্যর, এটা কিন্তু আমাদের অন্যায়।
- কোনটা?
- এই যে আপনার মত প্রাতঃস্মরণীয় একজন মহাপুরুষের ছবি কোনও বাঙালির ঘরে দেখা যায় না।
- আমাকে তোর অফিসের বস ঠাউরেছিস নাকি?

এই রে! আবার নিশ্চয় কোনও একটা কেলো করে ফেলেছি। দুটো হাত কচলে হাসি হাসি মুখে বললাম

- কি যে বলেন স্যর, আমার কি সে সৌভাগ্য হবে? একটা গোটা জাতির বস আপনি।
- তাহলে তেলাচ্ছিস কেন? এতক্ষণ উত্তমকুমার ভেবে তেল মারছিলি, এখন বলে দেওয়ার পর আমাকে। শোন এই সব তেলানি আমি একদম পছন্দ করি না। নিজেও জীবনে কাউকে তেল দিই নি, আর কারও কাছে খাইও না।
- স্যর আপনি না...

- এই তুই স্যর স্যর করবি না, যত সব স্লেভ মেন্টালিটি। হয় ব্রজদা বল, না হলে কিছুই বলবি না। এ ঘরে তুই আমাকে ছাড়া আর কাকে দেখছিস যে তোর সঙ্গে কথা বলছে? কি যেন বলছিলি? হ্যাঁ আমার ছবি। শোন জানিস বোধ হয় আমি একজন ফটোগ্রাফার কাম সাংবাদিকও। লোকে যদি আমায় ছবি দেখে চিনে ফেলে তাহলে আমি না পারব ঠিকঠাক খবর সংগ্রহ করতে না ছবি তুলতে। সবাই আমায় দেখলেই কশাস হয়ে যাবে। এখনকার দিনের মত সাংবাদিক স্টার হয়ে উঠল, এসব যদি করতাম তা হলে আর তোরা কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে কোনও দিনই জানতে পারতিস না। সেই জন্যেই কাউকে কোনোদিন আমার ছবি তুলতেই দিই নি।

প্রসঙ্গ অন্যদিকে নেওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলাম

- স্যর থুড়ি ব্রজদা কিছু খাবেন?
- কি খাওয়াবি?
- বলুন, অরেঞ্জ শনপাপড়ি, গাঠিয়া, সল্টেড কাজু, চানাচুর, মুগডাল ভাজা সব আছে। আর যদি একটু বসেন তাহলে দোকান থেকে চপ বা শিঙাড়া সাথে একটু মিষ্টি, আপনি যা বলবেন নিয়ে আসি
- ন্যাকামির একটা সীমা থাকে বুঝেছিস?

এবার মাথাটা একটু গরম হয়ে গেল। কি ন্যাকামি করেছি! কিছু বললাম না।

- আসল জিনিসটা না বলে আবোল তাবোল বকছিস।
- কোন আসল জিনিস?

- গাঠিয়া, সল্টেড কাজু, চানাচুর, মুগডাল ভাজা এইগুলি দিয়ে কি তোর পিন্ডি চটকানো হবে? অ্যান্টিকুইটি ব্লু-এর যে বোতলটা রেখেছিস সেটার জন্যই তো তোর এত আয়োজন, ঠিক কিনা?

সর্বনাশ করেছে। জানল কি করে? আমি নিজেই ওটাকে চোখের বাইরে রাখি, মন খুব উতলা না হলে বিয়ার, ভদকা অভাবে জিন দিয়েও কাজ চালিয়ে নিই, একদম টিপে টিপে খরচ করি। আজকে ভেবেছিলাম একবার..... ধুর, যা হবে হবে দেখা যাবে। খড়কুটো ধরে আমি বাঁচার চেষ্টা করলাম। খুব গম্ভীর হয়ে বললাম

- এই হপ্তায় বউ নেই বলে কোটাটা ওই সোম, মঙ্গল বুধেই শেষ হয়ে গেছে।
- কিসের কোটা?
- হপ্তায় সাত পেগ।
- কে বানাল?
- আমার বউ।
- অ। তা তুই ভদ্রভাবে বের করবি না আমাকে ওঠাবি?

অগত্যা আমাকেই উঠতে হল। ব্রজদা একটা বিড়ি ধরালেন। ব্যাজার মুখে বোতলটা বের করে ওটার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকালাম। এখনও প্রায় পঁচাত্তর ভাগই রয়েছে। কে জানে কতটা থাকবে? কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে হল। কেন যে আগেই শেষ করে ফেললাম না। ট্রে সাজালাম। জানাই ছিল ব্রজদা সোডা বা লাইম কিছুই নেবেন না। আমারও লাগে না। শুধু বরফ নিলাম। 'চিয়ার্স' দুটো হাত উঠল। ব্রজদার হাসি মুখ। আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। একটা চুমুক দিয়ে ব্রজদা মুখ খুললেন

- শোন এমন একটা স্কিম বানিয়েছি না পৃথিবীতে আর মদের অভাব থাকবে না।

এত দুঃখেও আমি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়লাম।

- কি রকম?
- অ্যাকুইলা নাম শুনেছিস?
- কি কিলা বললেন?
- কিলা না, এ কিউ ইউ আই এল এ, অ্যাকুইলা ।

আমি মরছি হুইস্কির শোকে, আর এখন যত গালগল্প। খানিকটা বিরক্ত হয়ে বললাম

- না, ওসব অ্যাকুইলা ফ্যাকুইলা শুনিনি
- সেটা তোর মুখ দেখেই বুঝেছি। শোন ওটা একটা গ্যালাক্সি। ওখানে একটা মেঘ আছে যাতে চার ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন লিটার ইথাইল অ্যালকোহল আছে। চারের পেছনে চব্বিশটা শূন্য। আর যদি ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড ফলো করিস তাহলে বারটা শূন্য আরও বাড়িয়ে নে।

সবে একটা চুমুক দিয়েছিলাম, একটা 'হিঁক' শব্দের সঙ্গে তার আদ্ধেকটা বেরিয়ে এল।

- এতেই বিষম খেলি? তা তোর আর দোষ কি বল? বড় কিছু চিন্তা করতেই শিখিস নি। বুঝলি, ওই মেঘটাকে নিয়ে আসব। প্রসেস করে ট্রপোস্ফিয়ারে আপলোড করে দেব, তারপর প্রোগ্রামিং অনুযায়ী বৃষ্টি নামবে। পুরোটাই অটোমেটেড। ম্যানুয়াল কিছু রাখিনি। তারপর নে, খা, কত মদ খাবি...

আমি একটু ধাতস্থ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম

- মেঘের কথাটা জানলেন কি করে?
- তোর মত কূপমণ্ডূক নই, তাই জানি। তুই তো জানিস আমি যোগবলে মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াই, লাস্ট টাইমে গিয়েছিলাম ওখানে তখনই চোখে পড়ল। সোজা আর্কটিক পোলে

ল্যান্ড করে রিসার্চ ওয়ার্ক আর কিছুটা এক্সিকিউশন শেষ করে ভাবলাম একবার মাতৃভূমিতে যাই। কম্পাসের একটা গোলমালে তোর এখানে এসে পড়লাম। যাক গে, গাধা গরু যাই হোস না কেন, আফটার অল বাঙালি তো। অ্যান্টিকুইটির জন্য কান্নাকাটি না করে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে নে। ডিস্ট্যান্স ওই ধরে নে অ্যারাউন্ড টেন কে লাইটইয়ার্স। কুলিং চেম্বারের কাজ আর একটু বাকি আছে। আদার্স মেসিনারিজ কমপ্লিট। মেঘ নিয়ে আসতে গেলে একটা স্পেসএলিফ্যান্ট লাগে, সেটার ডিজাইন তৈরি হয়ে পড়ে আছে।

- স্পেসএলিফ্যান্ট!? স্পেসশিপ শুনেছি
- স্পেসএলিফ্যান্ট শুনতে গেলে কলজের জোর লাগে। তোর মত চিকেনহার্টেডরা শিপ নিয়েই মাতামাতি করে। মহাকাশবিজ্ঞানে একটা অবদান রাখা আবার একই সঙ্গে সালভাদোর দালিকে সম্মান জানানো, দুটোই হয়ে গেল। ভাবতে পারছিস কত দিক খেয়াল রাখতে হয় তোদের এই ব্রজদাকে। যাক গে, এবার প্রজেক্টটা শোন...

বোতলটার দিকে একবার তাকালাম। আমি এতক্ষণে মাত্র দু'পেগ খেয়েছি, তাতেই যা ছিল তার আদ্ধেক শেষ। মেঝেতে অর্ধভুক্ত বিড়ির স্তূপ। ব্রজদা আউট হয়নি এটা পরিষ্কার। আড়চোখে একবার আমায় দেখে আবার শুরু করলেন

- ছ'টা মেইনস্ট্রিম কন্টিনেন্ট। প্রত্যেকটায় দু'মাস করে মদের বৃষ্টি। সিজনে স্টোর করে বাকি বছর চালাবে। এরিয়া ওয়াইজ সার্ভে কমপ্লিট। বাকি ডিটেল, ধর পার্টিকুলার কোন অঞ্চলে কতটা বৃষ্টি, কোন ক্যাটেগরিতে কতটা অ্যালকোহল ইউজ করব, আরও কিছু কিছু আছে, ওই ম্যাক্রো পার্টগুলি অ্যাকুইলা যেতে যেতে এলিফ্যান্টে ডিসাইড করে নেব। কারণ নো ম্যানস ল্যান্ডে মদ ঢেলে তো আর লাভ নেই।
- আর ধরুন যেগুলি ড্রাই স্টেট...

- ওসব লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের হেডেক, লোকালিটিতে বৃষ্টি হবেই। কোথায় ড্রাই স্টেট, কে মেথিফোবিক, এইগুলি খুব সিলি ইস্যু ।
- মেথিফোবিক! মদের সাথে মেথিরও বৃষ্টি হবে নাকি?

একবার কটমট করে তাকিয়ে ব্রজদা আবার শুরু করলেন

- জলাতঙ্ক বুঝিস?
- সে কে না বোঝে? পাগলা কুকুর, বাঁদর, বেড়াল এসব কামড়ালে হয়।
- সেই রকম একটা অ্যালকোহলাতঙ্কও হয়। তাকে বলে মেথিফোবিয়া। ঢুকেছে মগজে মদের সাথে মেথির সম্পর্ক? এবারে বাকিটা শোন। পুরো মেঘটা একেবারে আনার দরকার নেই, পার্টে পার্টে নিয়ে আসব ঠিক করেছি। ফালতু ইনভেন্ট্রি হোল্ড করে রেখে লাভ নেই। পয়সা না লাগলেও, জায়গাটা তো একটা ইস্যু। স্পেসএলিফ্যান্টের ফুয়েল একটু বেশি খরচ হবে, তবে তা এমন কিছু হাতিঘোড়া ব্যাপার নয়। চিন্তা করিস না, স্যামপ্লিংটা তোদের এই সুখচরেই করব।

ওহ্! মদের বৃষ্টি!! সুখচরে স্যামপ্লিং!!! তারপরে প্রতি বছরে দু'মাস!!!! সব দুঃখ ঘুচে গেছে!!!!! ইচ্ছে হল গেয়ে উঠি 'মদ্য পানের বিরুদ্ধে যারা তাদের মাথায় পড়ুক বাজ', কিন্তু সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা স্মরণ করে বহু কষ্টে নিজেকে সংবরণ করলাম। ব্রজদারও দেখছি মনে নেই আমি উত্তমকুমারকে গুরু বলেছিলাম। কি দরকার মনে করানোর

- ব্রজদা, বেরিয়ে পড়ুন!
- না, খোকা। বেরিয়ে পড়লেই হবে না, প্রিজার্ভেটিভের স্টকটা কে বানাবে, স্পেসএলিফ্যান্ট ছাড়া গেলে আনবই বা কি করে? আগে ওই দুটো রেডি করে ফেলি, তারপর পুজোর পরে পরেই রওনা হব।

বলেই ব্রজদা হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে নিলেন। আমি বললাম

- সেটা ঠিক। স্পেসএলিফ্যান্ট ছাড়া গিয়ে কি করবেন। আচ্ছা কি প্রিজার্ভেটিভ ইউজ করবেন? সালফার ডাই অক্সাইড?
- তোর মাথা আর আমার মুন্ডু। তোকে বলে কোনও লাভ হবে না, তবুও বলি। নিওবিয়াম পেন্টাক্লোরোনাইট্রেট মোনোইথাইল-অক্টাপটাশিয়াম কোকারফর্মাটিটানেট উইথ টু অ্যালিফ্যাটিক অ্যামাইন। এই হল ব্রজস এজেন্ট ফর অ্যালকোহল প্রিজার্ভেশন। শর্টে বিএএপি বা বাপ। একবার ভেবেছিলাম পেটেন্ট নিয়ে নিই, তারপর ভাবলাম, পৃথিবীতে কি আর সে ব্রেন আছে যে এ জিনিস ঝাড়বে, সেজন্যেই আর কিছু করলাম না। ওটা নিয়ে যেতে হবে। মেঘে স্প্রে করে তবে এই গ্যালাক্সিতে আনতে পারব। দ্য আইডিয়া.....

ব্রজদা আকস্মিক ভাবে লাফিয়ে উঠলেন। ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম

- কি হল?
- দ্য আইডিয়া। কুলিং চেম্বারটার একটা মডিফিকেশন দরকার ছিল, পেয়ে গেছি। উঠি এখন...

বলেই ব্রজদা এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ মনে পড়ল আসল কথাগুলি মানে স্পেসএলিফ্যান্টটার স্পিড কত, ফুয়েল কি, কবে থেকে বৃষ্টি শুরু হবে, এসব কিছুই তো জানা হল না। ‘ব্রজদা ব্রজদা, আরেকটা কথা, স্পেসএলিফ্যান্টটার স্পিড, ফুয়েল এইগুলি তো বললেন না’ বলতে বলতে দরজার দিকে দৌড়ালাম। ‘আর সময় নেই, ব্রুজুলে সার্চ করে নিস, সব জানতে পারবি’ বলেই ব্রজদা ধড়াম করে আমার মুখের ওপর পাল্লাটা বন্ধ করে দিলেন। আমি চোখে সর্ষেফুল দেখলাম।

ধীরে ধীরে হলুদ রং ফ্যাকাশে হতে হতে সাদা হয়ে এল। টিউবলাইটটা জ্বলছে। খাটের ধারে এসে বেমক্কা ধাক্কা খেয়েছি। কোনক্রমে এদিক ওদিক হাতড়ে চশমাটা পেলাম। দেখি ঘড়িতে রাত সাড়ে ন'টা।

স্টপগ্যাপ

অতনু কুমার

স্টাফরুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছি, তখনই সুতপার ফোনটা এল। আজ আগেও বেরোতে পারতাম। বৃহস্পতিবার লাস্ট পিরিয়ডে আমার ক্লাস থাকে না। দেবেশদা আসেননি বলে ওনার ক্লাসে স্টপগ্যাপ হয়ে যেতে হল। বড়দের হলে ছেড়ে দেওয়া যেত, কিন্তু ক্লাস সিক্সের ছেলেদের স্কুল ছুটি হওয়ার আগে ছাড়া যায়না।

"হ্যাঁ বল।"
"তোমার ছুটি হয়েছে?"
"হ্যাঁ এই বেরোচ্ছি।"
"তোমার এক বাল্যবান্ধবী এসেছেন, বাংলাদেশ থেকে।"

আমার বাল্যবান্ধবী! তাও আবার বাংলাদেশ থেকে !!

"বাবার বন্ধু বারীনকাকার মেয়ে..."
"বারীনকাকার মেয়ে! বল কি? ঠিক আছে আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।"

ফোনটা হাতে নিয়েই কয়েক মিনিট সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ভোলাদাকে চাবি নিয়ে আসতে দেখে সম্বিত ফিরল। নেমে গ্যারেজ থেকে সাইকেলটা বের করলাম। বাইক একটা কিনেছি, কিন্তু একা থাকলে সাইকেল নিয়েই বের হই।

বারীনকাকা! কতদিন পর এই নামটা শুনলাম! পাঠকরা যদি ভেবে থাকেন বাল্যপ্রণয়ের তাড়নায় আমার হৃদয়ে ঝড় উঠেছে তাহলে ভুল করবেন। কারণ বারীনকাকার মেয়ের সঙ্গে আমার আদৌ আলাপই হয়নি, কোনদিন দেখিওনি। বারীনকাকারা যখন এখান থেকে চলে যান তখন আমার বয়স নয় কি দশ বছর। ওনার নামটা আর বিক্ষিপ্ত কিছু স্মৃতি ছাড়া বিশেষ কিছু মনে নেই। পরে অবশ্য মা ও দিদিদের কাছ থেকে বারীনকাকার সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনেছি। বারীনকাকারা চট্টগ্রামের লোক, দেশভাগের সময় তাঁর বাবা-মা তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে এদিকে চলে

এসেছিলেন। আমাদের বাড়ির কাছেই ভাড়া থাকতেন। বয়সের তফাত সত্ত্বেও বাবার সঙ্গে বারীনকাকার বন্ধুত্ব বেশ জমে গিয়েছিল। বাবা কমিউনিস্ট পার্টি করতেন আর বারীনকাকা সক্রিয় রাজনীতি করতেন না, তবে কংগ্রেস ঘেঁষা ছিলেন। সেই সময় অবশ্য রাজনৈতিক মতভেদ আজকের মত অস্পৃশ্যতায় শেষ হত না। দুই পরিবারে অত্যন্ত অন্তরঙ্গতা ছিল। বাবা যখন জেলে বা আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকতেন, বারীনকাকাই আমাদের পরিবারের অভিভাবক হয়ে উঠতেন। খুব কম বয়সে বাধ্য হয়ে ভিটে ত্যাগ করলেও নিজের দেশের প্রতি বারীনকাকার একটা অদ্ভুত আবেগ ছিল বলে শুনেছি। মুক্তিযুদ্ধের সময় না কি প্রচণ্ড অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, সারাদিন রেডিওর খবরের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার বছর পাঁচেকের মধ্যেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে স্ত্রী ও অবিবাহিতা বোনকে নিয়ে দেশে ফিরে যান। বারীনকাকার ভাই গিরীনকাকা এখানেই রয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমদিকে বেশ কিছুদিন অবধি চিঠিপত্রের চালাচালি হত, তারপর আস্তে আস্তে যোগাযোগটা বন্ধ হয়ে যায়। শুনেছিলাম বারীনকাকার স্ত্রী মারা গেছেন সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে। তার কয়েকবছর পরে বারীনকাকার মৃত্যুর খবর পেয়ে বাবা বেশ ভেঙে পড়েছিলেন মনে আছে।

পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে কুড়ি মিনিটের রাস্তাটা সাইকেলে পেরিয়ে এসেছি খেয়ালই নেই। ঘরে ঢুকে দেখি দুজন ভদ্রমহিলা আর একজন বয়স্ক যুবক সুতপার সঙ্গে কথা বলছে। যুবকটিকে চিনতে পারলাম, গিরীনকাকার ছেলে পিলু।

পিলু আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "কেমন আছ গ্যাঁড়াদা?"

"ভাল, তোর সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা হল।"

"তোমাকে অবশ্য রাস্তায় দেখি মাঝে মাঝে। আলাপ করিয়ে দিই, জ্যাঠামশাইয়ের মেয়ে পূরবী আর ওর মাসি।"

পূরবী নমস্কার করে বললেন, "আমাকে পূরবী বলেই ডাকতে পারেন। আমি চিটাগং ইউনিভার্সিটিতে স্যোসিওলজি পড়াই। আপনাদের ফ্যামিলির কথা অনেক শুনেছি বাবার কাছে।

আজ এখানে আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে। এসেছি অবশ্য একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। সত্যি কথা বলতে কি ইন্ডিয়াতেই এই প্রথম এলাম।"

কথায় কথায় পূরবীর ইন্ডিয়া সফরের বিশেষ উদ্দেশ্য জানা গেল। পূরবীর জন্মের দু'দিন বাদে ওনার মা মারা যান। তারপর বারীনকাকা একই সঙ্গে মা ও বাবার ভূমিকা পালন করে মেয়েকে মানুষ করেন। অনেকেই দ্বিতীয়বার বিয়ে করার কথা বললেও তিনি রাজি হননি। কিন্তু পূরবীর যখন চোদ্দ বছর বয়স, আচমকা হার্ট আটাকে চলে যান বারীনকাকা। তারপর পিসির কাছে থেকে বড় হন। পিসি ও পিসেমশাই খুবই ভালোমানুষ, নিজের দুই ছেলের সঙ্গে পূরবীকে নিজের মেয়ের মতই মানুষ করেছিলেন। দুই দাদা বিদেশে সেটল করার পর পিসি-পিসেমশাই এখন পূরবীর তত্ত্বাবধানেই থাকেন।

"পিসি-পিসেমশাইকে আমি মা-বাবার মতই দেখি। তবু নিজের মা-র অভাবটা কোনদিন বোধ করিনি তা বলতে পারবনা। আর বাবার কথা ভাবলে মনে হয় এই তো সেদিন। বাবা নিজে যজমানি করতেন। গ্রামে বেশির ভাগই মুসলিম হলেও বেশ কয়েকঘর হিন্দু আছে। তাদের যেকোন পুজো বা অনুষ্ঠানে বাবার ডাক পড়ত। আর হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই বাবাকে বেশ শ্রদ্ধা করত মনে আছে। বাবার ইচ্ছে ছিল আমি যেন অনেক পড়াশোনা করি, আনেক উঁচু জায়গায় যাই। একদিন মনে আছে মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেছে। দেখলাম বাবা বাইরের দাওয়ায় চুপ করে বসে আছেন। আমি আস্তে আস্তে বাবার পাশে গিয়ে বসলাম। সেদিন বোধহয় জ্যোৎস্না ছিল। সামনের বাগানটা চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছিল। বাবা আমার মাথাটা কোলে টেনে নিয়ে বললেন, লোকে বলে মানুষ মরে গেলে নাকি আকাশে চলে যায়। সত্যি মিথ্যে জানিনা, তবু মনে হয় যেন তোর মা দেখছে আমি তোকে কিভাবে মানুষ করছি। আমি তো বিশেষ লেখাপড়া করিনি, ঐ পুরুতগিরিটা জানি তাই চালিয়ে নিচ্ছি। তোর মা খুব বই পড়তে ভালোবাসত। তুই যখন পেটে, মা আমাকে বলত, ছেলে মেয়ে যাই হোক না কেন সে যেন অনেক পড়াশুনো করে, ডাক্তার বা বড় অধ্যাপক বা ওরকম কিছু হয়। দেখিস মায়ের স্বপ্ন যেন মিথ্যে না হয়।"

পূরবী একটু থেমে চশমা খুলে শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখটা মুছলেন। সবাই চুপ। তারপর পূরবী নিজেই শুরু করলেন। "আমাদের ভার্সিটিতে রাজু চাকমা বলে একটা ছেলে আছে। গেল বছর ওদের একটা পরবে বন্ধুদের সঙ্গে আমাকেও নেমন্তন্ন করেছিল। ওদের পাহাড়ি গ্রাম, বাড়ি সব ঘুরিয়ে দেখাল। ওর পড়ার টেবিলের সামনেই এক মহিলার অস্পষ্ট ফোটো। জানতাম ওরও খুব কমবয়সে মা চলে গেছে। ওকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু তারপর থেকে মনে হল রাজুর তো তবু কিছু আছে, একটা ছবি আছে, হয়ত মনের মধ্যে সযত্নে ঢেকে রাখা কিছু স্মৃতিও আছে। আমার তো সেসব কিছুই নেই। তাই ঠিক করলাম এবার মা-কে খুঁজতে যেতেই হবে।"

"ইন্ডিয়াতে আসার ইচ্ছে অনেকদিনই, কিছুতেই হয়ে ওঠেনা। তবে পিলুদার সঙ্গে যোগাযোগটা ছিল, ও একবার ঢাকায় ঘুরেও এসেছে। এবার একরকম জোর করেই চলে এলাম। এই প্রথম মামার বাড়ি গেলাম। তিন মামার মধ্যে দুজন মারা গেছেন আর ছোটমামার জন্মের আগেই মা-র বিয়ে হয়ে গেছিল। একমাত্র এই মাসিরই মা-র কথা মনে আছে।"

মাসি আমাদের বাড়ির দুটো পুরনো ছবির অ্যালবাম দেখছিলেন। এবার তিনি মুখ খুললেন। "দিদির চেয়ে আমি অনেকটাই ছোট, তবু আমরা খুব বন্ধু ছিলাম। যদিও দুজনের স্বভাব ছিল একেবারে উলটো। আমি ভীষণ দুরন্ত ছিলাম, সবাই বলে। আর দিদি ছিল শান্ত, অঙ্ক করতে খুব ভালোবাসত, সারাদিন বই মুখে নিয়ে বসে থাকত। আমি পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশে বদমায়েসি করে বেড়াতাম আর সেসব খবর বাবার কাছে আসত। বাবা খুব রাগী ছিলেন, কিন্তু দিদিকে খুব ভালোবাসতেন। আমাকে যে দিদি কতবার বাবার হাতে মার খাওয়া থেকে বাঁচিয়েছে তার ঠিক নেই। পূরবীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে কত কিছু যে মনে পড়ছে ..."

পিলু বলল "কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে, জেঠিমার কোন ছবি তো পাওয়া যাচ্ছে না। আমার কাছে নেই, পূরবীর মামারবাড়িতেও পাওয়া গেল না। সেইজন্যেই আরো তোর কাছে নিয়ে এলাম। তোদের বাড়িতে তো তখন খুবই যাতায়াত ছিল আর অনেক ছবিও তোলা হত মনে আছে।"

পূরবী বললেন, "বৌদি দুটো অ্যালবাম দিয়েছেন। মাসি দেখছে, আমি তো মা কে চিনতে পারব না।"

বারীনকাকার স্ত্রী, কি নাম ছিল মনে নেই, চেহারাটাও মনে আসছে না। তবে বারীনকাকার বিয়েতে আমরা সবাই বরযাত্রী গিয়েছিলাম সেকথা বেশ মনে আছে। বললাম, "আর একবছর আগে এলে খুব ভাল হত। কাকিমার কোন ছবি থাকলে মা অবশ্যই জানতেন। মা মারা গেছেন গতবছর।"

পিলু বলল, "তুষারজ্যাঠা মারা গেছেন তিন সালে, না?"

"না, টু থাউজ্যান্ড ফোরের মার্চ।"

পূরবী আমাকে ছোটবেলার দিনগুলোতে ফিরিয়ে দিলেন। মনে পড়ছে সেই সময়ের পরিবেশ, মানুষজন। ছোটবেলায় বাবাকে সেভাবে আমরা পাইনি। বাবা পার্টির কাজে বাইরে ঘুরে বেড়াতেন, সেই আর্থিক অনটনের দিনগুলোয় মা কিভাবে আমাদের সাত ভাইবোনকে মানুষ করেছেন তা এখন ভাবাই যায় না। তখন অবশ্য বাবা-মারা সন্তানদের ভবিষ্যত নিয়ে আজকের মত টেনশন করতেন না। মা রাজনীতি করতেন না, রাজনীতিকে খুব একটা পছন্দও করতেন না। কিন্তু যে কোন কারো বিপদ আপদে সব ফেলে ছুটে যেতেন। প্রায় রোজই এলাকার কোন না কোন মহিলা আসতেন তাঁদের পারিবারিক সমস্যা নিয়ে। মা তাঁদের বোঝাতেন, কখনও কখনও নিজে তাঁদের বাড়ি গিয়ে সমাধানের চেষ্টা করতেন। মা শিক্ষিতা ছিলেন, কলেজেও পড়েছেন, কিন্তু চাকরি করেননি। পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াতেন। তাতে কত আর রোজগার হত, বেশিরভাগই তো মাইনে দিতে পারত না। তাতে কি, সকল শিশুই ছিল মায়ের সন্তানের মত।

মা আমার জীবনে কি ছিলেন, তা আগে কোনদিন এভাবে অনুভব করিনি। আজ পূরবীর কথা শুনে বুঝতে পারলাম যে আমি কত ভাগ্যবান।

সুতপা সবার জন্য চা, মিষ্টি, শিঙারা নিয়ে ঘরে এল। ও বোধহয় ম্যাজিক জানে, এসবের ব্যবস্থা কিভাবে করল কে জানে। আমারই উচিৎ ছিল বাড়ি আসার সময় কিছু নিয়ে আসা। স্মৃতিমন্থনে ডুবে গিয়ে সেসব ভুলেই গিয়েছি। সুতপা বলল, "তুমি আসার আগে বড়দাকে ফোন করেছিলাম। কাকিমা মানে পূরবীদির মা'র কোন ছবি আছে বলে তো মনে করতে পারলেন না।"

পিলু বলল, "আমার যেন মনে হচ্ছে তুষারজ্যাঠার সঙ্গে জ্যাঠা-জেঠিমার একটা ফোটো তোলা হয়েছিল, আমিও ছিলাম সেখানে। আমি অবশ্য তখন খুবই ছোট।"

"অ্যালবাম দু'টোয় কিছু পেলেন না?" মাসিকে জিজ্ঞাসা করলাম। "অনেক পুরনো ছবি, বেশীরভাগই নষ্ট হয়ে গেছে।"

"এইটা একবার দেখুন তো", মাসি অ্যালবামটা এগিয়ে দিলেন।

ছোট্ট ছবি। দুজন পুরুষের মাঝখানে একজন মহিলা, মহিলার সামনে একটা বাচ্চা। তবে ছবির বাঁদিকটা প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। ডানদিকের পুরুষটির ওপর আঙুল দেখিয়ে পিলু বলল, "এটা তো জ্যাঠা?"

সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আর বাঁদিকের পুরুষটি সম্ভবত বাবা। "এটা সিওর আমি", বাচ্চাটাকে দেখিয়ে বলল পিলু।

পূরবী উত্তেজিত হয়ে বললেন, "তাহলে কি ..."

"মনে তো হচ্ছে ... তবে ছবিটার যা অবস্থা, আপনার বোধহয় খুব একটা লাভ হবে না" ছবিটা অ্যালবাম থেকে খুলতে খুলতে বললাম।

পূরবী জলভরা চোখে বললেন, "যা পেয়েছি তাই যথেষ্ট। দেখি কোনও ভাবে রিকভার করা যায় কি না ... আপনাকে যে কি বলে ..."

"কিছুই বলতে হবেনা, শুধু কথা দিন যখনই এদেশে আসবেন আমাদের বাড়ি ঘুরে যাবেন।"

পূরবী কথা দিলেন এবং আমাদেরকেও বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য নেমন্তন্ন করলেন। বললেন উনি পরশু ফিরে যাচ্ছেন। আগামিকাল কলকাতাটা একটু ঘুরে দেখবেন।

ওঁদের বিদায় জানিয়ে ঘরে এসে সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "ছবিটা কি সত্যিই পূরবীদির মা-র ছিল?"

“নাহ, আমি ভালো করেই জানি ওটা মা-র ছবি। আর বাচ্চাটাও পিলু নয়, স্বয়ং আমি। তবে পূরবী যদি আমার মা-র মধ্যেই ওঁর মা-কে খুঁজে পান তাহলে ক্ষতি কি?”

সুতপা কিছু না বলে চোখ দিয়ে সমর্থন জানাল। আমি অ্যালবাম দু’টো খুলে পাতা ওলটালাম। ধাপ্পাটা আশা করি পূরবী ধরতে পারবেন না।

আ স্টাডি ইন এমারেল্ড

নেইল গেইম্যান

অনুবাদ- অর্কপ্রভ দত্তগুপ্ত

১.

ভ্যাগাবন্ডের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম একটা ভাড়া বাড়ির খোঁজে। এই সূত্রেই তার সাথে আমার প্রথম পরিচয়। সেন্ট বার্টের ল্যাবরেটরিতে।

“হুম বহুদিন আফগানিস্তানে ছিলে যদ্দূর মনে হচ্ছে।” আমাকে দেখেই তার প্রথম কথা এটাই। আর তাতে স্রেফ আমার মুখটা হাঁ হয়ে গেল বিস্ময়ে।

- “অসাধারণ!”

“নাহ.. মোটেও নয়।” ল্যাবকোট জড়ানো লম্বাটে মানুষটা বলল-- “যেভাবে তুমি নিজের হাতটাকে ধরে রেখেছ, বোঝা যাচ্ছে কাঁধে আঘাত রয়েছে পুরোনো। তোমার চেহারা ও গঠনে মিলিটারি ছাপটাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। গায়ের রংটা রোদে জ্বলে খানিকটা বাদামি হয়ে গেছে। তোমার ঐ কাঁধের আঘাত আর বাদামী ট্যান দেখে স্পষ্ট তুমি মিডল ইস্টে ছিলে। খুব সম্ভবত আফগানিস্তান.... আর আফগানিস্তানি গুহামানবদের হাতে ধরাও পড়েছিলে। তাদের টর্চার থেকেই খুব সম্ভব তোমার ঐ আঘাত।”

এইভাবে দেখলে অবশ্য ব্যাপারটা খুবই সহজ বলে মনে হল। রোদে জ্বলা বাদামি রংটা স্পষ্টই। আর হ্যাঁ অত্যাচারের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল বটে আমায়।

আফগানিস্তানের ভগবান কি মানুষ সবকিছুই বর্বর। তারা হোয়াইটহল বা বার্লিন কিংবা মস্কো কারো কাছেই মাথা নোয়াতে রাজি নয়। আমার পোস্টিং ছিল আফগানিস্তানের পাহাড়ি অঞ্চলে ____তম রেজিমেন্টে।

যদ্দিন যুদ্ধ পাহাড়ে পাহাড়ে চলছিল ততদিন সমানে সমানে যুদ্ধ চলছিল। তারপর যেই পাহাড়ি গুহাগুলোতে লুকিয়ে লুকিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হল আমাদের হালত খারাপ হতে শুরু করল।

গুহার অন্ধকারে সেই আয়নার মত লেকটার কথা এই জীবনে ভুলব না আমি। আর সেই জিনিসটাকেও ভুলতে পারব না যেটা লেকের জল থেকে উঠে এসেছিল। একখানা সুরমূর্ছনায় ভরে গিয়েছিল গুহাটা, কেমন এক ফিসফিস স্বর মেশানো অদ্ভূত এক সুর। জল থেকে উঠে আসা প্রাণীটির বড় বড় চোখগুলো সেই সুরের তালে তালে খোলা বন্ধ হচ্ছিল ক্রমাগত।

আমি যে বেঁচে ফিরেছি সেইটা মিরাক্ল্য ছাড়া কিছু নয়। ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পর মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছি আমি। শরীরের যেখানে যেখানে সেটার জোঁকের মত মুখগুলো চেপে বসে গিয়েছিল সেই জায়গাগুলো চিরকালের জন্য সাদা হয়ে গেছে। বন্দুকের নিশানায় আমার মত অব্যর্থ কেউ ছিল না, অথচ আজকাল হাত কাঁপে আমার, লক্ষ্যভেদ তো দূরের কথা।

মোদ্দা কথা হল আফগানিস্তান আমার সব কেড়ে নিয়েছে। কিছুই আর নেই আমার মধ্যে... কেবল পৃথিবীর-নিচে-পৃথিবীর ভয়টাই রয়ে গেছে। এই চার-আনার মত পেনসনটা আমার কাছে অনেক বেশি শান্তির ষোল আনা বেতন পেয়ে আফগানিস্তানে পড়ে থাকার থেকে। লন্ডনের কুয়াশায় মাঝে মাঝে এখনো গা-টা কেমন শিউরে ওঠে।

আপাতত বর্তমানে ফিরে এসে ল্যাবকোটে আমার বন্ধুটিকে বলে উঠলাম - "ইয়ে... রাতে মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে ওঠার বদভ্যাস আছে আমার.. ওতে কোনো অসুবিধে..."

- “তা লোকে বলে রাতে আমারও নাকি প্রচন্ড নাক ডাকে। মাঝে মধ্যেই গভীর রাত অবধি বা সারারাত জেগে কাটানোর অভ্যাসও আছে। আমি নাকি স্বার্থপর প্রচন্ড অন্তর্মুখী আর বোরিং। আর বলে রাখি মাঝে সাঝে কিন্তু ম্যান্টেলপিসটাকে আমি টার্গেট প্র্যাকটিসের জন্য ব্যবহার করি। ... ও হ্যাঁ বসার ঘরটা কিন্তু আমার চাই, ক্লায়েন্ট এলে ওইখানেই দেখা করি আমি। এসবে তোমার অসুবিধে নেই তো?” বলে উঠল সে।

হেসে উঠে হাতটা এগিয়ে দিলাম তার দিকে। হ্যান্ডশেক করে পাকা কথা হয়ে গেল শেয়ারে রুম নেবার।

জায়গাটা বেকার স্ট্রিটে। দু’জন ব্যাচেলরদের জন্য একদম উপযুক্ত বলা চলে। মাথায় রেখেছিলাম আমার এই নতুন বন্ধুটি প্রাইভেসি একটু বেশি পছন্দ করে, তাই জিজ্ঞেস করে উঠতে পারিনি তার পেশাটা ঠিক কি?

কিন্তু দিনকে দিন আমার কৌতূহল বাড়তেই থাকল। বসার ঘরে ঘন ঘন বেশ কিছু লোকজন আসে... বন্ধুটির কথায় ক্লায়েন্ট। তারা এলেই আমাকে চলে যেতে হয় আমার বেডরুমে। কারা এই ক্লায়েন্টরা? একজন রুগ্না মহিলা একচোখ যার কানা... বা বেঁটেখাটো একটা মানুষ বেশ বয়স্ক মত? নতুন বন্ধুটি কি উকিল ?

সেদিন ব্রেকফাস্ট সারছিলাম দু’জনে মিলে, আমার বন্ধুটি আধখানা ডিম কবজা করতে করতেই বাড়িওয়ালির জন্য বেল বাজাল। মিসেস হাডসন, আমাদের বাড়িওয়ালি আসতেই সে বলল- “একজন ভদ্রলোক এসে পড়বেন আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। আরেকজনের জন্য ব্রেকফাস্ট পাঠাতে পারবেন কি?”

“ঠিক আছে”, বললেন মিসেস হাডসন, “আমি এখনই ডিম সেদ্ধ আর সসেজ বসিয়ে দিচ্ছি। চা বানানোই আছে।”

এবার আর আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না – “সে কি? তুমি নিশ্চিন্ত হচ্ছ কি করে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কেউ একজন আসবে যে? কোন চিঠি বা টেলিগ্রামও তো দেখছি না তোমার কাছে?”

মৃদু হেসে বন্ধুটি বলল - “একটু আগে একটা ব্রুহামের আওয়াজ শুনলে? বাড়ির সামনে কয়েক সেকেন্ড থেমে আবার চলে গেল? বাড়ির ঠিকানাটা নিশ্চিত করে গেল। তারপর কান পেতে শুনলে বুঝতে সেটা আবার আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে গেল এবার উল্টো দিকে বাসস্ট্যান্ডের দিকে। সম্ভবত লোক জানাজানির ভয়ে বাড়ির ঠিক সামনে নামতে চাইছে না.... কাছের বাসস্ট্যান্ডে নেমে সেখান থেকে আসবে। আমাদের এখান থেকে বাসস্ট্যান্ড হাঁটা পথে পাঁচমিনিট....”

কথা শেষ হতে না হতেই দরজায় ঠক ঠক আওয়াজ শোনা গেল।

“চলে এস, লেস্ট্রার্ড খোলাই আছে...” একজন মাঝারি হাইটের লোক ঢুকল ঘরে। টুপিটা খুলে রাখল হ্যাটস্ট্যান্ডে।

আমার বন্ধুটি না তাকিয়েই বলে চলল—“টেবিলে বসে পড়ো লেস্ট্রার্ড। মিসেস হাডসন সসেজ আর ডিম চাপিয়ে দিয়েছেন এক্ষুনি চলে এল বলে।”

দরজাটা বন্ধ করতে করতে লেস্ট্রার্ড বলল- “ওহ থ্যাঙ্কিউ, তাড়াহুড়োয় ব্রেকফাস্ট না সেরেই দৌড়েছি।”

টেবিলে এসে বসতে না বসতেই মিসেস হাডসন এসে ডিম আর গ্রিলড সসেজ দিয়ে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একখানা ডিম কেটে মুখে পুরল লেস্ট্রার্ড।

আমার বন্ধুটি বলে উঠল - "মনে হচ্ছে ন্যাশনাল লেভেলের কোন সমস্যা?"

"হে ভগবান" মুখে ডিম নিয়েই লেস্ট্রার্ড প্রায় লাফ দিয়ে ওঠে আর কি। "খবরটা এর মধ্যেই ছড়িয়ে গেছে নাকি?"

"নিশ্চিন্ত থাকো... তোমার ব্রুহামের আওয়াজ আমি চিনি লেস্ট্রার্ড। আর আমার কাছে তুমি এর আগেও এসেছ। তাও আজ থেমে কনফার্ম করলে ঠিকানাটা। তারপর বাড়ির সামনে না থেমে বাসস্ট্যান্ডে নেমে হেঁটে এলে... তাড়াহুড়োতে ব্রেকফাস্টও সারোনি। তাই বোঝাই যাচ্ছে ব্যাপারটা সাধারণ নয়...এতটা সাবধানতা তাহলে নিতে না"।

"হুম..." থুতনি থেকে ডিম মুছতে মুছতে লেস্ট্রার্ড বলল "ব্যাপারটা .. প্রাইভেটলি আলোচনা করলে হত না?"

এবার আমি ইতস্তত করে বলে উঠলাম "ইয়ে.. তোমাদের অসুবিধা হলে আমি তাহলে বেডরুমে..."

হেসে উঠল সে, হাত নাড়িয়ে কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলল – " ননসেন্স.. বসে থাকো... টু হেডস আর বেটার দ্যান ওয়ান"

লেস্ট্রার্ড গলা খাঁকারি দিয়ে বলল — "ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি যেভাবে চাও করো... কেসটা তুমি সলভ করলেই হল। আর আমার চাকরিটা বাঁচলেই হল। তা তুমি একা কাজ করবে না সঙ্গী নিয়ে করবে তাতে আমার কোন মাথাব্যাথা নেই।"

সেদিকে কান না দিয়ে বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করে বসল—"তা শোরডিচে কখন গেলে লেস্ট্রার্ড?"

এতে চমকে গিয়ে লেস্ট্রার্ড হাত থেকে ফর্কটাই গেল পড়ে। "তুমি নির্ঘাত মস্করা করছ আমার সাথে! পুরো ব্যাপারটা তাহলে তুমি জেনেই বসে আছ আগে থেকে।"

"না লেস্ট্রার্ড সত্যি বলছি আমি জানি না। দেখ লেস্ট্রার্ড.. একজনের জুতোয় আর ট্রাউজারের নিচের অংশে যখন ঐ হলদে রঙের কাদার দাগ লেগে থাকে.. তাহলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, হবস লেনের ওখানে যে গর্তগুলো রয়েছে লোকটি তার পাশ দিয়ে গেছিল। শোরডিচ ছাড়া লন্ডনের অন্য কোন জায়গায় এই রঙের মাটি খুঁজে পাবে না তুমি।" নিজের খালি প্লেটটা সরিয়ে দিতে দিতে সে বলল। "তোমার ব্রেকফাস্ট হয়ে গিয়ে থাকলে চল বেরিয়ে পড়া যাক লেস্ট্রার্ড।"

২.

একখানা ক্যাবে করে রওনা দিলাম আমরা। গন্তব্য—ইস্ট এন্ড। ইনস্পেকটর লেস্ট্রার্ড যদিও আমাদের সাথে এল না... সে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে গাড়িতে করে রওনা দেবে।

পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে এখনো খোলসা হয়নি, আর এই নতুন বন্ধুটির সাথে যখন জড়িয়েই পড়েছি, তাই আর কৌতূহলকে দমিয়ে রাখা গেল না। জিজ্ঞেস করে ফেললাম—"আচ্ছা, যদি ভুল না করে থাকি তবে, তুমি কি একজন গোয়েন্দা?"

"উহু..... কনসাল্টিং গোয়েন্দা। পৃথিবীতে একমাত্র। আমি নিজে থেকে কেস নিই না বন্ধু। লোকে আমার কাছে এসে পরামর্শ নেয় মাত্র।" সে জবাব দিল।

"তাহলে যারা আসে তারা..."

"হুম ক্লায়েন্ট। বেশিরভাগ পুলিশ অফিসার বা গোয়েন্দা।"

খানিকক্ষণের মধ্যেই এসে পৌছলাম কুখ্যাত ইস্ট এন্ডে। চোর-ছ্যাঁচোড়দের স্বর্গরাজ্য বলা যেতে পারে এটাকে। সরু সরু গলিগুলোতে সূর্যের আলোও ঠিকমতো পৌঁছয় না। লেস্ট্রার্ড পৌছে গেছে আমাদের আগেই।

ক্যাব থেকে নামতে নামতে বললাম — "আমি তোমার সাথে গেলে সত্যি কোন অসুবিধে নেইতো?"

আমার বন্ধুটি চোখের পাতা না ফেলে স্থিরদৃষ্টিতে গলির দিকে তাকিয়ে থেকেই জবাব দিল — "বন্ধুবর, আমার মনে হয়, আমাদের দুজনের জুটি বাঁধাটা অবশ্যম্ভাবী! কেন জানি না, মনে হচ্ছে আমাদের এটাই প্রথম দেখা নয়.... তোমার সাথে অনেক লড়াই যেন লড়েছি কখনো। হয়তো অতীতে বা ভবিষ্যতে। জানি না.... কিন্তু একজন ভালো বন্ধু আমার দরকার। চলে এস..."

গলির মধ্যে যে বাড়িটাতে ঢুকলাম সেটা অতি সস্তামানের একটা বাড়ি। সামনে একটা পুলিশকে লেস্ট্রার্ড ইশারা করতে সে মাথা নেড়ে সরে দাঁড়ালো দরজা থেকে। ভেতরে ঢুকতে যাব, তার আগেই দেখি আমার বন্ধুটি দরজার বাইরে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল, হাতে একটা ম্যাগনিফায়ার। বাইরে রাখা একটা ঢালাই লোহার বুট স্ক্র্যাপার দেখতে লাগল মন দিয়ে, আঙুলের ডগা দিয়ে সেটাকে একবার খুঁচিয়েও নিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ইশারা করল ভেতরে যাওয়ার জন্যে।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরতলায় এলাম আমরা। বলে দিতে হবে না কোন ঘরে অঘটন ঘটেছে.... সেটার দরজার সামনে আরও দু'জন পুলিশ মোতায়েন করা। ঘরটার ভেতরে ঢুকেই চমকে উঠলাম।

তথাকথিত লেখক আমি নই। তাই ঘরের অবস্থাটাকে কোন ভাষায় বর্ণনা করব জানি না..। তবুও চেষ্টা করছি সাধ্যমত। ঘরের মধ্যে বিছানার ঠিক পাশে মৃতদেহটা নজরে পড়ল, তবে বিছানায় নয় মেঝেতে পড়ে রয়েছে সেটা। কিন্তু ঘরে ঢুকেই মৃতদেহটার ওপরে নজর পড়েনি আমার... ঢুকেই

যেটা দেখে বেমালুম থ' মেরে গিয়েছিলাম সেটা হল ঘরের প্রায় সমস্ত দেওয়াল জুড়ে আর মেঝেতে রক্তের যেন বন্যা বয়ে গেছে। সমস্ত দেওয়াল জুড়ে যেন ফোয়ারার মত সবুজ রক্তধারা দিয়ে ম্যুরাল এঁকে গেছে কোন নরকের চিত্রকর। ভিক্টিমের কাটা গলার থেকে ছিটকে আসা রক্ত! কোথাও সেটা ঘন সবুজ, কোথাও বা নতুন ঘাসের মত ফিকে সবজে রঙের।

এইসব সামলে নিতে নিতে চোখ গেল দেহটার ওপরে। কসাইয়ের টেবিলে গলাকাটা খরগোশের মত পড়ে রয়েছে সেটা।

আমার বন্ধুবর হাঁটু গেড়ে সেটার পাশে বসে ক্ষতস্থানটি দেখল। তারপর পকেট থেকে ম্যাগনিফায়ার নিয়ে এগিয়ে গেল দেওয়ালের দিকে। দেওয়ালের একজায়গায় গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল সে.... ম্যাগনিফায়ার নিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল জায়গাটা।

"এটা আমাদেরও চোখে পড়েছে।" লেস্ট্রার্ড সেদিকে লক্ষ্য করে বলে উঠল।

"একটা শব্দ.... কিছু লেখবার চেষ্টা করেছে কেউ।"

লেস্ট্রার্ডের সাথে আমিও এগিয়ে গেলাম সেদিকে। ঘন সবুজ রক্ত দিয়ে হালকা হলুদ রঙের দেওয়ালের গায়ে একটা শব্দ নজরে পড়ল – আর এ সি এইচ ই - রাচে।

"বুঝতেই পারছ.. লিখতে চেয়েছিল রেচেল কিন্তু শেষ পর্যন্ত এল-টা আর লেখা হয়ে ওঠেনি, তার আগেই..." - লেস্ট্রার্ড বলে উঠল। "তাই পুলিশ ফোর্সকে অলরেডি লাগিয়ে দিয়েছি এই রেচেল নামের মহিলাকে খুঁজে বের করতে।"

আমার বন্ধুটি কোন জবাব না দিয়ে আবার ফিরে গেল দেহটার কাছে। একটা একটা করে তার সবকটা হাত পরীক্ষা করল ম্যাগনিফায়ার দিয়ে।

“আমাদের মাননীয় হাইনেস যে লেখেননি শব্দটা সেইটা নিশ্চিত। আঙুলে কোন রক্তের ছোপ নেই।”

“একমিনিট... একমিনিট!! তুমি জানলে কি...?”

“ওহ্ লেস্ট্রার্ড। আমার মগজে অন্তত কিছু পদার্থ আছে তো নাকি? রক্তের রং, হাতের সংখ্যা আর চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ইনি রয়্যাল ফ্যামিলির কেউ। সিংহাসনের ওয়ারিশদের মধ্যে একজন। জার্মান লাইনের” - সে অধৈর্য হয়ে জবাব দিল।

“ইনি প্রিন্স ফ্রানজ ড্রোগো অফ বোহেমিয়া” লেস্ট্রার্ড বলল। “অ্যালবিয়নে এসেছিলেন ছুটি কাটাতে, হাওয়া বদলের জন্য..”

“আর হাওয়ার সাথে সাথে থিয়েটার, বারবণিতা ও জুয়ার জন্যও বটে”, আমার বন্ধুটি মৃদু হেসে বলল।

“তাও বলতে পার। যা হোক ঐ রেচেল মহিলাটির খোঁজ আমাদের কিন্তু পাওয়া দরকার” মৃদু হেসে লেস্ট্রার্ড বলল।

কিছু জবাব না দিয়ে সে ঘরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে চলল। কখনো হাঁটু গেড়ে বসে, কখনো আধশোয়া হয়ে, দাঁড়িয়ে। আর মাঝে মাঝেই বিরক্তির সাথে অভিযোগ করেই চলল ঘরময় পুলিশদের জুতোর একগাদা ছাপ থাকার জন্য।

বেশ খানিক্ষণ পর দরজার পিছনে খানিকটা কাদার ছোপ আবিষ্কার করে বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল.. তারপরে ফায়ারপ্লেসের ভেতরে কিছু ছাই খুঁজে পেয়ে দেখলাম সে আরও অনেকটা উৎসাহিত হল।

“এটা দেখ লেস্ট্রার্ড”, বন্ধুবর খুশি খুশি গলায় বলল।

“আমাদের পুলিশদের নিশ্চয় ছাই দেখে আনন্দ পাবার কথা নয়?” লেস্ট্রার্ড প্রায় খ্যাঁকখ্যাঁকিয়ে উঠল এবার।

তাকে দেখলাম উত্তরে কেবল একচিমটে ছাই তুলে নিয়ে দু আঙুলে ঘষে দেখল। তারপর নাকের কাছে নিয়ে কি জানি কি শুঁকল। এবং পকেট থেকে একটা কাঁচের ছোট্ট ভায়াল বের করে তাতে খানিকটা ছাই পুরে নিল।

তারপর বলল- “বেশ এবার বডিটাকে নিয়ে যেতে পারো লেস্ট্রার্ড।”

- “এটাকে রয়্যাল প্যালেস থেকে লোক এসে নিয়ে যাবে বলেছে”।

মাথা নাড়িয়ে সে ইশারা করলে দরজার দিকে। বুঝলাম আপাতত বন্ধুটির কাজ শেষ। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ সে বলে উঠল – “ভালো কথা লেস্ট্রার্ড, ঐ রেচেল মহিলার খোঁজ করে আর লাভ নেই.. খুঁজে পাবে না। বরং ডিকশনারিটা একবার ঘেঁটে দেখতে পারো। আর এ সি এইচ এ ‘রাচে’ হল একটা জার্মান শব্দ। যার মানে প্রতিশোধ।”

সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় এলাম। আমার বন্ধুটি আমার দিকে এবার তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠল - “একি! তুমি তো রীতিমত কাঁপছ দেখছি!”

“ও কিছু না, উত্তেজনায়। খানিক্ষণের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।”

“হাঁটতে পারবে?”

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

“চল.. পশ্চিম লন্ডনের দিকে যেতে হবে একবার।” রয়্যাল প্যালেসের বিশাল টাওয়ারের দিকে ইশারা করে সে বলল।

সেদিকেই রওনা দিলাম দু’জনে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আমার বন্ধু জিজ্ঞেস করল - “ইউরোপের মুকুটমণিদের মানে রাজবংশের কারো সাথে দেখা হয়েছে আগে? মানে সামনাসামনি?”

হঠাৎ এই প্রশ্নে অবাক হয়ে বললাম — “না, কেন?”

“তৈরি হও। শিগগিরই দেখা হবে। আর অবশ্যই কোন ডেডবডি হিসেবে না”।

আমি জবাব দেবার আগেই সামনে একটা কালো ক্যারিজ এসে থামল। কোচোয়ানের পরনে কালো গ্রেটকোট আর হ্যাট। তার কোটের ওপরে আর ক্যারিজের গায়ে দেখলাম রাজপরিবারের কোট অফ আর্মস লাগানো। অবাক হয়ে কিছু বললবার আগেই আমার বন্ধুটি বলে উঠল - “এসো বন্ধু। এইসব নিমন্ত্রণ একদম উপেক্ষা করবার মত নয়।”

তারপর দিব্যি এগিয়ে গিয়ে কোচোয়ানকে টুপি খুলে অভিবাদন জানিয়ে উঠে বসল কোচের ভেতর। অগত্যা আমাকেও তাকে অনুসরণ করতে হল। আরামদায়ক চামড়ার গদির ওপরে বসতেই কোচ চলতে আরম্ভ করল।

যাত্রাপথে আমার বন্ধু একটাও কথা বলল না। একবার আমি কথা বলবার চেষ্টা করলাম কিন্তু সে কেবল নিজের আঙুলটা ঠোঁটে চেপে চুপ থাকতে ইশারা করল তার উত্তরে। এবং হেলান দিয়ে ডুবে গেল কোন গভীর চিন্তায় কে জানে?

৩.

প্রাসাদে রানির কনসর্ট প্রিন্স আলবার্ট এল আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে। প্রিন্স আলবার্ট বেশ বড়সড় চেহারার মানুষ। একজোড়া তাগড়াই গোঁফও আছে। এবং নিঃসন্দেহে মানুষ।

কার্পেট মোড়া করিডর দিয়ে হাটতে হাটতে তিনি বললেন--"রানিমা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন ঘটনাটা নিয়ে"। লক্ষ্য করলাম তার কথায় একটা টান রয়েছে। স-কে গুলো অনেকটা জ-এর মত করে উচ্চারণ করেন তিনি... "তাঁর খুব আদরের ভাইপো ছিল ফ্রানজ্। যদিও রানীমার ভাইপোর অভাব নেই। আশা করি আপনারা দোষীকে শিগ্গিরই খুঁজে বের করতে পারবেন।"

"আমি সম্পূর্ণ সাধ্যমত চেষ্টা চালাচ্ছি হাইনেস" সে জবাব দিল।

প্রিন্স আলবার্ট এবার একটা বিশাল দরজার সামনে এসে ইশারা করতে, প্রকান্ড দরজাখানা খুলে গেল। তাঁর পিছু পিছু আমরাও এগিয়ে গেলাম সেটার দিকে। ভেতরে আধো অন্ধকারে বোঝা গেল বিরাট একটা হলঘরে এসে পড়েছি আমরা। তার ভেতরে বিরাজমান স্বয়ং রানিমা।

তাঁর নাম ভিক্টোরিয়া। কেননা তিনি ভিক্টোরিয়াস। তিনি যুদ্ধে ৭০০ বছর আগেই আমাদের হারিয়ে দিয়েছেন। তাঁর নাম গ্লোরিয়ানাও বটে, কেননা তিনি গরিমাময়। তবে সবার জন্য তিনি মহারানি বা রানিমা। কেননা তাঁর আসল নামটি মানুষের মুখে উচ্চারণ করা সম্ভবই নয়।

মহারানির চেহারাটি প্রকান্ড, এমনকি আমার কল্পনার চেয়েও প্রকান্ড। অন্ধকারের মধ্যে একটি সিংহাসনে বসে তিনি আপাতত চেয়ে রয়েছেন আমাদের দিকেই।

"থিজইজ্ মাজজট্ বি জলভড্" সেই অন্ধকার থেকে তাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

"অবশ্যই মহারানি" সে জবাব দিল।

মহারানির একখানা হাত এগিয়ে এসে এবার আমাকে ইশারা করল। গুরুগম্ভীর গলায় আদেশ এল - "জেপপ্ ফরওয়ার্ড"

আমি এগোবার চেষ্টা করলাম কিন্তু পা দুটো বিশ্বাসঘাতকতা করে এগোতে চাইল না। আমার বন্ধুই কনুই ধরে টেনে নিয়ে গেল আমাকে মহারানির সামনে।

"ইজজ্ নট্ টু বি এফ্রেডড্, ইজজ্ টু বি ওয়ার্দি, ইজজ্ টু বি এ কমম্প্যানিয়ান" - তাঁর গম্ভীর আওয়াজটা কেমন গুঞ্জনের মত শুনতে পেলাম আমি। তাঁর বাড়িয়ে থাকা হাতখানা কয়েকপাক ঘুরিয়ে তিনি রাখলেন আমার কাঁধের ওপর।

আমার ভেতরে কয়েকমুহূর্ত যেন চিনচিনে একটা ব্যথার অনুভূতি খেলে গেল। সেটা বললেও যেন ঠিক বোঝানো যায় না অনেকটা যেন মনের গভীরে একখানা অনুভূতি খেলে গেল। কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। আমার মাসলগুলো রিল্যাক্সড হয়ে এল। শরীরের সমস্ত অস্বস্তি মিলিয়ে গেল। অনুভব করলাম আমার নার্ভের দুর্বলতা আমার হাত কাঁপাও চলে গেছে।

কেবল আবার বন্ধুটিকে দেখতে পারলাম এগিয়ে যেতে। মহারানির সাথে তার কি কথোপকথন হল কিছুই মনে নেই আমার। তখনও একটা ঘোরের মধ্যে আছি। ঘোর কাটতে কেবল শুনতে পেলাম সে বলছে — "অবশ্যই মহারানি। সেদিন আপনার ভাইপোর সাথে ঘরের মধ্যে আরো দুজন ব্যক্তি ছিল। যদিও পুলিশদের বোকামিতে ঘরের মধ্যে পায়ের ছাপে ছয়লাপ... তবুও তার মধ্যেও আমি নিশ্চিত আপনার ভাইপোর সাথে আরো দুজন ছিল সেদিন।"

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে বেকার স্ট্রিটে ফেরার পথেও সে ক্যাবে চুপচাপ হেলান দিয়ে বসে রইল। তখন রাত হয়ে এসেছে খানিকটা, লন্ডন শহর ঘন কুয়াশায় ঢাকা।

বাথরুমে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়াতে চমকে উঠলাম। আমার শরীরের সাদা দাগগুলো ফিকে হয়ে এসেছে।

৪.

আমার বন্ধুটি যে ছদ্মবেশ ধারণে পারদর্শী তা জানা থাকলেও সে হপ্তায় বেশ কয়েকবার বোকা বনতে হল আমায়। আগামি দশটা দিন আমাদের বেকার স্ট্রিটের ঘরের দরজা দিয়ে বেশ কিছু অদ্ভুত লোকজনকে ঢুকতে দেখলাম -- একজন চাইনিজ বুড়ো, একজন মোটাসোটা ক্লার্ক, লালচুলো একটা বুড়ি, একজন রোগাটে লোক যার পা গাউটে ফুলে গেছে। প্রত্যেকেই আমাদের রুমের দরজা ঠেলে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ত, আর আমার পিলে চমকে উঠত।

আর সেইসব ছদ্মবেশ ছেড়ে সে যে সেই সোফায় বসত সেখান থেকে আর নড়ত না। কেবল মাঝে মাঝে দেখতাম টুকরো টুকরো কাগজে কি সব লিখত। সেগুলো পড়ে অবশ্য মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি আমি।

এরকমই চলল বেশ কিছুদিন। তারপর এক সন্ধ্যেয় বন্ধুটি তার নিজের চিরাচরিত বেশেই হুড়মুড়িয়ে ঢুকে কোনরকম ভণিতা না করে মুখে একটা বড়সড় হাসি নিয়ে জিজ্ঞাসা করল আমি থিয়েটার দেখতে যেতে আগ্রহী কিনা?

“হ্যাঁ !.. হ্যাঁ হ্যাঁ ...কেন নয়?” হকচকিয়ে আমি উত্তর দিলাম।

“বেশ তাহলে এখনি তৈরি হয়ে নাও.. আর সাথে অপেরা গ্লাসটা নিতে ভুলবে না। ড্রুরি লেনে যাব আমরা”, সে বলল।

যদিও আমি ভেবেছিলাম হালকা কোন অপেরা হবে। কিন্তু ড্রুরি লেন? সেখানে তো সব অতিরিক্ত মোটা দাগের অপেরাগুলো হয়! তার উপদেশমত একখানা ছোট লাঠি মানে ওয়াকিং স্টিকও নিলাম।

হলে পৌছে সিটে বসবার পর সে বলল – "ভাগ্য ভালো যে তোমায় আমার সাথে জুয়ার ঠেক, পতিতাপাড়ায় যেতে হয়নি। প্রিন্স ফ্রানজের দর্শনীয় স্থানগুলি তাহলে বুঝতেই পারছ। যদিও কোন জায়গাতেই একবারের বেশি যাননি তিনি।"

অর্কেস্ট্রা শুরু হল আর সে-ও চুপ করে গেল। অপেরা মন্দ নয়। তিনটি একাঙ্ক নাটিকা নিয়ে অপেরা হল। মাঝে মাঝে বেশ কিছু কমিক্যাল গানও হল। লীড অ্যাক্টর লম্বাটে গড়নের খানিকটা রোগাটে হলেও বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। ভালই অভিনয় করে দেখলাম, গানের গলাখানাও মন্দ নয়।

প্রথম নাটিকা হল অনেকটা ভ্রান্তিবিলাসের মত একখানা কমেডি। লীডিং অ্যাক্টরই যমজের রোল করল নিপুণভাবে। দ্বিতীয় নাটিকাটা ট্রাজেডি, একজন ফুলওয়ালি অনাথ মেয়ের গল্প। শেষে তার ঠাকুরমা তাকে খুঁজে পায়, ছোটবেলায় ডাকাতের দল তাকে নাকি নিয়ে গেছিল। আর শেষেরটা হল উপদেশমূলক একখানা ঐতিহাসিক নাটিকা। অপেরা শেষ হতে আমার বন্ধুটি বলল – "তো? কেমন লাগল?"

"বেশ তো... মন্দ নয়। হাততালি দিতে দিতে হাত আমার ব্যথাই করছে। ভালই লাগল আমার।"

- "চল একবার ব্যাকস্টেজে যাওয়া যাক"।

পিছনের করিডর ধরে ব্যাকস্টেজের কাছে এলাম। একজন রোগাটে করে মহিলা বসে বসে উল বুনছিলেন, আমার বন্ধুটি একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে তার হাতে দিল। কার্ডটা দেখে মহিলাটি

আমাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন। একখানা সিঁড়ি বেয়ে আমরা একটা বড় কমন গ্রিনরুমের ভেতরে এসে পড়লাম।

ধুলোমাখা সব আলো জ্বলছে আয়নাগুলোর সামনে। পুরুষ মহিলা সব অভিনেতাদের একটাই গ্রিনরুম, একসাথে বসে সব মেকআপ তুলছে। আমার বন্ধুটি ঘরে ঢুকেই ঘোষণা করলে – "মিঃ ভার্ণের সাথে একবার কথা বলা যায়?"

একজন মহিলা চিৎকার করে ভার্ণেকে ডাক দিলেন - "শেরী ! শেরী ভার্ণে ... তোমার সাথে দেখা করতে লোক এসেছে।"

পাশের একটা দরজা খুলে সেই লম্বাটে গড়নের লীড অ্যাক্টরকে দেখলাম বেরিয়ে এল। তবে স্টেজের বাইরে অতটা হ্যান্ডসাম দেখতে লাগছে না হিরোমশাইকে।

"মাফ করবেন... আপনাদের তো ঠিক..." একটু ইতস্তত করে সে বলল।

"আমি হলাম হেনরি কাম্বার্লি" আমার বন্ধুটি জবাব দিল "আমার নাম হয়তো আপনি শুনে থাকবেন"

"স্যরি.. কিন্তু মনে পড়ছে না মিঃ কাম্বার্লি... আপনি?"

আমার বন্ধু একটা এনগ্রেভড কার্ড বের করে এগিয়ে দিল তার দিকে। কার্ডে চোখ বুলিয়ে দেখলাম তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"থিয়েটার প্রোমোটার? নিউ ওয়ার্ল্ডের থেকে? আর ইনি?"

"আমার বন্ধু। .. মিঃ সেবাস্টিয়ান, যদিও তিনি থিয়েটারের সাথে যুক্ত নন" - আমার বন্ধুটি জবাব দিল। "নিউ ওয়ার্ল্ডে গিয়েছেন কখনো শো করতে?"

“নাহ্.. সেই সুযোগ হয়ে ওঠেনি এখনও। কিন্তু ইচ্ছে আছে” ভার্ণে বলল।

“বেশ বেশ, তাহলে ধরে নিন সেই ইচ্ছেটিই পূরণ হতে চলেছে আপনার। আপনার শেষ নাটকটা অসাধারণ!! দারুন প্লট। নিউ ওয়ার্ল্ডে ওইটা করতে পারলে দারুণ হবে। আপনারই লেখা তো?”

“না না.. এইটা লিখেছে আমার এক বন্ধু। মাঝে সাঝে লেখে আমাদের দলের জন্য”।

“ও, আচ্ছা ওনার ঠিকানাটা একটু দিতে পারবেন? ওনার সাথেও একটু কথা বলে দেখতাম এ ব্যাপারে”

ভার্ণে মাথা নাড়াল – “সেটা সম্ভব নয় মিঃ কাম্বার্লি। আমার বন্ধুটি আসলে পাবলিসিটি থেকে দূরে থাকতে চায়। সে বলেই রেখেছে স্টেজের সাথে যোগাযোগ লেখা ছাড়া আর কোনভাবে রাখতে চায় না সে”।

“আচ্ছা? দুঃখের কথা” আমার বন্ধুটি দেখলাম তার পকেট থেকে পাইপটা বের করল। তারপর তামাকের জন্য পকেট হাতড়াতে থাকল। খানিক্ষণ পর অপ্রস্তুতভাবে হেসে বলল – “স্যরি, আমি বোধহয় আমার তামাকটা আনতে ভুলে গেছি।“

“আমি একটু কড়া তামাক খাই। ব্ল্যাক শ্যাগ। যদি অসুবিধে না হয় আমার থেকে নিতে পারেন” - ভার্ণে বলল

“আরে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আমারও তো ঐ ব্ল্যাক শ্যাগ” আমার বন্ধুটি বলল। ধন্যবাদ দিয়ে তারপর আমার বন্ধু ভার্ণের তামাকের কৌটোর থেকে খানিকটা নিয়ে পাইপে ভরল। তারপর আমাকে যেন একরকম ভুলে গিয়েই দুজনে মিলে দিব্যি পাইপ টানতে টানতে গল্পে মজে গেল।

আমার বন্ধুটি তার নতুন জগতের শহরগুলোতে ঘুরে ঘুরে নাটক করে বেড়াবার প্ল্যান বলে চলল। এইটা নাকি তার অনেকদিনের ইচ্ছা। ভার্ণের এই শেষ নাটকটাই করতে চায় সে। কেবল এক অঙ্কের নাটক থেকে বাড়াতে হবে, ইত্যাদি।

"কিন্তু তোমার এই রহস্যময় বন্ধুটি এই ইচ্ছেটিকে রূপ দেবে কিনা সেটাই তো জানা যাচ্ছে না ! নাটকের দল পরিচালনা না হয় আমার দায়িত্ব কিন্তু অভিনেতা তো তুমি? ভেবে দেখ দুনিয়াজোড়া লোক তোমায় চিনবে। নিউ ওয়ার্ল্ডেও তোমার নাম ছড়িয়ে যাবে। এবং আমি আশ্বাস দিচ্ছি লাভের পঞ্চাশ শতাংশ পাবে তুমি আর তোমার বন্ধু"।

"পুরো ব্যাপারটা শুনে তো গায়ে কাঁটা দিচ্ছে মশাই" ভার্ণে হাসতে হাসতে বলল "কিন্তু এইটা আবার দিবাস্বপ্নের মত আমাদের পাইপস্বপ্নই থেকে যাবে না তো?"

"না না... আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনাকে" আমার বন্ধু হাসল "কাল সকালে আমার বাড়িতে দেখা করুন তবে? আমি বেকার স্ট্রিটে থাকি... ঐ কার্ডে পুরো ঠিকানা দেওয়া আছে। আপনার বন্ধুটিকেও আনবেন সাথে করে.. একবারে কনট্রাক্ট সেরে নেব।" আমার বন্ধুবর উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে নিল ভার্ণের সাথে।

গ্রিনরুম থেকে বেরিয়ে আবার কোনও কথা না বলে আমার বন্ধুবর ক্যাবে উঠল। ক্যাবেও চুপচাপ বসে রইল। ক্যাব যখন চেরিং ক্রসে এসে পৌছল তখন মুখ খুলল সে। তার আগে অবশ্য পকেট থেকে তামাকের কৌটো বের করে আরেকবার পাইপ জ্বালিয়ে নিল।

"যাক" একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলল "লম্বা ছোকরার খোঁজ পেলাম। আশা করি কাল সকালে কৌতূহলি হয়ে খোঁড়া ডাক্তারও এসে পড়বেন তার সাথেই।"

"খোঁড়া ডাক্তার?"

বন্ধুবর মৃদু হেসে বলল — "আপাতত ঐ নামটাই রেখেছি। প্রিন্সের ডেডবডির আশেপাশে যেসব পায়ের ছাপ পেয়েছি। অবশ্যই পুলিশদের জুতোর ছাপ বাদে, তাতে স্পষ্ট ঘরে প্রিন্সের সাথে আরো দুজন ছিল। একজন লম্বাটে গড়নের, যার সাথে আমরা দেখা করে ফিরছি। আর দ্বিতীয়জন মাঝারি উচ্চতার এবং সামান্য খোঁড়া।"

ক্যাব এসে থামল আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। "এক পাউন্ড আর এক টাপেন্স স্যার" ক্যাবি বলল।

বন্ধুটি তাকে একটা ফ্লোরিন দিল। ক্যাবি টপহ্যাট খুলে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল লন্ডন ফগের ভেতর দিয়ে।

আমি দরজাটা খুলছি, সেসময় সে বলে উঠল "অদ্ভুত, আমাদের ক্যাবি মোড়ের মাথার প্যাসেঞ্জারটা ডাকা সত্ত্বেও পাত্তা না দিয়ে চলে গেল !"

"ক্যাবিদের শিফট শেষ হলে অনেকসময় ওরা অমনটা করে। প্যাসেঞ্জার নিতে চায় না শিফটের শেষে।" আমি বললাম।

"হুম... বটেই তো", বন্ধুটি কি যেন একটা চিন্তা করতে করতে জবাব দিল।

৫.

পরদিন সকালে লেস্ট্রার্ড ঢুকল সবার আগে। সে ঢুকতেই আমার বন্ধু প্রশ্ন করল – "আমার কথামত তোমার লোকজনদের রাস্তার আশেপাশে মোতায়েন করেছ?"

- "একদম, আর স্ট্রিক্ট অর্ডারও দেওয়া আছে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে কাউকে বাধা দেবে না কিন্তু বাড়ির থেকে কেউ পালাতে চেষ্টা করলেই গ্রেপ্তার করবে। যেমনটি বলে দিয়েছ তুমি।"

- "একজোড়া হাতকড়া এনেছ তো?"

লেস্ট্রার্ড পকেট থেকে সে দুটো বের করে দেখাল... "আচ্ছা! খুলে বল তো ব্যাপারটা? কিছুই তো বুঝছি না ছাতামাথা?"

সে জবাব না দিয়ে নিজের পাইপটা পকেট থেকে বের করে সামনের টেবিলে রাখল। তারপাশে রাখল তার তামাকের কৌটোটা। আর সবশেষে সেগুলোর পাশে সেই শোরডিচের ছাইভরা ভায়ালটা।

"নাও" আমাদের ভার্ণে মশাইয়ের সব সূত্রগুলো সাজিয়ে দিলাম।" তারপর ঘড়ির দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে বলল – "এখনও খানিকটা সময় আছে দেখছি ওরা আসতে। তারপর আমার দিকে ঘুরে বলল- "আচ্ছা, বল দেখি রেস্টোরেশনিস্টদের সম্পর্কে কি জান?"

"একটা শব্দও জানি না !" আমি অবাক হয়ে জবাব দিলাম।

লেস্ট্রার্ড গলা খাকারি দিল "যাদের সম্পর্কে আমি ভাবছি তাদের কথাই যদি বলতে চাও, তাহলে বাদ দাও ব্যাপারটা।"

"সেটার জন্য দেরি হয়ে গেছে লেস্ট্রার্ড" সে বলল "শোন বন্ধু, এখনও অনেক মানুষ আছে যারা চায় আগেকার দিনের মত একমাত্র মানুষরাই সব অধিকার পাক। মানুষরাই একা শাসন করবে এবং দুনিয়া চালাবে।"

- "এইসব কথাবার্তা বন্ধ কর! এক্ষুনি" লেস্ট্রার্ড রেগে চেঁচিয়ে উঠল।

- "বন্ধ করে লাভ নেই লেস্ট্রার্ড! প্রিন্স ফ্রানজ্ ড্রোগোকে যারা খুন করেছে তারা রেস্টোরেশনিস্ট। আর রাচে, সেটা রেচেল নামের মহিলা নয়, বা প্রতিশোধ-ও নয়। রাচে-র আরেকটা মানে আছে।

শিকারি কুকুরদের একসময়ে ঐ নামে ডাকা হত। এবং আমাদের শিকারি তার স্বাক্ষর রেখেছেন ওই রাচে লিখে। কিন্তু এই শিকারি মশাই শুধু স্বাক্ষরটাই রেখেছেন, খুনটা তিনি করেননি" - আমার বন্ধুটি বলল।

"সেই খোঁড়া ডাক্তার!" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

"ভেরি গুড, সেদিন ঘরে লম্বাটে গড়নের একজন ছিল। দেওয়ালে যে আই লেভেলে লেখাটা ছিল সেটা বেঁটে মানুষের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। ফায়ারপ্লেসের ছাইটা তামাকের, লোকটা পাইপ খায়। এবং ফায়ারপ্লেসের ম্যান্টলপিসের ওপরে পাইপ ঠুকে ঝেড়েছে। বেঁটে বা মাঝারি উচ্চতার হলে ফায়ারপ্লেসের দেওয়ালে ঠুকত। ঘরের ভিতরে দরজার পিছনে আর জানালার পাশে পায়ের ছাপ পেয়েছি, ওই জায়গাগুলোয় কেউ দাঁড়িয়ে ছিল, বাঁ পায়ের ছাপ বেশি স্পষ্ট। মানে সে পায়ে ভর দিয়েছে বেশি। ডান পা-টি খোঁড়া। অপেক্ষা করছিল কারও জন্য। বাইরের কাদা-চাছনিতে দু'তিন রকমের মাটি পেয়েছি। লম্বাটে মানুষটি প্রথমে প্রিন্সের সাথে ঘরে এসেছিল। আর ঘরে অপেক্ষায় ছিল সেই লোকটি যে প্রিন্সকে জবাই করেছিল।

"এ কয়েকদিনে প্রিন্স ড্রোগো কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন সেটাও খুঁজে বের করেছি আমি। জুয়ার সব কুখ্যাত ঠেক, পতিতাপল্লি এমনকি ম্যাডহাউসগুলো অবধি। কিন্তু কোথাও আমি এই তামাকখেকো লোকটিকে খুঁজে পাইনি। শেষ অবধি বোহেমিয়ার খবরের কাগজ ঘেঁটে একটা সূত্র পেলাম। ইংলিশ থিয়েটার ট্রুপ গতমাসে প্রাগে একটা শো করেছে, আর তাতে উপস্থিত ছিলেন প্রিন্স ফ্রানজ্ ড্রোগো..."

- 'শেরি ভার্ণে !!" আমি বলে উঠলাম।

- "একজন রেস্টোরেশনিস্ট। একদম ঠিক" - সে জবাব দিল।

ঠিক সে সময় দরজায় টোকা পড়ল। "চলে এসেছে মনে হচ্ছে" আমার বন্ধুটি বলল "সামলে থেক লেস্ট্রার্ড"।

- "ভিতরে আসুন"।

দরজা খুলে যে লোকটি ঘরে ঢুকল সে শেরি ভার্ণে নয় এমনকি সেই খোঁড়া ডাক্তারও নয়। রাস্তার একজন আরব। এইসব ভ্যাগাবন্ড আরবরা ছোটখাট কাজ করে দেয় পাড়ার বাসিন্দাদের সামান্য পয়সা দিলে।

- "ইয়ে... এখানে হেনরি কাম্বার্লি নামে কেউ আছেন? তাঁর নামে চিঠি আছে একটা" আরবটি প্রশ্ন করল।

আমার বন্ধু এগিয়ে গেল - "আমিই মিঃ কাম্বার্লি। ধন্যবাদ। আর এই নাও সিক্সপেন্স। আচ্ছা চিঠিটা কে দিল তোমায়?"

- "একজন ছোকরা মত লোক। তার নাম বলল উইগিন্স। ধন্যবাদ স্যার।" আরবটা টুপি খুলে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল।

চিঠিটা আমি তুলে দিচ্ছি এখানে -

মহাশয়,

আপনাকে হেনরি কাম্বার্লি বলে না ডেকে, আপনার নিজের নামেই ডাকলাম। হেনরি কাম্বার্লি নামটা আপনাকে মানায় না। আপনার লেখা অনেককটা আর্টিকল আমি পড়েছি, যখনই হাতে পেয়েছি।

গতকাল আপনার সাথে দেখা করে খুবই আনন্দ পেয়েছি। আপনার সাথে দেখা করার ইচ্ছা ছিল অনেকদিন ধরেই। তবে দু চারটে ছোটখাট উপদেশ দিয়ে যাই। ভবিষ্যতে আপনার গোয়েন্দাগিরির

কাজে লাগবে। আপনার সময় আর শ্রমও বাঁচবে। প্রথমত, একজন পাইপখোর লোকের পকেটে একটা নতুন পাইপ থাকবে, পুরানো ব্যবহার করা নয় আর তামাক থাকবে না সেটা আশ্চর্যের কথা। এবং লন্ডনের কিন্তু সবখানে কান আছে, এইটা মাথায় রাখবেন। ভবিষ্যতে চোখের সামনেই যে ক্যাব এসে থামবে তাতে উঠে বসবেন না যেন? ক্যাবিরাও কিন্তু কান পেতে থাকে।

যদিও আপনি ধরেছেন ঠিকই। সে রাতে আমিই সেই হাফ-ব্লাড জীবটাকে শোরডিচে ভুলিয়ে নিয়ে গেছিলাম। শয়তানটাকে টোপ দিয়েছিলাম মেয়েমানুষের। তাকে বেশি উত্তেজিত করতে এও বলতে হয়েছিল যে মেয়েটাকে কর্নওয়েল থেকে অপহরণ করে আনা হয়েছে। এবং হাফ-ব্লাডদের সাথে তার প্রথম পরিচয়, হতভাগাটা শুনে কি খুশি... । তার ভয়ঙ্কর চেহারা দেখলে মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার চান্স আছে জেনে ব্যাটার আনন্দ দেখে কে?

মেয়েটি অবশ্যই কাল্পনিক টোপ। থাকলে সত্যিই পাগল হয়ে যেত প্রিন্সের চেহারা দেখে। আর সেই পাগলামি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করত এই নরকের কীটটা। আমি দেখেছি, যেমন করে মানুষ আম চুষে চুষে খেয়ে তার খোসা আর আঁটিটা ছুড়ে ফেলে দেয় সেভাবেই পাগলামি উপভোগ করত শয়তানটা।

আমাদের ডাক্তার, (উনি কিন্তু সত্যিই আমাদের নাটিকাটি লিখেছেন, এইটা আমি মিথ্যা বলিনি।) তাঁর ছুরি-স্ক্যালপেল সব নিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন ঘরে, আমাদের প্ল্যানমাফিক।

যাই হোক, চিঠিটা আপনাকে খ্যাপানোর জন্য পাঠাইনি। আমি আর ডাক্তারমশাই আপাতত অনেক দূরে চলে গেছি। শুধু একটা কথা বলব সারাজীবনে আপনার মত দুর্দান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পাইনি, আর ভবিষ্যতেও হয়তো আর পাব না।

আমি ভার্ণে নামে স্বাক্ষর করব না, কেননা যতদিন এইসব আধা- জীবদের থেকে পৃথিবী মুক্ত না হচ্ছে ততদিন শিকার অভিযান চলবেই। আর ততদিন আমাকে না হয় চিনবেন সেই নামেই।

ইতি

রাচে

ইনস্পেকটর লেস্ট্রার্ড চিঠিটা পড়েই এক ছুট লাগাল নিচে। বেচারা আরবটাকে ধরা হল, তারপর তার সাথে পুলিদের নিয়ে লেস্ট্রার্ড গেল ব্যাটা চিঠিটা যেখানে পেয়েছিল সেইখানে। পারেও বটে লেস্ট্রার্ড, যেন এখনও শেরি ভার্ণে সেখানে দিব্যি বসে রয়েছে পুলিশরা আসবে বলে।

- "লেস্ট্রার্ড এবার সব ট্রেন স্টেশনে খানাতল্লাসি চালাবে। সবকটা ট্রেন, জাহাজ, সবখানে" - আমার বন্ধুটি বলল "বোধহয় লন্ডনে থেকে বাইরে যাওয়া সমস্ত রাস্তাতেও।"

- "তোমার কি মনে হয়? খুঁজে পাওয়া যাবে ওদের?" আমি বললাম।

- "ওরা সম্ভবত পালানর চেষ্টাই করেনি। হয়তো সেন্ট গাইলসের রুকারিতেই বসে আছে দিব্যি। বোকা পুলিশগুলো শহরের ভেতরে খুঁজবে না জানে ওরা। লুকিয়ে থাকবে কিছুদিন তারপর গোলমাল কমলে পালাবে" - সে বলল "অন্তত আমি ওর জায়গায় থাকলে তাই করতাম"।

চিঠিটা আমরা ওর কথায় পুড়িয়ে ফেললাম। লেস্ট্রার্ড খানিকটা কদর পেল ডিপার্টমেন্টে কেসটা সলভ করার জন্য। প্রিন্স আলবার্ট চিঠি দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন আমাদের, এবং লোকদুটোকে যে ধরা গেল না সে নিয়ে দুঃখপ্রকাশও করলেন। পরে প্যালেস থেকে মহারানিও বার্তা পাঠালেন তিনি খুশি হয়েছেন আমার বন্ধুটির কাজে।

আজ অবধি শেরি ভার্ণে (বা তার আসল নাম যাই হোক) কে খুঁজে পাওয়া যায় নি। তার সহযোগী ডাক্তারকেও না, যদিও ডাক্তারের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। সেই ডাক্তারও নাকি মিলিটারিতে ছিল, আফগানিস্তানে পোস্টিং। সার্জন ছিল। নাম -- জন ওয়াটসন!!।

এই লেখাটা নষ্ট করে ফেলারই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমার বন্ধুটির কথায় ছাই ঘেঁটেও সূত্র পাওয়া যায়। তাই এটাকে ব্যাঙ্কের ভল্টে তুলে রাখলাম। যতদিন না আবার সময় আসে। পরিস্থিতি বদলায়। তদ্দিন এটা সেখানেই থাক।

অনুবাদকের কিছু কথা:- সাই-ফি বেসড এই গল্পটি আসলে H.P Lovecraft এর Chatulu Myhos দুনিয়ার ওপর লেখা। সেই দুনিয়ায় ডিটেকটিভ ও সহকারীর প্রথম কেস। লেখাটি বেরিয়েছিল "Shadows Over Baker Street" নামে একটা সংকলনে। এই সংকলনের বিভিন্ন লেখকের গল্প ছিল সবই আর্থার কোনান ডয়েলের হোমসকে H.P Lovecraft এর দুনিয়ার পুনর্নির্মাণ।

একটি

www.pathagar.net

এবং

www.chorjapod.com

যৌথ প্রয়াস

বন্ধু

লেখালেখি Facebook Group

সম্পাদিকা – অদিতি কবির খেয়া

প্রচ্ছদ – শঙ্খ শুভ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সাজঘর

অনুপম করণ

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

প্রত্যয়দীপ্ত রুদ্র

শুভঙ্কর সিংহ রায়

পরিচয়

“ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ।
মধু নক্তমুতোষসি মধুমৎ পার্থিবগং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতি-র্মধুমাগং অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবোঃ ভবন্তু নঃ॥”

শারদীয়া ১৪২০

অবকাশ

“আমরা সত্যের পথযাত্রী, আমাদের বায়ু হোক মধুর, আমাদের নদীর স্রোত হোক মধুপূর্ণ, আমাদের ঔষধ হোক মধুময়, আমাদের রাত্রি ও দিন হোক শান্তিময়, সমগ্র বিশ্বে বিরাজ করুক চিরশান্তি, পিতৃস্বরূপ দ্যুলোক আমাদের নিকট শান্তিপূর্ণ হোক, বনানী আমাদের প্রদান করুক সুমিষ্ট ফল, সূর্য হোক আনন্দবর্ষী এবং গাভীরা হোক সুখপ্রদা। ত্রিভুবন হোক মধুময়।”